ইসলামী জীবনবীমা

বর্তমান প্রেক্ষিত

কাজী মোঃ মোরতুজা আলী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ইসলামী জীবনবীমা
বর্তমান প্রেক্ষিত

কাজী মোঃ মোরতুজা আলী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

ইসলামী জীবনবীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত

কাজী মোঃ মোরতুজা আলী

ISBN : 984-8203-44-7

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫

ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭, E-mail : biit.org@yahoo.com

Website : www.iiitbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৬

প্রথম সংস্করণ : জুলাই ২০০৯
আষাঢ় ১৪১৬
রজব ১৪৩০

কম্পোজ ও মুদ্রণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য : ১৭৫.০০ টাকা

U.S $ 30

Islami Jibonbima : Bartaman Prekhkhet (Islami Life Insurance: Present Perspective) written by Quazi Md. Mortuza Ali and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought, House# 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Bangladesh. Phone : 8950227, 8924256, 06662684755 Fax: 8950227, E-mail : biit.org@yahoo.com Website : www.iiitbd.org Price : Tk. 175.00, U.S $ 30

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

'তাকাফুল' কথাটি আরবি শব্দ 'কাফাল' থেকে উদ্ভব হয়েছে– যার অর্থ কারও প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করা। বর্তমানে পৃথিবীর ২৫টি দেশে প্রায় ৭০টি কোম্পানী ইসলামী বীমা ব্যবস্থা চালু করেছে। আফ্রিকার সুদানে ইসলামী বীমার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রপাত হলেও বর্তমানে এশিয়া মহাদেশে ইসলামী বীমার ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রসার ঘটেছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় যে, ইসলামী বীমার প্রচার, প্রসার ও ব্যাপকতার সম্ভাবনা এদেশে অনেক বেশি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইসলামী বীমার উপর গবেষণালব্ধ তেমন কোন বই ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। অথচ ব্যাংক-বীমা ব্যবস্থা এমনকি উচ্চ শিক্ষায় অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোর্সে এর চাহিদা বিদ্যামান। এ বিষয়কে সামনে রেখে বিআইআইটি এ দেশের বিশিষ্ট বীমা ব্যক্তিত্ব কাজী মো: মোরতুজা আলী'র রচিত 'ইসলামী জীবন বীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত' বইটি ২০০৬ সালে প্রথম প্রকাশ করেছিল। ব্যাপক পাঠক চাহিদার কারণে এটি ২য় সংস্করণ হিসেবে আবারও প্রকাশ করা হলো। আশা করি বইটি দেশের এমনকি বহির্বিশ্বের বাংলাভাষীদের এতদ্‌সংক্রান্ত চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। তাছাড়া ব্যাংক-বীমা এবং সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেফারেন্স বই হিসেবেও এটি কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এম. আযিযুল হক
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
ঢাকা

জুন ২০০৯
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের সারা জীবনের সকল বিষয়েরই দিক নির্দেশনা এতে আছে। বীমা প্রকৃত অর্থে মানুষের জীবনে বিভিন্ন বিপত্তির ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা মোকাবেলার একটি আর্থিক নিরাপত্তা পদ্ধতি। পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি অনুযায়ী সুদমুক্তভাবে ও স্বচ্ছ লেনদেনের ভিত্তিতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনা করা হলে তা ইসলাম বিরোধী হবে না।

ইসলামী বীমা একটি সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা যেখানে পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি থেকে ব্যক্তি ও সমাজ উপকৃত হয়ে থাকে। ইসলামী জীবনবীমা এমন একটি পদ্ধতি যাতে একদল মানুষ তাদের মধ্যকার কোন সদস্যের দুর্ঘটনাজনিত শারীরিক অক্ষমতা কিংবা মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট ক্ষতির বোঝা লাঘবের জন্য একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে।

ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী বীমার প্রবর্তন হয়েছে এবং সফলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমাদের দেশেও এ ব্যবস্থা ইতোমধ্যে জনগণের মাঝে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী বীমা প্রবর্তন ও প্রসারের ক্ষেত্রে কাজী মোঃ মোরতুজা আলী'র ভূমিকা অনন্য। আমি বিশ্বাস করি তাঁর মতো একজন মেধাবী ও অভিজ্ঞ ইসলামী বীমা ব্যক্তিত্বের লেখা 'ইসলামী জীবনবীমা : 'বর্তমান প্রেক্ষিত' বইটি ইসলামী বীমার প্রসারে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন লেখকের এই খেদমত কবুল করুন। আমীন।

মে ২০০৬
ঢাকা

মাওলানা উবায়দুল হক
খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ
এবং চেয়ারম্যান
সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইনসিওরেন্স অব বাংলাদেশ

www.pathagar.com

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের যিনি আমার মতো একজন নগণ্য ব্যক্তিকে ইসলামী বীমার উপর একটি গ্রন্থ রচনার তাওফিক দান করেছেন। শত কোটি দরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ইসলামকে অন্যান্য সকল জীবনব্যবস্থার উপর বিজয়ী করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

মানুষের জীবনবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ অর্থব্যবস্থা। জীবন ও অর্থনীতির প্রতিটি পর্যায়ে বীমা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনিশ্চয়তাপূর্ণ জীবনে ঝুঁকি মোকাবেলার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে বীমার অপরিহার্যতা আজ সর্বজন স্বীকৃত।

বাংলাদেশের বীমা শিল্প বিভিন্ন ধরনের সমস্যার আবর্তে আটকে আছে। একদিকে মানুষ আগের তুলনায় অনেক বেশি বীমার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে বীমা সম্পর্কে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন বিভ্রান্তি। বিশেষ করে ইসলামী বীমা সম্পর্কে আমাদের রয়েছে স্বচ্ছ ধারণার অভাব। এই জটিল অবস্থার মধ্য দিয়েই ঘটছে বীমা শিল্পের ক্রমবিস্তৃতি। বর্তমানে এই শিল্পে জড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার পোশাজীবী ও লক্ষ লক্ষ বিক্রয় কর্মী।

বীমা শিল্পের খুঁটিনাটি অনেক বিষয় নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে আমরা আলোচনা করি। কিন্তু তেমন গভীরে যাবার মত ফুরসত আমাদের অনেকের হয় না। যে পেশায় আমি জড়িত, সে পেশার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে কিছুটা ভাবতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে যে সব প্রবন্ধ ইতোপূর্বে রচিত হয়েছে এবং দেশে বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর কয়েকটি নিয়ে এই সংকলন গ্রন্থের প্রকাশনা। আমি বীমা বিশেষজ্ঞ নই। শরীয়াহ সম্পর্কেও আমার জ্ঞান সীমিত। একজন সাধারণ উৎসাহী পাঠক হিসেবে এবং বীমা শিল্পের স্বল্প অভিজ্ঞতায় যা কিছু শিখেছি ও বুঝেছি তা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছি মাত্র।

ইসলাম, বিশেষ করে ইসলামী অর্থনীতি, অর্থায়ন পদ্ধতি, ব্যাংক ও বীমা সম্পর্কে যারা উৎসাহী, এ বিষয়গুলো নিয়ে যারা চিন্তা ও গবেষণা করছেন তাদের নতুন চিন্তার উদ্রেক ঘটাতে এই বইটি সহায়ক হবে বলে মনে করি। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী যারা ঝুঁকি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও বীমা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তারাও একটি স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হবেন বলে আমি মনে করি। এ দেশের সাধারণ মানুষ এই গ্রন্থ হতে সনাতন বীমা ও ইসলামী বীমা বিশেষ করে ইসলামী জীবনবীমার ক্ষেত্রে শরীয়ার বিধান কিভাবে কার্যকর হচ্ছে সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার অধিকারী হবেন বলে আশা করছি।

www.pathagar.com

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বীমা শিল্পের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অতএব, আমলা, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, আলেম-ওলামা ও পেশাজীবীগণ এই বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে অধিকতর উৎসাহী হবেন বলে আমি আশা করি। এই গ্রন্থ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য, আলোচনা ও সমালোচনা আমি আন্তরিকভাবে কামনা করছি। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে গ্রন্থটিকে আরো সমৃদ্ধ করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

বীমা, ইসলামী বীমা ও ইসলামী জীবনবীমা সংক্রান্ত এ সংকলন প্রকাশে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি) আগ্রহ প্রকাশ করায় এবং গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ইতোমধ্যে বি আই আই টি-এর প্রকাশনা সমূহ দেশে-বিদেশে যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টি করেছে এবং একটি শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কার্যক্রম বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। আমি বি আই আই টি-এর অধিকতর সাফল্য কামনা করছি।

গ্রন্থটি প্রকাশে যাদের সহযোগিতা, সমর্থন ও উৎসাহ আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে তাদের সবার প্রতি জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মনযুর-উল-করীম, কোম্পানীর মাননীয় উপদেষ্টা বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিল্পোদ্যোক্তা জনাব এম. এ. খালেক, শ্রদ্ধেয় পরিচালক জনাব এম. এ. ওয়াহহাব ও বেগম নাজমা হক-এর অনুপ্রেরণা আমাকে উৎসাহিত করেছে। শরীয়াহ কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন মাওলানা উবায়দুল হক ও সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বিশেষ করে বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ, অধ্যক্ষ সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ড: আ. ক. ম. আব্দুল কাদের, মাওলানা রূহুল আমীন খান প্রমুখ বিভিন্ন সময় আমাকে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের পরামর্শ আমার জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

অন্তপুরে আমার জীবনসাথী লায়লা নাসরীনের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন এত সহজ হতো না। বই প্রকাশের ব্যাপারে বার বার তাগিদ দেয়ার কাজটি তিনি করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় ইসলামী বীমা শিল্পের প্রসারতাকে আরো সুদৃঢ় করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

কাজী মো: মোরতুজা আলী

www.pathagar.com

ভূমিকা

জীবনে ঝুঁকি আছে এবং ঝুঁকি নিয়ে আমাদের চলতে হয়। ঝুঁকি নিরসনের একটি বৈজ্ঞানিক পথ ও পদ্ধতির নাম বীমা।

বীমা একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজন। বীমার লক্ষ্য হলো ব্যক্তি বিশেষকে জীবন, স্বাস্থ্য ও সম্পদের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা। বীমার ধারণা ইসলামী মূলনীতির কাঠামোর মধ্যে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাকাফুলের শরীয়াহ সম্মত ধারণা সনাতন বীমা পদ্ধতিতে অনুপস্থিত।

ইসলাম সহজাতভাবেই নির্ভরযোগ্য ঝুঁকি পূরণের ধারণার পক্ষে। অতএব, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে বীমা ব্যবসা পরিচালনা করা হয় তার পরিবর্তে 'সকলের তরে সকলে আমরা' নীতির উপর ভিত্তি করে বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব।

ইসলামী বীমা (তাকাফুল) প্রচলিত বীমার একটি বিকল্প ব্যবস্থা যা ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক ব্যবস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠি পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে নিজস্ব পন্থায় অর্থনৈতিক দায়ভার ভাগ করে নেয়ার জন্য এখন তাকাফুল ব্যবস্থার অনুসরণ করছে।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে তাকাফুল ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় চালু হয়েছে যার অন্যতম প্রধান সংগঠক কাজী মোঃ মোরতুজা আলী। তার অভিজ্ঞতাপ্রসূত আলোচ্য বইটি বীমার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং ইসলামী বীমার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.pathagar.com

সূচি

এক.

দৈনন্দিন জীবনে ঝুঁকি ও বীমা ১১-২০

ভাবিয়া করিও কাজ; ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা; ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমা; পথ ও প্রক্রিয়া।

দুই.

জীবনবীমা কি, কেন ও কিভাবে শুরু হল ২০-৩৯

জীবনবীমার আইনগত ভিত্তি; জীবনবীমা কেন?; বীমার উৎপত্তি ও বিকাশ।

তিন.

উপমহাদেশে জীবনবীমার ইতিহাস, প্রেক্ষাপট ও বিশিষ্ট বীমা ব্যক্তিত্ব ৪০-৫৮

উনিশ শতকের কথা; বিশ শতকের জাগরণ; যুদ্ধোত্তর বিপর্যয় ও পুনর্জীবন; উপমহাদেশের বীমা ব্যক্তিত্ব; সমাজ সংস্কারক রাজা রাম মোহন রায়; প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর; ব্যবসায়ী রুস্তমজী কাওয়াসজী; আইনবিদ কামরুদ্দীন তৈয়বজী; শিক্ষাবিদ স্যার সৈয়দ আহমদ; আইনবিদ লালা হর কৃষেনলাল; জননেতা পান্নালাল ব্যানার্জী ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী; জমিদার সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রাজনীতিবিদ নলিনী রঞ্জন সরকার; স্যার ফিরোজ সেথনা; পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু; হাকিম আজমল খান ও ডক্টর এম এ আনসারী।

চার.

বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইসলামের মৌলিক বিধান ও অর্থায়ন নীতিমালা ৫৯-৮৯

ইসলামী আইনের মৌলিক ধারণা; শারীয়াহ (ইসলামী আইন); ইসলামী আইনের উৎস সমূহ; কুরআন; সুন্নাহ; ইজমা; কিয়াস; ইজতিহাদ; ফিক্‌হ; সুদের নিষিদ্ধতা; সুদ নিষিদ্ধকরণের যৌক্তিকতা; মুশারাকা (অংশগ্রহণ); মুদারাবা; মুরাবাহা; ইজারা; সালাম; ইসতিসনা; যে কারণে আল ঘারার নিষিদ্ধ; ঘারার ইয়াসির; ঘারার ও বীমা চুক্তি; জুয়া (মাইসির)-এর অবৈধতা; মীরাসা ও ওয়াসীয়ত সম্পর্কিত আইন; ওয়াসিয়াতের নীতিমালা; সনাতন বীমা ও ইসলাম আইন।

পাঁচ.

ইসলামী বীমার ভিত্তি, বিকাশ ও ইজতিহাদের গুরুত্ব ৯০-১০৩

পারস্পরিক সহযোগিতা প্রথা ও অনুশীলন; তাকাফুলের ভিত্তি; ইসলামী বীমার প্রয়োজন; ইসলামী বীমার চুক্তিগত ভিত্তি; ইসলামী বীমার ক্রম যাত্রা; বর্তমান দৃশ্যপট; বিভিন্ন মডেল ও অনুশীলন; ইজতিহাদের গুরুত্ব।

ছয়.

ইসলামী বীমার প্রকৃতি ও সুফল ১০৪-১১৩

ইসলামী বীমা কিভাবে পরিচালিত হবে? ইসলামী বীমার সুফল।

সাত.

জীবনবীমা ও ইসলাম ১১৪-১৩৪

বীমাচুক্তির মূলনীতি; বীমাযোগ্য স্বার্থ; ক্ষতিপূরণের নীতি; সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততার নীতি; বীমা ও জুয়া; জীবনবীমার উদ্দেশ্য; জীবনবীমার গাণিতিক ও আইনগত মূলনীতি; সমাজের কল্যাণে ইসলামী নীতিমালা; সামাজিক বীমা; জীবনবীমা এবং সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা;

www.pathagar.com

জীবনবীমা সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনবীমার পক্ষে যুক্তি; সাম্প্রতিক অগ্রগতি; ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোকে ইসলামী জীবনবীমা; ইসলামী বীমা কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য; পুন: তাকাফুলের প্রয়োজন; পুন:বীমা পদ্ধতি; ইসলামী পদ্ধতিতে পুন:বীমা; উপসংহার।

আট.

শরীয়াহ্সম্মত জীবনবীমা প্রসারে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা ১৩৫-১৪৮

শরীয়তের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য; শরীয়তের দিকনির্দেশনা; জীবনবীমার চাহিদা; ইসলামী জীবনবীমা ও সামাজিক শান্তি; উদ্যোক্তাদের ভূমিকা; বিপণন ও বাজার গবেষণা।

নয়.

ইসলামী জীবনবীমার বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবতা ১৪৯-১৬০

মানব জীবনে ঝুঁকি এবং ইসলামী বীমা; ইসলামী জীবনবীমার লক্ষ্য ও পদ্ধতি; ইসলামী জীবনবীমার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য; মানব আচরণের স্ববিরোধিতা; বাংলাদেশে ইসলামী জীবনবীমার তুলনামূলক সুবিধা; বাংলাদেশের তুলনায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহে বীমা ব্যবসার অবস্থান; মানুষের হৃদয় জয় করা পদ্ধতি।

দশ.

বাংলাদেশে ইসলামী জীবনবীমা: সমস্যা ও সম্ভাবনা ১৬১-১৭৯

বীমা নিয়ে বিতর্ক; ইসলামী বীমা কি? বীমা ব্যবসা ও ইসলাম; সমস্যাসমূহ (সাধারণ সমস্যা); সাময়িক সমস্যা; চলতি সমস্যা; সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত; বাংলাদেশে জীবনবীমা।

এগার.

ইসলামী বীমার ধারণা এবং আশু করণীয় ১৮০-১৯৭

তাকাফুল কি? তাকাফুল কিভাবে কাজ করে? স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যসমূহ; ইসলামী জীবনবীমার ভিত্তি; সনাতন বীমা বনাম ইসলামী বীমা; ইসলামী বীমার উদ্ভব ও বিকাশ; মৌলিক পার্থক্য ও সমস্যাবলী; ইসলামী জীবনবীমার পদ্ধতিগত ও আইনগত বৈশিষ্ট্য আশু করণীয়।

বার.

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী জীবনবীমার ভূমিকা ১১৯৮-২০৯

জীবনবীমার আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব; জীবনবীমার প্রয়োজন; জীবনবীমার প্রয়োগ; বীমা এবং মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য; তাকাফুল কীভাবে মুসলিম সমাজের উপযোগী?; তাকাফুল পদ্ধতি ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপযোগী কিভাবে।

তের.

বাংলাদেশে জীবন বীমা ২১০-২২২

কতিপয় মৌলিক সমস্যা ও সুপারিশ; বিশেষ মৌলিক সমস্যা; ক্ষুদ্র বীমার সমস্যা।

চৌদ্দ. ২২৩-২৩৯

ইসলামী বীমা-এক নবদিগন্তের সূচনা

পনের. ২৪০-২৫৩

ইসলামী বীমার বর্তমান অবস্থা ও আমাদের করণীয় প্রেক্ষাপট

ষোল. ২৫৪-২৬২

তাকাফুল আইন ও বিধির প্রয়োজনীয়তা

www.pathagar.com

এক.

দৈনন্দিন জীবনে ঝুঁকি ও বীমা

আমাদের জীবন অনিশ্চয়তায় ভরপুর। জীবনের প্রতি মুহূর্তে রয়েছে দুর্ঘটনা ও ক্ষতির আশংকা। অনাকাঙ্ক্ষিত যে কোন দুর্ঘটনা থেকে যে কোন সময় আমাদের জীবনে নেমে আসতে পারে দুর্বিষহ অবস্থা। জীবনে অনিশ্চয়তা আছে বলেই আমাদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকিমুক্ত জীবন আমাদের কাম্য হলেও বাস্তবে ঝুঁকিমুক্ত থাকা সম্ভব হয় না। ঝুঁকি নিয়েই আমাদের চলতে হয়। ঝুঁকি নিয়ে আমাদের ভাবতে হয়।

ঝুঁকি হচ্ছে ক্ষতির একটি আশংকা। আমরা কখনও বলি না যে, পরীক্ষায় পাশ করার ঝুঁকি আছে। বরং অকৃতকার্য হওয়ার ঝুঁকি আছে বলতে পারি। অর্থাৎ যা কিছু অনাকাঙ্খিত বা অনভিপ্রেত এবং অনিশ্চিত তাই হচ্ছে ঝুঁকি। একটি বাড়িতে যদি আগুন লাগে তখন ক্ষতি হওয়ার আশংকা নিশ্চিত। অতএব, এটিকে আমরা ঝুঁকি বলব না। কিন্তু যে কোন সময় যে কোন বাড়িতে আগুন লাগতে পারে, যে কোন গাড়ীতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং যে কোন মানুষ যে কোন সময় মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে। এই সব অনিশ্চিত আশংকাকে আমরা ঝুঁকি বলি। আমরা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারি না কখন, কিভাবে কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার আশংকা দৈনন্দিন জীবনে সবাইকে কম-বেশি ভাবিয়ে তোলে।

যেহেতু জীবনে ঝুঁকি আছে সেহেতু মানুষকে ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয়। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা ঝুঁকি গ্রহণে অতি উৎসাহী। আবার কেউ কেউ ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে পছন্দ করেন। কিন্তু ঝুঁকি পরিহার করতে চাইলেও আমাদের পক্ষে সকল ঝুঁকি পরিহার করা বাস্তবে সম্ভব হয় না। অবশ্য এমনটি হতে পারে যে, একটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ পথ বা পদ্ধতি পরিহার করে আমরা অধিকতর কম ঝুঁকিপূর্ণ পথ বা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি। যেমন বাসে ভ্রমণ না করে আমরা ট্রেন ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিতে পারি। রিকসায় না চড়ে পায়ে হেঁটে চলার চেষ্টা করতে পারি। তবে বিকল্প পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। পথ চলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করে আমরা ফুটপাথ দিয়ে চলার অভ্যাস করতে পারি। তবে সেখানেও কলার খোসায় পা পিছলে পড়ার আশংকা আছে। আবার ঢাকনাবিহীন ম্যানহোলে পড়েও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

www.pathagar.com

অতএব, সহজেই বোঝা যায় যে, ঝুঁকিমুক্ত মানবজীবন আমাদের কাম্য হলেও বাস্তবে তা সম্ভব নয়। এ কারণে আমাদেরকে ঝুঁকি মোকাবেলার কথা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কথা ভাবতে হয়। ঝুঁকি আমাদের জীবনের সাথে জড়িত। ক্ষতির আশংকা যত বেশি ঝুঁকিও তত বেশি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা যতবেশি, ঝুঁকিও তত বেশি হয়ে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে ছোট-খাট ঝুঁকিজনিত ক্ষতি অহরহ ঘটে থাকে। এসব ঝুঁকি নিয়ে আমাদের তেমন ভাবতে হয় না। যেমন আমাদের পকেট থেকে যে কোন সময় কলম পড়ে যেতে পারে, বাজারে গেলে কাপড়ে ময়লা লাগতে পারে। এ ধরনের ছোটখাট ঝুঁকিজনিত ক্ষতি আমরা নিজেরাই বহন করে থাকি এবং এগুলি নিয়ে আমরা ভাবি না। কিন্তু পথ চলতে গিয়ে দুর্ঘটনায় হাত পা ভেঙ্গে যেতে পারে। সন্ত্রাসী কিম্বা ছিনতাইকারীর কবলে পড়ার আশংকা থাকে এবং যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তি দুর্ঘটনার ফলে তার মূল্যবান জীবন হারাতে পারেন। এসব ঝুঁকি নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হয়, সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

ঝুঁকি নিয়ে ভাবনা শুধু যে একালের মানুষকে করতে হয় তা নয়। পৃথিবীতে যখন মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটল, তখন থেকেই তাকে ভাবতে হয়েছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) কে যখন বেহেশত থেকে মাটির পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়ে দিলেন তখন থেকেই শুরু হল অনিশ্চয়তাপূর্ণ মানবজীবন। বেহেশতে সব কিছুই ছিল নিশ্চিত। কিন্তু পৃথিবীর জীবন সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তায় ভরা। এখানে মানুষকে বাঁচতে হয় পরিশ্রম করে। চাইলেই সবকিছু পাওয়া যায় না। এছাড়া প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গেও মানুষকে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প এ সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে কোন সময় আমাদের জীবনকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। অতীতেও মানুষকে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়েছে। এছাড়া হিংস্র জীব-জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। পাহাড়ের গুহায় কিংবা গাছের ডালে মানুষ বসবাস করেছে। গাছের ডাল অথবা পাথর নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। এসব কিছুই হচ্ছে ঝুঁকি মোকাবেলার বিভিন্ন পদ্ধতি। লক্ষ্যণীয় যে, ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষেত্রে মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সবসময় ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

একালের মানুষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মানব সৃষ্ট দুর্যোগকেও মোকাবেলা করতে হয়। যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সাথে সাথে অনেক নতুন নতুন ঝুঁকি ও দুর্ঘটনার ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে। সময় বাঁচানোর জন্য আমরা নানা ধরনের যানবাহন আবিষ্কার করেছি। কিন্তু কোন যানবাহনই নিরাপদ নয়। তাই বলে আমরা সারাজীবন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটাতে পারি না। আবার ঘরের মধ্যে শুধু ঘুমিয়ে কাটালেও যে কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না বা মৃত্যুর আশংকা থাকবে না তাও সঠিক নয়। ঘরের ছাদ বা দেয়াল ধ্বসেও

www.pathagar.com

মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। ক্ষুদ্র প্রাণী ডেঙ্গু মশার কামড়েও মৃত্যু হতে পারে। সুতরাং ঝুঁকি নিয়েই আমাদের জীবন পথে চলতে হবে এবং ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য অথবা ঝুঁকিজনিত ক্ষতির আশংকা নিরসনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা নিতে হবে।

ভাবিয়া করিও কাজ

বলা হয় যে, অনিশ্চয়তা জীবনের একটি নিশ্চিত বিষয়। প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও প্রতিটি কাজেই আছে অনিশ্চয়তা। জীবন সাথী নির্বাচনে, ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে, কিংবা দৈনন্দিন জীবনের যে কোন কেনাকাটায় যা আশা করা হয় তা বাস্তবে নাও হতে পারে। অতএব, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমরা চেষ্টা করি। এই জন্য বাংলা প্রবাদে বলা হয়েছে "ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।" বাস্তবিকপক্ষে অনিশ্চয়তাপূর্ণ জীবনে প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। আমাদের মহানবী (সাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন যে, পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। যেমন ঃ

১. বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের,
২. রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে স্বাস্থ্যের,
৩. দারিদ্র্য আসার আগে স্বচ্ছলতার,
৪. ব্যস্ত হয়ে যাবার আগে অবসর সময়ের এবং
৫. মৃত্যু আসার আগে জীবনের। (মেশকাত)

মহানবীর এই বাণী বা উপদেশে আমাদেরকে দৈনন্দিন জীবনের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি মোকাবেলার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। কারণ চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে জীবনের অনিশ্চয়তা থেকে অনেক ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যেতে পারে এবং অনেক দুঃখ-দুর্দশার অবসান হতে পারে। অন্ধকারে না হাতড়িয়ে পথ চলার ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা মোতাবেক সামনে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। ঝুঁকি আছে বলেই কোন সিদ্ধান্ত হতে বিরত থাকা সুস্থ জীবনের জন্য সহায়ক নয়। জীবনকে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার জন্য ঝুঁকি মোকাবিলা করার সঠিক পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করে ধাপে ধাপে বিচার, বিশ্লেষণ করে ঝুঁকি নিরূপণ ও নিরসনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

জীবনে চলার পথে কোন কোন কাজ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এবং কোন কোন কাজ কম ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কোন কোন ক্ষতির আশংকা খুবই কম আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতির আশংকা খুবই বেশি। তাই স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় সম্ভাব্য বিকল্পসমূহের মধ্যে কোনটি সে গ্রহণ করবে এবং কোনটি সে পরিহার করবে। মনে করুন, আপনার আজীবন স্বপ্ন নিজের জন্য একটি ছোট বাড়ির। কিন্তু একটা বাড়ি

www.pathagar.com

তৈরি করতে কিংবা একটি ফ্লাট কিনতে যত অর্থের প্রয়োজন তা আপনার নেই। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আপনার পক্ষে হয়ত একটি বাড়ি করা বা ফ্লাট কেনা সম্ভব হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ভাবতে হবে কিভাবে আপনি ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করবেন? আপনার আয় কি কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য যথেষ্ট? যদি আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েন কিংবা আপনার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয় তা হলে ঋণের টাকা পরিশোধ হবে কিভাবে? যদি ভূমিকম্প, বন্যা কিংবা আগুনে আপনার বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেই ক্ষতি কিভাবে পূরণ করা সম্ভব?

এসব কিছু নিয়েই আপনাকে অবশ্যই ভাবতে হবে। অগ্রিম চিন্তা ভাবনা করে আপনি হয়ত ভাবতে পারেন বাড়ি তৈরি বা ফ্লাট না করে আপনি ভাড়া বাড়িতেই থাকবেন এবং আপনার সঞ্চিত অর্থ কোথাও বিনিয়োগ করে সেখান থেকে লাভ পেতে পারেন। কিন্তু বিনিয়োগে কোথাও লাভ কম হবে কোথাওবা বেশি হতে পারে। আবার বিনিয়োগের লাভ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকলেও পুঁজি হারাবার আশংকা থাকে। অতএব, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকি ও কম ঝুঁকির মধ্যে যে কোন একটি আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে।

মনে করুন, আপনি বাড়ি করার সিদ্ধান্ত বাদ দিলেন। বাড়ি না কিনে আপনি কিনতে চাইলেন একটি গাড়ি। এখানেও অনেকগুলি সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে। কোন্ ব্রান্ডের গাড়ি কিনবেন? কয় দরজা বিশিষ্ট এবং কতটি সীট হবে? নতুন না পুরাতন ইত্যাদি। এরপরে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে গাড়িটি নিজে চালাবেন না ড্রাইভার রাখবেন? গাড়িটি পেট্রোলচালিত হবে না গ্যাসচালিত হবে? প্রতিটি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই রয়েছে সুবিধা-অসুবিধা বা সর্বোপরি অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি। দুর্ঘটনার ফলে গাড়ির কিংবা জীবনের ক্ষতির আশংকা আছে। অতএব ঝুঁকি নিয়ে ভাবনা আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ।

আমাদের জীবনে যে সব ঝুঁকি আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে কোন সময়ে মৃত্যুর আশংকা, বার্ধক্যের অসহায়তা, অসুস্থতাজনিত অক্ষমতা, কর্মহীনতা বা বেকারত্ব। এছাড়া আমাদের সম্পদের যে কোন সময় যে কোন ক্ষতি হতে পারে। অনেক ধরনের আপদ থেকেই আমাদের বিপদ ঘটতে পারে। যেমন ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকাণ্ড বিস্ফোরণ, দুর্ঘটনা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাসী ইত্যাদি। আমাদের অসাবধানতার জন্য, অবহেলার জন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আমরা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হতে পারি। অধিকার সচেতন সমাজে অবহেলাজনিত দায়ের কারণে অনেক বড় অংকের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ফলে মানুষকে ভাবতে হয় জীবনের, সম্পদের এবং দায়জনিত ক্ষতিপূরণের মোকাবেলা সে কিভাবে করবে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ঝুঁকিকে গ্রহণীয় কিংবা সহনীয় করার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। যে কোন ঝুঁকিতে রয়েছে দুটি প্রধান বিষয়ঃ অনিশ্চয়তা ও ক্ষতি। অতএব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাজ হচ্ছে

www.pathagar.com

সেইসব পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করা যার ফলে অনিশ্চয়তাজনিত ক্ষতি হতে আমরা রেহাই পেতে পারি। যেমন ঃ

ক) ক্ষতি না হওয়ার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

খ) ঝুঁকির তীব্রতা নিরসনের চেষ্টা করতে পারি।

গ) ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং তীব্রতা নিরসনের প্রচেষ্টা সফল না হলে ক্ষতিপূরণের জন্য বৈজ্ঞানিক ও সহজসাধ্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি।

ধরা যাক, আগুনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা দালান কোঠা নির্মাণের ক্ষেত্রে সেই সব দ্রব্য ব্যবহার করতে পারি যা আগুনে সহজে জ্বলবে না। তাছাড়া অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করতে পারি এবং সর্বোপরি বীমার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অসুস্থতাজনিত ক্ষতির আশংকা থেকে মুক্ত থাকার জন্য সুষম খাদ্য অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। নিয়মিত ব্যায়াম করতে পারি। ধূমপান বা যে কোন নেশা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারি এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্য বীমা বা চিকিৎসা বীমার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

ঝুঁকিকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে নিখাদ ঝুঁকি বা Pure Risk অন্যটি হচ্ছে ব্যবসাজনিত বা ফটকাবাজারজনিত ঝুঁকি (Speculative Risk)। নিখাদ ঝুঁকি বলতে আমরা সেই ঝুঁকিকে বুঝি যার ফলে ক্ষতি হবে অথবা কোন ক্ষতি হবে না। এখানে লাভের কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা থাকে না। যেমন কোন বাড়িতে আগুন লাগলে বাড়ির মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আগুন না লাগলে তার কোন ক্ষতি হবে না। এখানে আগুন লাগা বা না লাগার ওপর বাড়ির মালিকের আর্থিক কোন লাভের সম্পর্ক নেই।

একইভাবে একটি গাড়ির দুর্ঘটনার ফলে কোন ক্ষতি হলে গাড়ির মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হন কিন্তু কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে গাড়ির মালিকের আর্থিক লাভের কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে একটি গাড়ির দুর্ঘটনা কিংবা বাড়িতে আগুন লাগাকে আমরা বলি নিখাদ ঝুঁকি। অপরদিকে, ব্যবসাজনিত ঝুঁকির ফলে একটি সম্পদের মালিকের লাভ হতে পারে, ক্ষতিও হতে পারে, অথবা লাভ বা ক্ষতি কোনটি নাও হতে পারে। যেমন– শেয়ার বাজারে যদি আপনি কোন শেয়ার কেনেন সেখানে শেয়ারের দাম বেড়ে গেলে আপনি লাভবান হবেন। শেয়ারের দাম কমলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আর শেয়ারের দাম অপরিবর্তিত থাকলে আপনার লাভ বা ক্ষতি কোনটাই হবে না।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলতে আমরা সাধারণত নিখাদ ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা বুঝিয়ে থাকি। নিখাদ ঝুঁকির সুব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষতির ক্ষেত্র ও বিস্তারসমূহ আমরা চিহ্নিত করতে পারি। যেমন একটি পোশাক তৈরির কারখানায় যদি আগুন লাগে সেখানে সম্পদের ক্ষতি হতে পারে। শ্রমিকদের জীবন নাশ হতে পারে। তৃতীয় পক্ষের কোন সম্পদের ক্ষতি কিংবা

www.pathagar.com

জীবন নাশের জন্য কারখানার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে। এ ছাড়াও বেশ কিছুদিন কারখানা বন্ধ থাকলে কারখানার মালিকের নীট আয় কমে পাবে। ঝুঁকিজনিত এ ধরনের ক্ষতির আশংকা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যা একজন ব্যক্তি অথবা কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিখাদ ঝুঁকিজনিত সমস্যা নিরসনে সহায়তা করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বীমাযোগ্য বা বীমাযোগ্য নয় এমন সব ধরনের ঝুঁকির ক্ষেত্রে যথাযথ কৌশল অবলম্বন করা হয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ (Risk Identification)। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির কিংবা একটি প্রতিষ্ঠানের কোন কোন কারণে ক্ষতির আশংকা আছে তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। কারণসমূহ চিহ্নিত করার পর ঝুঁকিজনিত সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাপ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ক্ষতির আশংকা কতটুকু আছে বা নেই তা বিশ্লেষণ করতে হবে। ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের পর পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ নির্ধারণ করা। সাধারণত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ (Risk Control) ও ক্ষতিপূরণ (Risk Financing) ব্যবস্থার মাধ্যমে ঝুঁকি নিরসনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়।

ঝুঁকি নিরসনের (Risk Mitigation) লক্ষ্যে ক্ষতির পূর্বে কিংবা ক্ষতির পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। যেমন গাড়িতে বা বিমানে সীট বেল্ট বাঁধা হয় দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি কম হওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুর্ঘটনা যদি হয়েই যায় তাহলে ক্ষতি যথাসম্ভব কমানোর প্রচেষ্টা নিতে হবে। যেমন, আগুন লাগলে যত দ্রুত সম্ভব ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিতে হবে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে আমরা ঝুঁকি হস্তান্তর করার কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারি। অথবা ক্ষতিপূরণের জন্য নিজেরাই জরুরী বা আপদকালীন তহবিল গঠন করতে পারি। সাধারণ বীমা পলিসি ক্রয় করার মাধ্যমে ঝুঁকি হস্তান্তর করা হয়ে থাকে। বীমার বিকল্প হিসাবে স্ব-বীমা (Self Insurance) ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। স্ব-বীমা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ঝুঁকিজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য ঝুঁকি বহনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজের আয় হতে একটি জরুরী তহবিল (Emergency Fund) গঠনের মাধ্যমে আপদকালীন অবস্থায় অর্থায়নের ব্যবস্থা করে থাকেন।

বীমা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল বিষয় ঝুঁকি হলেও একটির সাথে আরেকটির তফাৎ আছে। কোন বীমা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বীমাকারী বীমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণের কিংবা থোক অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করে থাকেন। বীমা ব্যবস্থায় সব ধরনের ঝুঁকি বীমাযোগ্য নয়। একটি বীমা পলিসির মাধ্যমে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি আপদ বা দুর্যোগের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ করা হয়। কিন্তু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পদ রক্ষা করার একটি প্রক্রিয়া ও কৌশল। বীমা ব্যবস্থা অবশ্যই ঝুঁকি

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। কিন্তু বীমার পলিসি ক্রয় করলেই অল্প পরিমাণ অর্থের নিশ্চিত ব্যয় দ্বারা ক্ষতি নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বীমার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয় ঝুঁকি মোকাবেলার একটি পদ্ধতি হিসাবে। এককভাবে ঝুঁকি মোকাবেলা করা অনেক ব্যয়বহুল বা বাস্তব সম্মত নয়। সেই জন্য মানুষ সম্মিলিতভাবে ঝুঁকি মোকাবেলার যে পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে তার নাম বীমা। বাংলা প্রবাদে বলা হয়েছে, "একের বোঝা দশের লাঠি"। অর্থাৎ একজনের পক্ষে যে কাজ করা কঠিন দশজনের পক্ষে সে কাজটি করা সহজসাধ্য।

মনে করুন, একজন মুদি দোকানদার প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় করেন। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি হিসাবে তিনি একটি আপদকালীন তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে প্রতিদিনের বিক্রির টাকা থেকে তিনি পাঁচশত টাকা করে জমা রাখতে পারেন। যদি কখনও কোন বিপদ আসে তখন এই সঞ্চিত অর্থ হতে ব্যয় করার বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব।

কিন্তু তিন বা চারদিনের মাথায় যদি আগুন লেগে দোকানদারের পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে তার সঞ্চিত অর্থ থেকে এই ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হবে না। অবশ্য একটি শহরের একশত জন মুদি দোকানদার যদি সম্মিলিতভাবে প্রতিদিন পাঁচশত টাকা করে জমা রেখে একটি আপদকালীন তহবিল গঠন করেন তাহলে প্রতিদিন সেই তহবিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা হবে। সে ক্ষেত্রে ঐ একশতজন দোকানদারের মধ্যে যে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির আর্থিক ক্ষতিপূরণ এই তহবিল হতে করা সম্ভব হতে পারে। এভাবে একশত জনের পরিবর্তে যদি এক হাজার, দশ হাজার কিংবা এক লক্ষ দোকানদার অতি অল্প পরিমাণ অর্থ সঞ্চয়ের মাধ্যমে অনেক বড় তহবিল করেন তাহলে প্রতিদিন ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা বা মাত্র পাঁচ টাকা জমা করলেই জমাকৃত টাকা থেকে সবার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হতে পারে। বাস্তবিক অর্থে বীমা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সম্মিলিতভাবে ঝুঁকি মোকাবেলার এই প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে।

এ উদাহরণ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, এককভাবে ঝুঁকি মোকাবেলা করা বা ঝুঁকি কমানো বাস্তবে সম্ভব হয় না। আমাদের জীবন একটি। যারা সম্পদশালী অর্থাৎ যাদের বাড়ি গাড়ি ইত্যাদি আছে এদের অধিকাংশেরই একটির বেশি বাড়ি বা গাড়ি নেই। অতএব, নিজস্ব সম্পদ বা সঞ্চয় থেকে আপদকালীন তহবিল গঠন করা সম্ভব হয় না। যদি তহবিল গঠনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব না হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ঝুঁকি মোকাবেলার অন্যান্য পথ অবলম্বন করতে হয়।

জীবনের অনেক ঝুঁকি আছে যা আমরা নিজের কাঁধেই রেখে দেই। অর্থাৎ ঝুঁকির কারণে যদি কোন ক্ষতি হয় তা মেনে নেয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি। নিজের কাঁধে ঝুঁকি না রেখে ঝুঁকি হস্তান্তর করা যেতে পারে। যখন কোন বীমা পলিসি গ্রহণ করা হয় তখন বীমা গ্রহণকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিশ্চিত ব্যয়ের মাধ্যমে অনিশ্চয়তাপূর্ণ একটি বড় ঝুঁকি

www.pathagar.com

বীমাকারী বা বীমা কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর করে থাকেন। বীমা কোম্পানী সেই ঝুঁকি পুনঃবীমা পদ্ধতির মাধ্যমে পুনঃবীমাকারীর নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে একজনের ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে অন্যের নিকট হস্তান্তর করা হয়ে থাকে। ঝুঁকি হস্তান্তর ছাড়াও ঝুঁকি বিতরণ করে ঝুঁকি কমানো সম্ভব হতে পারে। যেমন, গৃহ বধূরা এক ঝুঁড়িতে সব ডিম না রেখে ছোট ছোট পাত্রে আলাদা আলাদা করে রাখতে পারেন। তা না হলে যদি অসতর্ক কোন মুহূর্তে ডিমের ঝুঁড়িটি পড়ে যায় তাহলে সবগুলি ডিমই ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা থাকে।

চীন দেশের লোকেরা ঠিক এভাবেই ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকির মোকাবেলা বা নিরসনের ব্যবস্থা করতেন। প্রাচীনকালে চীনের ইয়াংসী নদী দিয়ে অধিকাংশ ব্যবসা বাণিজ্য হতো। এই নদীটি খুব স্রোতস্বী ও বেগবান নদী। ফলে প্রতি বছর পণ্য বোঝাই অনেক নৌকাডুবি ঘটত। যাদের পণ্যসহ নৌকা ডুবে যেত তারা ক্ষতিগ্রস্ত হত। কেউ বলতে পারত না যে, কোন নৌকাটি ডুববে বা কোন্ পণ্যের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব, তারা এই ঝুঁকি মোকাবেলার পদ্ধতি হিসাবে একটি নৌকায় সব পণ্য বোঝাই না করে একজনের পণ্য দশ, বিশ কিম্বা ত্রিশটি নৌকায় অল্প অল্প করে বোঝাই করত। এ সব নৌকার মধ্যে একটি বা দুটি ডুবে গেলে একজন পণ্যমালিকের ক্ষতি হত মোট পণ্যের অতি অল্প অংশ। এভাবে সম্পূর্ণ ক্ষতির আশংকাকে অতি সামান্য ক্ষতির মাধ্যমে মোকাবেলা করা সম্ভব হত।

ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমা

ঝুঁকি মোকাবেলার অনেক পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। বীমা তার মধ্যে একটি। বীমা কিভাবে ঝুঁকি মোকাবেলা করে তা আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতে পারি। মনে করি বাংলাদেশের একটি ছোট আদর্শ গ্রাম। সেই গ্রামে রয়েছে পাঁচশত আদর্শ পরিবার। প্রত্যেকের রয়েছে একটি করে একই ধরনের বাড়ি। প্রতিটি বাড়ির মালিকেরই আশংকা রয়েছে যে কোন দিন যে কোন সময় হয়ত তার বাড়িতে আগুন লাগতে পারে। এই পাঁচশত বাড়ির মালিক যদি সবাই মিলে অঙ্গীকার করেন যে, গ্রামের যে কোন বাড়িতে আগুন লেগে কোন ক্ষতি হলে সম্মিলিতভাবে তারা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন। অর্থাৎ একটি বাড়িতে যদি আগুন লেগে একলক্ষ টাকার ক্ষতি হয় তাহলে প্রত্যেক পরিবার দুইশত টাকা করে চাঁদা দিয়ে সাহায্য করবেন। এভাবে সবাই সবাইকে সাহায্য করার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের যে ব্যবস্থা তাকেই আমরা বীমা বলে থাকি।

বীমা কোম্পানী কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। তারা ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার করেন তা নিজেদের কোন তহবিল থেকে নয় বরং পলিসি গ্রাহকদের প্রিমিয়াম বা চাঁদা দিয়ে একটি তহবিল গঠন করে সেই তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে পলিসি গ্রাহকদের অর্থ পলিসি গ্রাহকদের ফেরত দেয়া হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মুষ্টিমেয় হতভাগ্যের ক্ষতিপূরণ করা হয়, ভাগ্যবানদের অর্থ সাহায্য দ্বারা। একটু

www.pathagar.com

গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখব যে, বীমা ব্যবস্থার মূলভিত্তি হচ্ছে সমবায় বা পারস্পরিক সহযোগিতা। "সকলের তরে সকলে আমরা সকলে আমরা সবার তরে" সমবায়ের মূলনীতির ভিত্তিতেই বীমা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বীমা কোম্পানীসমূহ মূলত পলিসি গ্রাহকদের প্রদত্ত চাঁদা বা প্রিমিয়ামের জিম্মাদার ও ব্যবস্থাপক।

অন্যভাবে বলা যায়, বীমা হচ্ছে অনিশ্চয়তাপূর্ণ বড় ঝুঁকির বিপরীতে নিশ্চিত ক্ষুদ্র অর্থের বিনিময়। ক্ষুদ্র পরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বীমাগ্রহীতা অনুভব করেন নিরাপত্তা এবং মনের শান্তি। কেউ কেউ অবশ্য একথা ভাবতে পারেন যে, যদি আমার বাড়ীতে কখনও আগুন না লাগে তাহলে যে প্রিমিয়াম দেয়া হল তা সবটাই বৃথা। কেননা বীমা কোম্পানী প্রিমিয়ামের টাকা ফেরত দেয় না। কিন্তু তারা লক্ষ্য করলে বুঝবেন যে, তার প্রদত্ত চাঁদার মাধ্যমেই অন্য একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ করা হয় এবং তিনি যদি এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে অন্যদের দেয়া চাঁদা থেকেই তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

এ ছাড়া বীমা ব্যবস্থার সব চাইতে বড় যে অর্জন তা হচ্ছে তার মনের শান্তি ও সাহস। এভাবে বীমা মূলত একটি সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে উঠেছে। সমাজের সদস্য হিসাবে বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পরের কল্যাণের জন্য কাজ করা যায়। ফলে বীমা ব্যবস্থাকে একটি আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে ধরা হয়। আইনগতভাবে বীমা একটি বৈধচুক্তি, যেখানে একপক্ষ অন্যপক্ষের সাথে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণের বা আর্থিক সাহায্যের অঙ্গীকার করে থাকেন।

সব ধরনের ঝুঁকিরই বীমা করা যায় না শুধুমাত্র Pure Risk বা নিখাদ ঝুঁকির বীমা করা সম্ভব। অর্থাৎ যখন ক্ষতির আশংকা থাকে কিন্তু লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না শুধুমাত্র সেই ঝুঁকির বীমা করা হয়। যেমন আগুন লেগে পণ্যের ক্ষতি হলে তার বিপরীতে বীমা করা সম্ভব। কিন্তু পণ্যের মূল্য কমে যাওয়ার জন্য একজন ব্যবসায়ীর যদি ক্ষতি হয় তবে সে ক্ষতির কোন বীমা করা যায় না।

কেননা মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সেখানে ব্যবসায়ীর লাভ হবে। শুধুমাত্র ক্ষতির আশংকাজনিত ঝুঁকির বিপরীতেই বীমা ক্রয় করা যায়। যেখানে বীমাগ্রহীতার ক্ষতি হতে পারে কিন্তু না হলে লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ক্ষতি সাধন করা হলে বীমার দ্বারা কোন ক্ষতিপূরণ করা যায় না। আবার ক্ষতির পরিমাণ যদি পরিমাপ করা সম্ভব না হয় তাহলেও বীমা ব্যবস্থা দ্বারা ঝুঁকি মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। যেমন, মানব মনের দুঃখ-বেদনা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অতএব, বীমা ব্যবস্থার দ্বারা মনের আবেগের বা অনুভূতিজনিত ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয় না।

পথ ও প্রক্রিয়া

জীবনে ঝুঁকি আছে এবং ঝুঁকি নিয়ে আমাদের চলতে হয়। ঝুঁকি নিরসনের একটি বৈজ্ঞানিক পথ ও পদ্ধতির নাম বীমা। কিন্তু ঝুঁকি হস্তান্তর ঝুঁকি মোকাবেলার একটি

www.pathagar.com

পদ্ধতি। কিংবা সব ঝুঁকিই কি হস্তান্তর করা অপরিহার্য? কোন ঝুঁকির বীমা করা হবে এবং কোন ঝুঁকি নিজের কাঁধে রেখে দেয়া যাবে বা যুক্তিসংগত হবে তা অবশ্যই বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রথম জানা প্রয়োজন ঝুঁকিটি কি এবং কোথায় বা আদৌ কোন ঝুঁকি আছে কি না? যদি কোন ঝুঁকি থেকে থাকে তাহলে পরবর্তী কাজ হবে এই ঝুঁকির কারণে ক্ষতির আশংকা কত কম বা বেশি। ঝুঁকির তীব্রতা বিশ্লেষণ করার পর আমরা সহজেই বুঝতে পারব ঝুঁকিটি বড় না ছোট।

যদি ঝুঁকির পরিমাণ যৎসামান্য হয় তা হলে আমরা তা উপেক্ষা করতে পারি। কিন্তু যদি তা যথেষ্ট পরিমাণ হয় তখন আমাদের ভাবতে হবে ঝুঁকিটি পরিহার বা নিরসন করা সম্ভব কি না। যদি তা পরিহার করা যায় তাহলে আমরা পরিহার করার সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আর যদি পরিহার করা না যায় তাহলে আমাদেরকে ঝুঁকি কমানোর কোন পথ আছে কি না তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে এবং ঝুঁকি কমানোর প্রচেষ্টা নিতে হবে। ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণের পর যদি আমরা লক্ষ্য করি যে, যৎসামান্যই ঝুঁকি রয়েছে তখন তা উপেক্ষা করা যায় বা নিজের কাঁধে রেখে দেয়া যায়। কিন্তু ঝুঁকির পরিমাণ যদি খুব বেশি হয় তখন অবশ্যই ঝুঁকিটি হস্তান্তর করা হবে কিনা অর্থাৎ বীমা করা প্রয়োজন কিনা তা ভাবতে হবে। বীমা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভাবতে হবে যে, সম্পূর্ণ ঝুঁকির না আংশিক ঝুঁকির বীমা করা হবে। বীমা করা বা না করার অথবা পূর্ণ বা আংশিক ঝুঁকি বীমা করার সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে বীমা করার জন্য কত ব্যয় হবে তার ওপর। যদি প্রিমিয়ামের অংক অনেক বেশি হয় তাহলে অনেকে হয়ত বীমা করতে আগ্রহী হবেন না। যদি বীমা ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন ভাবতে হবে যে, কোন প্রতিষ্ঠান হতে বীমা ক্রয় করা সঠিক হবে। বীমা কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতা, সুনাম এবং বিপণন কর্মসূচি ইত্যাদির উপর নির্ভর করবে একজন সম্ভাব্য বীমাগ্রহীতা কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী হতে বীমা ক্রয় করতে চাইবেন। বীমাগ্রহীতার এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা হয় এবং সেটি হচ্ছে বীমা কোম্পানীর এজেন্ট বা প্রতিনিধিদের সেবার মান, আন্তরিকতা এবং যোগ্যতা।

জীবনে ঝুঁকি আছে, অতীতেও তা ছিল এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। ধনী গরীব নির্বিশেষে সবার জীবন ও সম্পদ ঝুঁকিপূর্ণ। অধিকাংশ ঝুঁকির ক্ষেত্রে সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিহ্নিত করা এবং বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। এই কাজটি শুধু তারাই করেন যারা ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন। ঝুঁকি সচেতনতা যাদের নেই তারা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হস্তান্তরের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেন না। অতএব ঝুঁকি সচেতনতা সৃষ্টি করা বীমাকারীদের অন্যতম দায়িত্ব হওয়া উচিত। দেশের প্রতিটি জীবন এবং প্রতিটি সম্পদের ক্ষেত্রেই বীমার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনার প্রথম শর্ত হচ্ছে ঝুঁকি সচেতনতা বা ঝুঁকি নিয়ে ভাবনা।

www.pathagar.com

দুই.

জীবনবীমা কি, কেন ও কিভাবে শুরু হল

বীমা সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে যেমন- জীবনবীমা ও সাধারণ বীমা। নৌ-বীমা, অগ্নিবীমা, দুর্ঘটনা বীমা, দায় বীমা ইত্যাদি জীবন বহির্ভূত (Non Life) বা সাধারণ বীমা (General Insurance)। সাধারণ বীমা হচ্ছে এক ধরনের ক্ষতি পূরণের চুক্তি, কিন্তু জীবনবীমা ও ব্যক্তি দুর্ঘটনা বীমা ঠিক তা নয়। কেননা জীবনের কোন ক্ষতিপূরণ করা যায় না। একইভাবে দুর্ঘটনার ফলে কোন অঙ্গহানি হলে আর্থিক মানদণ্ডে কোন ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। জীবনবীমা প্রকৃত অর্থে মানুষের জীবনে বিভিন্ন বিপত্তির ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থা মোকাবেলার একটি আর্থিক নিরাপত্তা পদ্ধতি। জীবনবীমা পদ্ধতিতে বীমাকারী এবং বীমাগ্রহীতার মধ্যে একটি আইনগত চুক্তি হয়ে থাকে। যেখানে বীমাকারী (Insurer) বীমাগ্রহীতাকে (Insured) চুক্তিতে যেভাবে উভয় পক্ষের সম্মতিতে শর্ত আরোপিত থাকে সেভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করেন।

জীবনবীমা একটি দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি। এখানে একজন বীমাগ্রহীতা বীমা কোম্পানীর প্রতি চরম আস্থা ও পরম বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দীর্ঘ সময় ধরে প্রদান করে থাকেন। বীমাকারী এই অর্থ প্রাথমিক খরচাদি মেটানোর পর বিনিয়োগ করে থাকেন এবং চুক্তির শর্ত অনুসারে বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর অথবা একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বীমাগ্রহীতার মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা জীবিত থাকা বীমাগ্রহীতাকে প্রদান করে। অধিকাংশ জীবনবীমার ক্ষেত্রে বীমার অর্থ অবশ্যই প্রদান করতে হয়। কিন্তু এর বিপরীতে সাধারণ বীমা একটি স্বল্প মেয়াদী চুক্তি। সাধারণত এক বছরের মধ্যে বীমাকৃত সম্পত্তির অনিচ্ছাকৃত ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন ক্ষয়ক্ষতি না হলে বীমাকারীকে কোন ক্ষতিপূরণ করতে হয় না। কোন কোন বিপত্তির (Perils) বিপরীতে সম্পদের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ করা হবে তা সাধারণ বীমার চুক্তিতে উল্লেখ থাকে।

মানব জীবনে সাধারণত যে সব বিপত্তি দেখা দেয় তা থেকে উত্তরণের জন্য জীবনবীমা করা হয়ে থাকে। এই বিপত্তিগুলি হচ্ছে বার্ধক্য, অসুস্থতা, মৃত্যু ইত্যাদি। এ ধরনের বিপত্তির ফলে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জীবনবীমার প্রচলন হয়েছে। বীমা পলিসি

www.pathagar.com

ক্রয়ের পর বীমা গ্রহণকারীকে কিস্তিতে প্রিমিয়াম বা চাঁদা দিতে হয়। এই কিস্তির অর্থ মূলত একটি বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে গৃহীত হয়। সাধারণত কোন সঞ্চয় প্রকল্পে ঝুঁকির ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। কিন্তু জীবনবীমা পদ্ধতিতে মৃত্যুর ঝুঁকি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিভিন্ন রকমের ঝুঁকি জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি হতে বীমাগ্রহীতার নিজের কিংবা তার ওপর নির্ভরশীলদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে। পরিবারের সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বীমা পলিসি ক্রয় করতে হয়।

যেহেতু জীবনবীমা একটি চুক্তি সেহেতু চুক্তি আইন (Contract Act) এখানে প্রযোজ্য। চুক্তি আইন অনুযায়ী আবশ্যিক শর্তসমূহ বীমা চুক্তির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ বীমাচুক্তিকে বৈধ চুক্তি হিসাবে গণ্য করার জন্য নিম্নলিখিত আবশ্যিক শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।

ক) অন্যান্য চুক্তির মত বীমা চুক্তিতেও দুটি পক্ষ থাকবে এবং উভয় পক্ষের চুক্তি করার যোগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ নাবালক, উন্মাদ বা পাগলের পক্ষে কোন বীমা চুক্তি করা সম্ভব নয়।

খ) একটি বৈধ চুক্তির জন্য এক পক্ষকে কোন প্রস্তাব করতে হবে এবং অন্যপক্ষকে তা গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা হতে হবে।

গ) পারস্পরিক সমঝোতা হলেই চুক্তি হয় না। চুক্তি হওয়ার জন্য আরও কতিপয় শর্ত পালিত হওয়া জরুরী। যে বিষয়ে চুক্তি করা হচ্ছে তা অবশ্যই বৈধ হতে হবে। যেমন চোরাকারবারী ব্যবসার জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সমঝোতা হলে আইনের দৃষ্টিতে তা বৈধ চুক্তি বলে গণ্য হবে না।

ঘ) একটি বৈধ চুক্তির জন্য বিবেচনার ভিত্তি (Consideration) বা বিনিময় মূল্য থাকতে হবে। জীবনবীমা চুক্তির ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতার পক্ষে বিনিময় মূল্য হচ্ছে প্রিমিয়াম বা বীমা কিস্তি প্রদান। অন্যদিকে বীমাকারী প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার হচ্ছে বিবেচনার ভিত্তি।

বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর তার পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোই জীবনবীমার মূল কথা। মৃত্যু অবধারিত কিন্তু জীবন অনিশ্চিত। অর্থাৎ কেউ জানে না কে কতদিন বাঁচবে, কিংবা কে কখন, কোথায়, কিভাবে মারা যাবে। অতএব, সুবিবেচনা প্রসূত চিন্তা থেকেই একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি জীবনবীমা করে থাকেন। কারণ তিনি জানেন যে, তার পরিবার তার আয়ের উপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে জীবনবীমা তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের অন্যান্যদের কাছে আরেকটি অর্থ উপার্জনের রাস্তা খুলে দেয়।

জীবনবীমাকে আমরা একটি ঝুঁকি হস্তান্তর প্রক্রিয়া বলতে পারি। একজন বীমাগ্রাহক তার ঝুঁকি বীমাকারীর নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে তিনি অনিশ্চয়তাকে নিশ্চয়তায়

www.pathagar.com

রূপান্তরিত করেন। অনেক বড় আর্থিক ক্ষতির আশংকা বা ঝুঁকিকে তিনি সীমিত রাখেন একটি ক্ষুদ্র পরিমাণ নিশ্চিত ব্যয়ের বিনিময়ে। তিনি বীমাকারীর নিকট প্রদান করেন একটি নির্দিষ্ট অংকের সীমিত অর্থ কিন্তু তার বিনিময়ে বীমাকারী নিশ্চয়তা প্রদান করেন অনেক বড় অংকের অর্থ। একজন বীমাকারী অনেক বীমাগ্রাহকের নিকট হতে চাঁদা বা প্রিমিয়াম সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত চাঁদার দ্বারা একটি জীবনবীমা তহবিল (Fund) গঠন করা হয়। এই তহবিল হতেই পলিসি গ্রাহকের মৃত্যু হলে কিংবা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকলে বীমাকারী চুক্তির শর্ত অনুসারে অর্থ প্রদান করেন।

বীমাকারী কী পরিমাণ চাঁদা বা প্রিমিয়াম সংগ্রহ করবেন তা নির্ভর করে কত বেশী পরিমাণ লোকের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হবে তার ওপর। যদি বীমাকারী শুধুমাত্র একটি পলিসি বিক্রি করেন সেক্ষেত্রে চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করা অসাধ্য কিংবা অবাস্তব হবে। কেননা ঐ ব্যক্তি কখন মারা যাবেন তা কেউ বলতে পারে না। তিনি দীর্ঘজীবীও হতে পারেন আবার বীমা ক্রয়ের পরেই মারা যেতে পারেন। যদি বীমাকারী ত্রিশ বছরের একজন যুবকের নিকট একলক্ষ টাকার আজীবন বীমা পলিসি বিক্রি করেন এবং বছরে পাঁচ হাজার টাকার প্রিমিয়াম ধার্য করা হয় সেক্ষেত্রে প্রথম বছরেই পলিসি গ্রাহকের মৃত্যু হলে বীমাকারীর ক্ষতি হবে প্রায় ৯৫ হাজার টাকার। কিন্তু যদি বীমাগ্রহীতা ৭০ বছর বয়সে মৃত্যু মুখে পতিত হন তাহলে তার উত্তরাধিকারীগণ পাবেন মাত্র একলক্ষ টাকা কিন্তু ততদিনে দুইলক্ষ টাকার প্রিমিয়াম তাকে দিতে হবে। উভয় অবস্থা অনেকটা ফটকা বাজারী বা জুয়ার অনুরূপ। কিন্তু কোন বীমাকারী যদি দশ হাজার ব্যক্তির নিকট পলিসি বিক্রি করতে পারেন তা হলে তার পক্ষে অভিজ্ঞতার আলোকে নির্ণয় করা সহজ হবে যে প্রতিবছর এই দশ হাজার পলিসি গ্রাহকের মধ্যে কতজনের মৃত্যুর আশংকা আছে এবং তাদেরকে কি পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে। এই হিসাবের ভিত্তিতেই তিনি নির্ধারণ করতে পারেন কত পরিমাণ চাঁদা বা প্রিমিয়াম জীবনবীমা তহবিলে জমা করা প্রয়োজন। পলিসি গ্রাহকের সংখ্যা যত বেশী হবে তত নিখুঁতভাবে এই হিসাব সম্পন্ন করা সম্ভব।

আমরা জানি মৃত্যু ঝুঁকি সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। বয়স, পেশা, স্বাস্থ্য, বংশগত ইতিহাস, অভ্যাস ইত্যাদির ওপর একজন ব্যক্তির মৃত্যু ঝুঁকি নির্ভর করে। এক ব্যক্তি হতে অন্য ব্যক্তির ঝুঁকি পৃথক হতে পারে। যার ঝুঁকি যত বেশী তাকে তত বেশী প্রিমিয়াম বা কিস্তির টাকা দিতে হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করার জন্য ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। জীবনবীমার ক্ষেত্রে তাই ঝুঁকির গাণিতিক মূল্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। ঝুঁকির গাণিতিক মূল্যের ভিত্তিতেই ঝুঁকির শ্রেণীবিভাগ করা হয় এবং ঝুঁকির ভিত্তিতেই প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়।

জীবনবীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার সারণী (Mortality Table) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পলিসি গ্রাহকদের মধ্যে কতজনের মৃত্যু কোন সময়ে হতে পারে তা মৃত্যুহার সারণী (Mortality Table) থেকে বের করা যায়। একটি জনপদের বা গোষ্ঠীর

www.pathagar.com

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হতে মৃত্যুহার সারণী তৈরী করা হয়। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের মৃত্যুহার কত হবে তার ধারণা দেয়াই হচ্ছে মৃত্যুহার সারণীর উদ্দেশ্য।

একজন বীমাগ্রাহককে কি পরিমাণ চাঁদা দিতে হবে তা নির্ভর করে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঝুঁকি কত কম বা কত বেশী তার ওপর। মৃত্যুর ঝুঁকি সবার জন্য সমান নয়। বয়স, পেশা, স্বাস্থ্য, অভ্যাস, বংশগত ইতিহাস ইত্যাদির ওপর একেক জনের ঝুঁকি একেক রকম হয়ে থাকে। তাই প্রিমিয়াম নির্ধারণ করার পূর্বে ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সংখ্যাতত্ত্ব (Statistics) ও গাণিতিক হিসাবের (Mathematical Calculation) ভিত্তিতে বীমা গাণিতিক নীতির (Actuarial Principle) উদ্ভব হয়েছে। এই নীতিসমূহের ওপর ভিত্তি করেই প্রিমিয়ামের হার বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে নির্ণয় করা হয়। একটি সহজ গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে ঝুঁকি অনুসারে প্রিমিয়াম নির্ধারণ কিভাবে করা যায় তা আমরা দেখতে পারি। সূত্র হচ্ছে : প = (স x দ) + খ এখানে প বলতে বুঝানো হচ্ছে প্রিমিয়াম। স বলতে বুঝানো হচ্ছে ক্ষতির আশংকা বা সম্ভাব্যতা (Probability of Loss) দ বলতে বুঝানো হচ্ছে দাবির গড় পরিমাণ। খ হচ্ছে ব্যবসা পরিচালনার খরচ ও বীমাকারীর লাভের অংশ। অর্থাৎ একজন বীমাকারীকে সেই পরিমাণ প্রিমিয়াম পেতে হবে যার দ্বারা সে ভবিষ্যতে সকল দাবির অংক ও খরচ মেটানোর পর বীমাকারীর কিছু উদ্বৃত্ত লাভ হিসাবে থাকে।

জীবনবীমার ক্ষেত্রে মৃত্যুহার সারণী থেকে সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাপ করা যায়। একটি নির্দিষ্ট বয়সের নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের মধ্যে বছরের পর বছর কি হারে মৃত্যু হতে পারে তা মোটামুটি নির্ভুলভাবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে নির্ণয় করা যায়। যেমন ধরা যাক লুডু খেলায় ছক্কা পড়ার সম্ভাবনা থাকে ছয়ভাগের একভাগ। কিন্তু ছয়বার পর পর গুটি চালালে ছক্কা একবার নাও পড়তে পারে। অবশ্য যদি ক্রমাগতভাবে এক হাজার বার গুটি চালান যায় তাহলে ছয়শতবার ছক্কা পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। একইভাবে বলা যায় একটি শহরের পঁচিশ বছর বয়সের পঞ্চাশ হাজার যুবকের মধ্যে প্রতি বছর কতজনের মৃত্যু হতে পারে। এভাবে অনুমান করা সম্ভব যে ভবিষ্যতে বিভিন্ন বয়সের মানুষ প্রতি বছর কত সংখ্যক মারা যেতে পারে। এই হিসাবের উপর ভিত্তি করেই প্রিমিয়ামের পরিমাণ কত হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা এবং তাদের পলিসির অংকের ওপরে নির্ভর করে কি পরিমাণ অর্থ সকল বীমাগ্রাহকদের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব। অর্থাৎ অল্প সংখ্যক মানুষের মৃত্যুজনিত দাবির ব্যয়ভার ব্যাপক সংখ্যক পলিসি গ্রাহকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার পদ্ধতিকেই জীবনবীমা বলা হয়।

মানব জীবনে রয়েছে অনেক ঝুঁকি এবং ঝুঁকি থেকে আসে বিপদ। কিন্তু আমরা কেউ আগে থেকে বলতে পারি না যে কোন মানুষ কোন ঝুঁকির কারণে কিভাবে কখন বিপদের

www.pathagar.com

সম্মুখীন হবেন। এ ঝুঁকিগুলি অনিশ্চিত। ফলে বিপদ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু বিপদের আশংকা থেকেই যায়। জীবনবীমার মাধ্যমে একজন মানুষ অনেকের সাথে তার ঝুঁকিকে ভাগাভাগি করে নিতে পারেন। আমরা কেউ আগে থেকে বলতে পারি না কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হবেন কিন্তু এটা বলা সম্ভব যে, একটি জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে কতজনের বিপদগ্রস্ত হওয়ার আশংকা আছে। যদি জনগোষ্ঠীর সদস্যরা একটি যৌথ তহবিল তৈরী করেন এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাদেরকে এই তহবিল থেকে সাহায্য করা হয় তাহলে এই পদ্ধতির মাধ্যমে সেই জনগোষ্ঠীর সম্ভাব্য সাধারণ ঝুঁকিকে সকলের মধ্যে বিতরণ করা যায়।

মূলত বীমা ব্যবস্থায় একজনের ব্যক্তিগত ক্ষতি অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া যায়। যদিও বীমাকারীর সঙ্গে বীমাগ্রহীতার চুক্তি হয় এবং এই চুক্তির বলে বীমা কোম্পানী বিপদগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে; কিন্তু বীমা কোম্পানী যে তহবিল থেকে এই অর্থ প্রদান করেন তা বীমা গ্রাহকদের প্রদত্ত চাঁদা বা প্রিমিয়াম থেকে গড়ে তোলা হয়। অতএব, পলিসি গ্রাহকদের প্রদত্ত অর্থ থেকেই জীবনবীমার টাকা প্রদান করা হয়। এর ফলে যারা বিপদগ্রস্ত হলেন তারা যেমন লাভবান হন এবং যারা বিপদগ্রস্ত হননি তারাও দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকেন। কারণ তারা জানেন যে, তাদের বিপদের ক্ষেত্রেও এই তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে।

অনেকের অর্থ একত্র করে কতিপয় হতভাগ্যকে সাহায্য করার বুদ্ধিমান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে বীমা। অনিশ্চয়তাপূর্ণ মানবজীবনকে ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করে আর্থিক নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তা বিধান করা জীবন বীমার মূল কাজ। জীবনবীমা একটি সমাজকে তথা সমাজের সকল সদস্যের অতি প্রয়োজনীয় ও কাংখিত আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। জীবনবীমার এই প্রত্যক্ষ ভূমিকার পাশাপাশি রয়েছে অনেক পরোক্ষ ভূমিকা। জাতীয় অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতেও বীমা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। একটি দেশের লক্ষ লক্ষ পলিসি গ্রাহকদের নিকট হতে নিয়মিতভাবে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে যে বিপুল পরিমাণ তহবিল গঠন করা হয় তা জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়। এই সব প্রকল্পে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। এই সব কর্মক্ষম ব্যক্তিরা আবার জীবনবীমার গ্রাহক হন। এভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে জীবনবীমা এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। লক্ষ লক্ষ লোকের সঞ্চয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতির হার কম থাকে এবং দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখতে সাহায্য করে।

প্রকৃত অর্থে জীবনবীমা একটি সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা। জীবনবীমার মাধ্যমে হতভাগ্য ব্যক্তি ও পরিবারসমূহের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব না হলে এই সমস্ত অসহায় পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হত সরকার বা রাষ্ট্রের। জীবনবীমার প্রচার ও প্রসার যত বেশী ঘটবে রাষ্ট্রীয় খাতে সমাজকল্যাণমূলক ব্যয় তত কম হবে। এভাবেই জীবনবীমা একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে।

www.pathagar.com

জীবনবীমার আইনগত ভিত্তি

একজন বীমাগ্রহীতা যখন কোন বীমা কোম্পানী হতে একটি পলিসি ক্রয় করেন তখন তার বিনিময়ে তাকে প্রিমিয়াম দিতে হয়। এখানে প্রিমিয়াম হচ্ছে এক প্রকারের চাঁদা বা সঞ্চয়। পলিসি মালিক বা বীমাগ্রহীতাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সাহায্যে জীবনবীমা কোম্পানী বিপুল পরিমাণ অংকের তহবিল গড়ে তোলে। এই তহবিল হতেই সকল পলিসি গ্রহীতাদের দাবি মেটানো হয়। বীমাগ্রহীতা এবং বীমাকারীর সম্পর্ক গড়ে উঠে একটি বৈধ চুক্তির মাধ্যমে। চুক্তি আইন (Contract Act 1872) অনুসারে একটি বৈধ চুক্তি হওয়ার জন্য আবশ্যিকভাবে কিছু শর্ত পালন করা প্রয়োজন, যেমন :

ক) চুক্তির পক্ষদ্বয়ের চুক্তি করার যোগ্যতা থাকতে হবে,

খ) উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তির বিষয়বস্তু ও শর্তাবলী সম্পর্কে ঐকমত্য হতে হবে,

গ) চুক্তির বিষয়টি বৈধ হতে হবে,

ঘ) বিনিময় মূল্য থাকতে হবে ইত্যাদি।

কিন্তু বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে এই সকল শর্ত পালিত হলেই আইনের দৃষ্টিতে বৈধ বীমাচুক্তি হয়েছে এমনটি বলা যায় না যদি না বীমা সম্পর্কীয় মৌলিক নীতিমালা মেনে চলা হয়। জীবনবীমার চুক্তির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষকে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে প্রকৃত তথ্য পেশ করতে হয়। বীমা ব্যবস্থার এই নীতিকে বলা হয় পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার নীতি (Principle of utmost Goodfaith)। বীমাগ্রহীতা যেহেতু বীমাকারীর নিকট তার ঝুঁকি হস্তান্তর করেন সেহেতু ঝুঁকি সংক্রান্ত সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য বীমাকারীর নিকট প্রকাশ করা জরুরী। কেননা বীমাকারীর দাবি পরিশোধের দায় নির্ভর করে বীমাগ্রহীতার ঝুঁকির পরিমাণের ওপর। স্বাভাবিকভাবে বীমাগ্রহীতার পারিবারিক ইতিহাস, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল তথ্য, পেশা, অভ্যাস, শখ, আয়ের উৎস ইত্যাদি সকল বিষয়ে সঠিক তথ্য যদি বীমাকারী জানতে না পারেন তাহলে তার পক্ষে বীমাগ্রহীতার প্রকৃত ঝুঁকি নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। একারণে বীমাগ্রহীতাকে চুক্তি সম্পাদনের আগেই সকল প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (All material Facts) যা তিনি জানেন বা যা তার জানা উচিত তা বীমাকারীর নিকট প্রকাশ করা অতীব জরুরী। যদি তিনি তা না করেন তাহলে বীমাকারী ইচ্ছে করলে চুক্তিটিকে বাতিল হিসাবে গণ্য করতে পারেন। এমনকি ভুলক্রমেও যদি কোন তথ্য না প্রকাশ করা হয় কিংবা বীমাগ্রহীতা যদি এমন মনে করেন যে, তথ্যটি চুক্তির বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বা প্রাসঙ্গিক নয় ক্ষেত্রেও বীমাকারী ইচ্ছা করলে চুক্তিটি বাতিল হিসাবে গণ্য করতে পারে। বস্তুত বীমাগ্রহীতার অনিচ্ছাকৃত ভুল তথ্য প্রদান কিংবা তার নিজস্ব মতামত বা চিন্তা এক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে না।

একটি তথ্য চুক্তির বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক, সম্পর্কিত এবং গুরুত্বপূর্ণ কিনা তা নির্ভর করে তিনটি প্রশ্নের জবাবের ওপর :

www.pathagar.com

১. তথ্যটি বীমাকারীর নিকট ঝুঁকি নিরূপণের জন্য প্রয়োজন কিনা,

২. বীমাকারী ঝুঁকিটি গ্রহণ করবেন কিনা এই সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সে তথ্যটি জানা প্রয়োজন কিনা,

৩. প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য তথ্যটি জানা অপরিহার্য কিনা।

তথ্য প্রকাশের এই দায়িত্ব ইতিবাচক। অর্থাৎ বীমাগ্রহীতাকে স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে সঠিক ও সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করতে হবে। সাধারণ বাণিজ্যিক চুক্তির ক্ষেত্রে এ রকম কোন রীতিনীতি মেনে চলতে হয় না। যেমন একজন ঘোড়া বিক্রেতার আইনগত কোন দায়িত্ব নেই সম্ভাব্য ক্রেতাকে ঘোড়াটির কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করা। এখানে ক্রেতাকেই সাবধান হতে হয় এবং ঘোড়াটি খোড়া কি না তা যাচাই করে নেয়ার দায়িত্ব সম্পর্কীয় তথ্য বীমাকারীর নিকট সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরা আইনগত দৃষ্টিতে একান্ত প্রয়োজন।

একটি বীমাচুক্তি যতদিন বলবৎ থাকে ততদিন পর্যন্ত তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। যদি বীমাগ্রহীতার পক্ষে কোন এজেন্ট প্রস্তাবপত্র পেশ করেন সেক্ষেত্রে সকল তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব এজেন্টের ওপর বর্তায়। আইনের দৃষ্টিতে এজেন্ট প্রস্তাবকের প্রতিনিধি। অতএব পলিসি গ্রহীতার সকল তথ্য এজেন্টের জানা উচিত এবং তা প্রকাশ করার দায়িত্ব তার। তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রস্তাবক যদি মনে করেন তথ্যটি সম্পর্কহীন বা গুরুত্বহীন এবং সে কারণে প্রকাশ করা হয়নি, আইনের দৃষ্টিতে এ ধরনের যুক্তি গ্রহণীয় হবে না। এমন কি অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল তথ্য প্রদান করা হলে কিংবা সঠিক মনে করে ভুল তথ্য প্রদান করা হলেও পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার নীতি পালিত হয়নি বলে গণ্য করা হবে। এই নীতি পালিত না হলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ চুক্তিটিকে বাতিল করার অধিকার রাখেন। তবে ইচ্ছা করলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তার অধিকার প্রয়োগ নাও করতে পারেন।

জীবনবীমা চুক্তির ক্ষেত্রে আর একটি আবশ্যকীয় মৌলিক নীতি হচ্ছে বীমাযোগ্য স্বার্থ (Insurable Interest)। বীমাযোগ্য স্বার্থ হচ্ছে বীমা করার আইনগত অধিকার। যে কোন মানুষের জীবনের ওপর যে কেউ বীমা গ্রহণ করতে পারে না। জীবন বা সম্পদ যাই হোক না কেন বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বীমা পলিসি আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ। আইনের দৃষ্টি যে কোন ব্যক্তির বীমাযোগ্য স্বার্থ তার নিজের জীবনের ওপরে রয়েছে। জীবনবীমার ক্ষেত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থ অসীম। অর্থাৎ যে কোন অংকের বীমা করা যেতে পারে যদি তার প্রিমিয়াম দেয়ার ক্ষমতা থাকে। শুধু নিজের জীবনের ওপরে নয় অন্যের জীবনের ওপরেও কোন কোন ক্ষেত্রে বীমা করা যেতে পারে। যেমন স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের জীবনের ওপর বীমা করার অধিকার রাখেন। আইন তাদেরকে এ অধিকার দিয়েছে।

বীমাযোগ্য স্বার্থ বা বীমা করার আইনগত অধিকার ব্যতিরেকে পলিসি ক্রয় করা বৈধ হলে সমগ্র সমাজে বিশৃঙ্খলা নেমে আসত। বীমাযোগ্য স্বার্থ ব্যতিরেকে বীমা পলিসি ক্রয় করা

www.pathagar.com

বৈধ হলে যে, কোন ব্যক্তির জীবনের ওপর বীমা করা সম্ভব হত এবং বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তি পলিসির টাকা গ্রহণ করতে পারেন। নীতিগত দিক থেকে এ বিষয়টি সমাজকল্যাণের বিপরীত চিন্তাপ্রসূত তাই স্বাভাবিকভাবেই বীমাযোগ্য স্বার্থ ব্যতিরেকে বীমা পলিসি বিক্রয় করা নীতি, নৈতিকতা বা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় নয়। এই কারণে জীবনবীমার কোন আবেদন পাওয়ার পর বীমাকারীকে যাচাই করতে হয় যে বীমাকৃত ব্যক্তির সাথে পলিসির প্রস্তাবক এবং পলিসি অর্থের প্রাপকের পারস্পরিক সম্পর্ক কি। যদি বীমাকৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকলে পলিসির প্রস্তাবক এবং পলিসি অর্থের প্রাপক অধিক উপকৃত হন তাহলেই বুঝতে হবে যে, বীমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে পলিসির প্রস্তাবক এবং পলিসি অর্থের প্রাপক বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু কামনা করতে পারেন না; বরং বীমাকৃত ব্যক্তির বেঁচে থাকাটাই তাদের জন্য লাভজনক এবং কাম্য। সেক্ষেত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান। প্রস্তাবক এবং বীমাকৃত ব্যক্তির মধ্যে আর্থিক ও আইনগত সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে বীমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে কিনা। বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে প্রস্তাবকের আর্থিক ক্ষতির আশংকা বিদ্যমান থাকলে বীমাযোগ্য স্বার্থ আইনের দৃষ্টিতে সিদ্ধ বলে গণ্য হয়। জীবনবীমার ক্ষেত্রে চুক্তির প্রারম্ভে বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা প্রয়োজন এবং বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

বীমাযোগ্য স্বার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ বীমা এবং জীবনবীমা পলিসির পার্থক্য মূলত এই কারণে যে, সাধারণ বীমা একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি কিন্তু মানুষের জীবনের কখনও ক্ষতিপূরণ করা যায় না। জীবনবীমার ক্ষেত্রে বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু হলে কিংবা চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে যে অর্থ প্রদান করা হয় তা মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ নয়। এই অর্থ হচ্ছে বীমাকারী এবং বীমাগ্রহীতার সম্মতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যা পলিসি প্রাপকের প্রাপ্য। এক্ষেত্রে পলিসি প্রাপককে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয় না। অতএব বীমাযোগ্য স্বার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণত চার ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করা প্রয়োজন হয় না। প্রথমত প্রত্যেকের নিজের জীবনের ওপর বীমাযোগ্য স্বার্থ স্বীকৃত। কারণ সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ নিজে কখনও নিজের মৃত্যু ঘটাতে পারে না। পলিসির প্রস্তাবক এবং বীমাগ্রহীতা যখন একই ব্যক্তি হন তখন ধরে নেয়া হয় যে, বীমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া স্বামীর জীবনের ওপর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর জীবনের উপর স্বামীর বীমাযোগ্য স্বার্থ আইন দ্বারা স্বীকৃত। একইভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ওপর পিতামাতার এবং নির্ভরশীল পিতামাতার জীবনের ওপর সন্তানের বীমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থ প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। তবে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে বিদ্যমান বীমাযোগ্য স্বার্থ প্রমাণ করা প্রয়োজন।

উপরের আলোচনা হতে আমরা বীমাযোগ্য স্বার্থের কয়েকটি সাধারণ নীতি চিহ্নিত করতে পারি যেমন :

www.pathagar.com

ক) বীমার প্রস্তাবক এবং বীমাকৃত ব্যক্তির মধ্যে বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বীমা পলিসি বিক্রয় করা যায় না।

খ) বীমার প্রস্তাবক যখন নিজের জীবনের ওপর বীমা করেন তখন বীমাযোগ্য স্বার্থ প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন হয় না।

গ) স্বামী, স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ঋণগ্রহীতা, ঋণদাতা, ব্যবসার অংশীদার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অতি গুরুত্বপূর্ণ বা অপরিহার্য ব্যক্তির জীবনের ওপর বীমাযোগ্য স্বার্থ আইন দ্বারা স্বীকৃত।

ঘ) জীবনবীমার ক্ষেত্রে চুক্তির শুরুতেই বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক। বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলেও আইনগত কোন সমস্যা হয় না।

বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে বীমাচুক্তি বৈধ হয় না এবং একইভাবে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার শর্ত যদি কোন পক্ষ ভঙ্গ করে তাহলে বীমাচুক্তি কার্যকর নাও হতে পারে। সাধারণত প্রতারণামূলক ভুল তথ্য দিলে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তথ্য গোপন করলে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার নীতি ভঙ্গ করা হয়। এমনকি অনিচ্ছাকৃত ভুল তথ্য কিংবা ভুলক্রমে কোন প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করলে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার নীতি ভঙ্গ করা হয়। এমনকি অনিচ্ছাকৃত ভুল তথ্য কিংবা ভুলক্রমে কোন প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করা না হলেও পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার নীতি পালিত হয়নি বলে গণ্য হবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ চুক্তিটিকে বাতিলযোগ্য হিসাবে মনে করতে পারেন। বীমাগ্রহীতা যদি পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার শর্ত ভঙ্গ করেন তখন বীমাকারী চুক্তিটি বাতিলযোগ্য হিসেবে মনে করতে পারেন। প্রতারণামূলকভাবে ভুল তথ্য প্রদান করা হলে বীমাকারী চুক্তি বাতিলের পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন। এরকম ক্ষেত্রে বীমাকারীর তিনটি পথ খোলা থাকে যেমন :

ক) শর্তভঙ্গের ব্যাপারটি উপেক্ষা করে চুক্তিটিকে বৈধ বলে গণ্য করা।

খ) শর্ত ভঙ্গের কারণে বীমার টাকা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা।

গ) বীমাচুক্তি বাতিলের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করা।

তবে সাধারণত বীমা কোম্পানী কোন মামলা মোকদ্দমা না করে প্রিমিয়াম গ্রহণ বন্ধ করে দিতে পারেন তখন স্বাভাবিকভাবে পলিসিটি আর কার্যকর থাকে না। বীমাকারী যে পন্থা গ্রহণ করুক না কেন বীমাগ্রহীতা ইচ্ছা করলে বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে।

একজন বীমাগ্রহীতা বীমা প্রস্তাবপত্রে (Proposal Form) যে সব তথ্য প্রশ্নের উত্তর হিসেবে দিয়ে থাকেন এবং ভবিষ্যতে যে সমস্ত তথ্য বীমাকারীকে জানাবেন সেগুলো সব সত্য এই মর্মে একটি ঘোষণা প্রদান করতে হয়। যদি পরবর্তীকালে বীমাগ্রহীতার দেয়া কোন তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে বীমাকারী চুক্তিটিকে বাতিল বলে গণ্য করতে

www.pathagar.com

পারেন এবং বীমা কিস্তির টাকাও বাজেয়াপ্ত হতে পারে। এছাড়া বীমা পলিসিতেও পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয় যে, বীমাগ্রহীতার তথ্যের ভিত্তিতেই বীমা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ভবিষ্যতে বীমা চলাকালীন সময়ে বীমাগ্রহীতা প্রদত্ত তথ্য অসত্য, প্রতারণামূলক প্রমাণিত হয় এসব ক্ষেত্রেও বীমাকারী কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বীমাচুক্তি বাতিল করতে পারেন।

বীমা আইন অনুসারে (Insurance Act) বীমা চুক্তি সম্পাদনে দুই বছর পরে ভুল বা মিথ্যা তথ্যের অজুহাতে আদালতের রায় ব্যতিরেকে চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। এক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল করতে হলে বীমাকারীকে আদালতের নিকট নিম্নের যে কোন একটি বিষয় সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করতে হবে :

ক) বীমাগ্রহীতা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে যে তথ্যটি জানানো উচিত তা গোপন করেছেন,

খ) বীমাগ্রহীতা সজ্ঞানে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছেন,

গ) বীমাকারীকে ঠকানোর জন্য ঘোষণা বা তথ্য গোপন করা হয়েছিল,

ঘ) যে সমস্ত অসত্য ও প্রতারণামূলক ঘোষণা দেয়া হয়েছে অথবা যে সমস্ত তথ্য গোপন করা হয়েছে তা চুক্তির ঘোষণার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ বা বিপরীত।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বাসের প্রশ্নটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বীমাগ্রহীতাই ভাল করে জানেন তার নিজের সম্পর্কে। সুতরাং তার একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিষ্কারভাবে এবং সঠিকভাবে জানানো। কারণ এই সমস্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করে বীমাকারী বীমাগ্রহীতার আর্থিক ঝুঁকি নিরূপণ করেন এবং তদনুযায়ী প্রিমিয়াম নির্ধারণ করেন।

জীবনবীমা ব্যবস্থা এমন একটি পদ্ধতি যেখানে বীমাগ্রহীতাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রিমিয়ামের ভিত্তিতে একটি বড় তহবিল গঠন করা হয়। যেহেতু সব বীমাগ্রহীতার ঝুঁকি একরকম নয় সেহেতু প্রত্যেক বীমাগ্রহীতার ঝুঁকি অনুসারে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা জরুরী। এই কারণে বয়স, স্বাস্থ্য, অভ্যাস, মৃত্যুর হার, মুনাফা বা সুদের হার ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে প্রিমিয়ামের অংক নির্ধারণ করতে হয়। যে গাণিতিক নীতির সাহায্যে বর্তমানের প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয় তাকে বীমা গাণিতিক নীতি (Actuarial Principles) বলা হয়।

একথা সত্য যে, কারও পক্ষেই আগে থেকে তার মৃত্যুর দিন তারিখ জানা সম্ভব হয় না। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে একটি জনগোষ্ঠীর মৃত্যুহার অভিজ্ঞতা (Mortality Experience) নির্ণয় করা সম্ভব। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বিশেষজ্ঞগণ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও তথ্যের ভিত্তিতে রচনা করেন মানুষের মৃত্যুহার সারণী (Mortality Table)। অর্থাৎ তিনি নিরূপণ করেন একটি জনপদে বিভিন্ন বয়সে

www.pathagar.com

ভবিষ্যতে কত সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হতে পারে। বীমাকারীগণ মৃত্যুহার সারণীলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করেন ভবিষ্যতে কতজন বীমাগ্রহীতার মৃত্যু হতে পারে এবং এ কারণে বীমাকারীকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে তা কিভাবে সকল বীমাগ্রহীতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া যায়।

জীবনবীমা কেন?

মানুষ একটি সামাজিক জীব। সমাজের নাগরিক হিসাবে তাকে পালন করতে হয় বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রথমত: পরিবারের প্রতি একজন নাগরিকের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করা প্রয়োজন। পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে গৃহকর্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গৃহকর্তার আয়ের ওপরে নির্ভর করে পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি। পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে গৃহকর্তাকে ভাবতে হয় ভবিষ্যতে নিরাপত্তার কথা। যে কোন সময় জীবনের যে কোন বিপত্তি থেকে যদি গৃহকর্তা বেকার, পঙ্গু, কিংবা অসুস্থ হন অথবা অল্প বয়সে তার মৃত্যু হয় তাহলে পরিবারের সদস্যদের জীবন-ধারণ দুঃসহ হয়ে পড়ে। এছাড়া বার্ধক্যেও যখন তার আয় করার কোন সামর্থ্য থাকবে না তখন তার নিজের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি তাকে ভাবতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে কারও গলগ্রহ হয়ে থাকা বা কারও আর্থিক সাহায্যে কালাতিপাত করার বিড়ম্বনা মানুষ কামনা করে না। তাই নিজের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েও তাকে ভাবতে হয়।

একটি পরিবারের সবচেয়ে বড় আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হয় গৃহকর্তার আকস্মিক মৃত্যুর কারণে। ৩০ বা ৩৫ বছর বয়সে যদি কোন গৃহকর্তার মৃত্যু হয় তাহলে সে পরিবারের জন্য আর্থিক ক্ষতি হবে সেই পরিমাণ টাকা যা তিনি সারা জীবনে কর্মক্ষম থাকা অবস্থায় আয় করতে পারতেন। পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য তার সঞ্চায় অর্জিত আয়ের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হত। গৃহকর্তার মৃত্যুর ফলে পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যয় মিটানো তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। এই বিপুল ক্ষতির বোঝা যথাসম্ভব লাঘব করার জন্য জীবনবীমার প্রয়োজন।

গৃহকর্তার অসুস্থতার ফলেও একটি পরিবারের সদস্যদের জীবনে নেমে আসতে পারে এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। বস্তুত: মৃত্যুর চাইতেও এ ক্ষেত্রে দুর্দশা অনেক বেশী হতে পারে; কেননা অসুস্থতার ফলে যদি তিনি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যান তাহলে তিনি আর আয় করতে সমর্থ হবেন না কিন্তু একই সাথে তার নিজের চিকিৎসা ও সেবার জন্য প্রয়োজন হবে বিপুল পরিমাণ অর্থের। তিনি তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনে শুধু ব্যর্থই হবেন না বরং তাকে বেঁচে থাকতে হবে অন্যের করুণার পাত্র হয়ে। তার শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি মানসিক যন্ত্রণাও বাড়তে থাকবে।

www.pathagar.com

একালে চিকিৎসা ব্যয় যেমন ক্রমাগতভাবে বাড়ছে তেমনি নানা রকম ঘাতকব্যাধি মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে, হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি রোগের ফলে মানুষের মৃত্যুহার অত্যন্ত আশংকাজনকভাবে বেড়ে যায়। এছাড়া পরিবেশ দূষণের কারণে শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। যেহেতু অসুস্থতা যে কোন মানুষের যে কোন সময় হতে পারে, সেহেতু বীমা পদ্ধতির মাধ্যমে ভবিষ্যতের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এজন্য মানুষ জীবনবীমার সাথে বা পাশাপাশি স্বাস্থ্য বীমা বা চিকিৎসা বীমা সেবা গ্রহণ করতে আগ্রহী।

মৃত্যু ও অসুস্থতা সম্পর্কে আগাম কেউ বলতে পারে না। কিন্তু অবধারিত বার্ধক্য আমাদের মেনে নিতেই হয়। পরিণত বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকা মানুষের একান্ত কামনা। কিন্তু বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা এবং অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সমস্যা ও অসহায়ত্ব অনেক বেশী করুণ ও মনোঃকষ্টের কারণ হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সামাজিক বীমার কোন ব্যবস্থা নেই ফলে পুত্র, কন্যা বা আত্মীয়স্বজনের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া বৃদ্ধ বয়সের আর্থিক প্রয়োজন মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। খুব কম সংখ্যক ব্যক্তির পক্ষেই বৃদ্ধকালের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিপুল সঞ্চয় সম্ভব হতে পারে। এছাড়া যৌথ পরিবার প্রথা ক্রমশ ভেঙ্গে যাচ্ছে, ফলে পুত্র, কন্যার নির্ভরশীল হওয়াও বাস্তবে সম্ভব হয় না। অতএব, ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। জীবন বীমার বিভিন্ন উপযোগী পলিসি এ প্রয়োজন মেটাতে পারে। আমাদের সমাজে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধ নরনারীর সংখ্যা বাড়ছে। আগামীতে এ সংখ্যা আরো বাড়তে থাকবে। বাংলাদেশে ষাটোর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং বাড়বে। হঠাৎ মৃত্যুর আশংকা হতে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাবনা দ্বিগুণেরও বেশী। অতএব, বৃদ্ধ বয়সের জন্য প্রস্তুতি অবশ্যই আমাদের থাকতে হবে। জীবনবীমা সঞ্চয় ও নিরাপত্তা উভয়েরই ব্যবস্থা করে থাকে। জীবনবীমার মাধ্যমে মাসিক পেনশন বা বার্ষিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই মানুষ জীবনবীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়।

জীবনবীমা আমাদের প্রয়োজন মেটায় বলেই জীবনবীমা এত প্রয়োজন। আবার বলা যেতে পারে যে, জীবনের জন্যই জীবনবীমার প্রয়োজন। আর্থিক নিরাপত্তার জন্য জীবনবীমার প্রয়োজন। এমন এক সময় ছিল যখন সংঘবদ্ধভাবে মানুষ বসবাস করত। যৌথ পরিবার প্রথা ছিল আমাদের সমাজের প্রতিচ্ছবি। পরিবারের কর্তা, যৌথ পরিবারভুক্ত সকল সদস্যের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। কিন্তু আজকে সম্মিলিতভাবে সমস্যা মোকাবেলার বা আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের কোন পদ্ধতি চালু নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে জীবনবীমা পদ্ধতি ব্যতিক্রম এবং অনন্য। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে জীবনবীমার সহায়তায় পরিবারের সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা সহজসাধ্য হয়েছে। যে কোন সচেতন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই মনেপ্রাণে চাইবেন

www.pathagar.com

কিভাবে তিনি তার পরিবারের সদস্যদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবেন। কারণ তিনি জানেন যে কোন সময় যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বা অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা তার ছন্দময় সুখী সুন্দর জীবনের ছন্দপতন ঘটাতে পারে।

অর্থকে অনর্থের মূল বলা হলেও আমরা সবাই জানি অর্থ জীবনের প্রয়োজন মেটায়। অর্থ প্রয়োজন হয় দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটাবার জন্য। আমাদের চাহিদার কোন শেষ নেই এবং সব ধরনের চাহিদার প্রয়োজন মেটায় অর্থ, সম্পদ ইত্যাদি। অর্থের প্রয়োজন হয় মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য, আরাম আয়েশের জন্য কিংবা বিলাসের জন্য। অর্থের প্রয়োজন হয় বর্তমানের, নিকট ভবিষ্যতের এবং দূর ভবিষ্যতের সকল প্রয়োজন মেটাতে। পরিবারের সকল সদস্যদের দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা তথা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয় ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন অর্থের। পরিবারের কর্তাকে এসব নিয়ে ভাবতে হয় এবং অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা নিতে হয়। তাকে এও ভাবতে হয় যে, তিনি যদি অসুস্থ হন কিংবা কোন দুর্ঘটনায় বা অসুস্থতায় পঙ্গু হয়ে পড়েন কিংবা তার যদি অকাল মৃত্যু হয় তাহলে পরিবারের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে যে অর্থের প্রয়োজন তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। বাস্তবতার এই নিরিখে পরিবারের কর্তাকে তার আয় হতে এমন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যা তার আজকের প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে।

জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের ফলেই মানুষের সন্তুষ্টি আসে না। সে চায় তার ছেলে দেশে কিংবা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করুক, তার মেয়ের ভাল বিয়ে হোক এবং কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি যেন নিশ্চিত, নিরাপদ ও স্বচ্ছল জীবন-যাপন করতে পারেন। গৃহকর্তার আয় করবার ক্ষমতা থাকুক বা নাই থাকুক কিংবা তিনি যদি বেঁচে না থাকেন তাহলেও এসব চাহিদার শেষ হবে না। এই ক্রমাগত চাহিদা বিভিন্ন সূত্র থেকে মেটানো সম্ভব হতে পারে। যেমন-

ক) গৃহকর্তার সঞ্চয় হতে;

খ) আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের অনুদান বা সাহায্য হতে;

গ) পুত্র, কন্যার উপার্জন হতে;

ঘ) সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার সাহায্য বা ঋণ হতে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে, আমাদের অধিকাংশ লোকেরই সঞ্চয়ের অভ্যাস নেই বললেই চলে। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, কিংবা সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার সাহায্য যে সব সময় পাওয়া যাবে এমনটিও নয়। পুত্র, কন্যার আয় বা উপার্জনের ওপর নির্ভর করাও সুবিবেচনাপ্রসূত ও বাস্তবসম্মত নয়। সব পরিবারের গৃহকর্তারই রয়েছে দায়িত্ববোধ, ভালবাসা, আবেগ ও অনুভূতি। অতএব তারা মনে করেন যে, একটি উপযোগী সঞ্চয় পরিকল্পনা তথা উপযুক্ত জীবনবীমা এসব সমস্যার সমাধানে সুন্দর ভূমিকা রাখতে পারে।

www.pathagar.com

একজন মানব শিশু এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর ক্রমশ সে ধীরে ধীরে বড় হয় এবং কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। সে তার শারীরিক শ্রম কিংবা মেধার সাহায্যে উপার্জন করতে শুরু করে। সে স্বপ্ন দেখে সুন্দর এক জীবনের। বেছে নেয় একজন জীবন সাথীকে। গড়ে তোলে সংসার জীবন। তাদের সংসারেও আসে ফুটফুটে শিশুরা। যাদের সুন্দর ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু আর্থিক পরিকল্পনা তৈরী করতে হয়। সংসারে পিতা মাতাকে ভাবতে হয় আগামী অনিশ্চয়তার কথা। তারা জানেন না তাদের কার কতদিন আয়ু। কেউ অকালে ঝরে যেতে পারেন আবার কেউ বা হতে পারেন দীর্ঘজীবী। উভয় ক্ষেত্রেই সুপরিকল্পিত আর্থিক কোন পরিকল্পনা না থাকলে সমস্যার উদ্ভব হয়। তারা যদি সঞ্চয়ী হন তাহলে সেই সঞ্চয় থেকে ভবিষ্যতের আর্থিক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হতে পারে। যদি গৃহকর্তার হঠাৎ মৃত্যু হয় তাহলে অতি সামান্য সঞ্চয় দিয়ে সব প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। আবার কেউ যদি দীর্ঘজীবী হন তাহলেও সীমিত সঞ্চিত অর্থে দীর্ঘদিনের জীবন যাত্রার ব্যয় সংকুলান সম্ভব নাও হতে পারে। অতএব, এমন একটি সঞ্চয়ী ব্যবস্থার প্রয়োজন যার দ্বারা উভয় ক্ষেত্রেই আর্থিক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। জীবনবীমা হচ্ছে সেই ধরনের ব্যবস্থা যা নিয়মিত সঞ্চয় ও আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়।

এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আকুতি সকল মানুষের। কবির ভাষায় আমরা বলে থাকি "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে বাঁচিবারে চাই।" বস্তুত কবির এই কামনা সব মানুষের মনের কথা। কিন্তু বাস্তবতা বড় নির্মম। কারণ মৃত্যুর শীতল হাত সবাইকে স্পর্শ করে। তাই মানুষ চায় দীর্ঘায়ু হতে। প্রার্থনায়, আশীর্বাদে স্নেহের মায়ায় আমরা একে অন্যের দীর্ঘায়ু কামনা করি। কিন্তু বার্ধক্যের বিড়ম্বনা কিংবা বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি আমরা খুব কমই ভেবে থাকি। পরিণত বয়সে মানুষের কর্মক্ষমতা ও আয়ক্ষমতা কমে যায় বা একেবারেই থাকে না। এই অবস্থায় মানুষের জন্য প্রয়োজন এমন একটি সঞ্চয় পরিকল্পনা এবং এমন ধরনের সম্পদ অর্জন যা বৃদ্ধ বয়সের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। একটি জীবনবীমা পলিসি বৃদ্ধ বয়সের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে অনন্য এবং অসাধারণ। বস্তুত জীবনবীমা হচ্ছে এমন একটি সম্পদ যা অল্প পরিমাণ কিস্তির বিনিময়ে অর্জন করা সম্ভব এবং এই সম্পদ হতে আয় ঠিক প্রয়োজনের সময় নিশ্চিত করা যায় এবং প্রয়োজনে আজীবন এই আয়ের উৎস অব্যাহত থাকে। বীমাগ্রহীতার পক্ষে বীমা কোম্পানী তহবিল ব্যবস্থাপনার কাজটি করে থাকেন। পলিসি গ্রাহকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সাহায্যে বিশাল তহবিল গড়ে তোলা হয়। এই তহবিলের সুষ্ঠু বিনিয়োগ এবং অধিক লাভের ব্যবস্থা করা বীমা কোম্পানীর দায়িত্ব। পেনশন বীমা পলিসি কিংবা বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণের মাধ্যমে (Annuity) বৃদ্ধকালীন আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সুন্দর পদ্ধতি রয়েছে বীমা ব্যবস্থায়।

মানব জীবনে বেকারত্ব কিংবা পঙ্গুত্বের অভিশাপ খুবই নির্মম হয়ে ধরা পড়ে। সাধারণত একজন চাকুরীজীবীর আয় সীমিত, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের কোন সঞ্চয় থাকে

www.pathagar.com

না। তাই হঠাৎ করে যদি কোন কারণে সাময়িকভাবে কাউকে বেকারত্বের মুখোমুখি হতে হয় তখন সংসার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার এক অধ্যায়। অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনার কারণে কোন ব্যক্তি যদি সাময়িক, দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী পঙ্গুত্বের শিকার হতে হয় সেক্ষেত্রেও একই ধরনের দুর্ভোগ এবং অসহায়ত্ব জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। জীবনবীমা ব্যতিরেকে অন্য কোন সঞ্চয়ব্যবস্থা দ্বারা পঙ্গুত্ব বা বেকারত্বের মত বিপদকালীন অবস্থা হতে উত্তরণ সম্ভব নয়।

জীবনবীমা একটি বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে এখন বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এসব প্রকল্পে সম্পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত নিয়মিত সঞ্চয় করা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু বীমার ক্ষেত্রে মেয়াদের শেষ কিস্তি পর্যন্ত প্রিমিয়াম দেয়ার তাগিদ বীমাকারী এবং বীমাগ্রহীতা উভয়ে অনুভব করেন। বীমাকারী নিয়মিতভাবে তাগিদ দিয়ে বীমাগ্রহীতাকে নিয়মিত প্রিমিয়ামের টাকা জমা দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। ব্যাংকের নিকট টাকা জমা দেয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। অতএব, দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় ব্যবস্থা হিসেবে এবং আপদকালীন নিরাপত্তা প্রদানের স্কীম হিসেবে জীবনবীমার কোন বিকল্প নেই। দুর্দিনের বন্ধু হিসেবে জীবনবীমা তাই একান্ত প্রয়োজন।

নিরাপত্তার বিষয়টি মানুষকে সব সময় ভাবিয়ে তোলে। একজন নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রধানত রাষ্ট্র এবং সরকারের। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়ে; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তথা সুশাসনের ভিত্তিতে সকল নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল নাগরিকের আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি তথা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সামগ্রিক মানবকল্যাণের জন্য সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে একটি পরিবারের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সকল দায়-দায়িত্ব সেই পরিবারের সদস্যদেরকেই নিতে হয়। পরিবারের সকল সদস্য পিতামাতার আয়ের ওপর নির্ভরশীল। সন্তান-সন্ততি যতদিন পর্যন্ত না নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে, নিজেরা রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে, ততদিন পর্যন্ত তাদের সকল প্রয়োজন মেটানোর দায়-দায়িত্ব পিতামাতা বা অভিভাবককে নিতে হয়। বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে সামাজিক বীমার (Social Insurance) কোন ব্যবস্থা নেই। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সকল নাগরিকের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করা বাস্তবে সম্ভব নয়। অতএব, জীবনবীমার মাধ্যমে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের সুব্যবস্থা করা একান্ত অপরিহার্য। জীবনের এই বাস্তবতার নিরিখে মানুষ জীবনবীমা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে। উদ্বিগ্নতা কমাতে জীবনবীমা ব্যবস্থা অসাধারণ এক ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলেই মানুষ ক্রমশ জীবনবীমা ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো হবে।

www.pathagar.com

বীমার উৎপত্তি ও বিকাশ

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বীমা বলতে জীবনবীমা বুঝে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে বীমা ব্যবস্থার উৎপত্তি জীবনবীমা থেকে নয় বরং নৌ-বীমা থেকে। সমুদ্রপথে নৌযান চলাচলের ক্ষেত্রে নানারূপ ঝুঁকির মোকাবেলা করতে হত। জলদস্যুতা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য জাহাজের নাবিকদের বিভিন্ন রকম প্রতিকূলতার মধ্যে সমুদ্রে যাত্রা সম্পন্ন করতে হত। জাহাজ এবং জাহাজবোঝা পণ্যের সুরক্ষা নাবিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। ফলে জাহাজের মাস্টারকে এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হত যার ফলে যে কোন বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পেয়ে নির্বিঘ্নে সমুদ্র যাত্রা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। যেমন যদি কখনও একটি জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যাওয়ার আশংকা থাকে তখন জাহাজটিকে হালকা করার জন্য জাহাজের মাস্টারকে জাহাজ হতে কোন কোন পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা বা ফেলে দেয়া প্রয়োজন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে যে পণ্যগুলি ফেলে দেয়া হত সেই পণ্যের মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতেন। কিন্তু এর বিনিময়ে রক্ষা পেত জাহাজের অন্যান্য পণ্য এবং সেই জাহাজটি। ন্যায়-নীতির দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য মালিকরা স্বাভাবিকভাবেই এর জন্য ক্ষতিপূরণ আশা করতে পারেন। যেহেতু কোন বীমা ব্যবস্থা ছিল না সেহেতু সাধারণ ন্যায়-নীতি অনুসরণ করে উদ্ধার পাওয়া জাহাজের মালিক এবং সেই জাহাজের পণ্যের মালিক আনুপাতিকভাবে চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য মালিকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। সম্মিলিতভাবে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এই ধরনের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থেকেই আধুনিক নৌ-বীমার উৎপত্তি হয়েছে বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন।

আধুনিক বীমা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন কোথায়, কখন এবং কিভাবে হয়েছিল তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। তবে অনেকেই ধারণা করেন যে, ইটালী থেকে আগত ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য দেশে তা বিস্তার লাভ করে। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে ইটালীর ব্যবসায়ীরা নৌ-বীমার প্রচলন করেন বলে অধিকাংশ বীমাবিদগণ মনে করেন। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকে ইটালীর ব্যবসায়ীরা লন্ডন শহরে বসতি গড়ে তোলেন। তাদের মাধ্যমেই ইংল্যান্ডে আধুনিক নৌ-বীমার উদ্ভব ঘটে। বীমা সংক্রান্ত চুক্তিতে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে তা নিষ্পত্তি সহজসাধ্য ছিল না। কারণ ইটালীর আইন কানুন সম্পর্কে ইংল্যান্ডের আইনবিদদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমিত। এ ধরনের বিরোধ বন্ধ করার লক্ষ্যে ১৫৭৫ সালে নৌ-বীমা পলিসির রেজিস্ট্রি করার জন্য একটি অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা "চেম্বার অফ এ্যাসিউরেন্স" নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে ১৬০১ সালে নৌ-বীমার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি সালিসী আদালত স্থাপিত হয়। এভাবে ইংল্যান্ডে নৌ-বীমার গোড়াপত্তন হয়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে লন্ডন শহরের কফি হাউজগুলো ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। এই কফি হাউজগুলোতে অনেক বড় বড় চুক্তি সম্পাদন করা হত যেমন

www.pathagar.com

নিলামে জাহাজ বিক্রি করা হত এবং পণ্যের বা জাহাজের ঝুঁকির ওপর বীমা পলিসি দেয়া হত। সেকালে কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর তরফ হতে কোন বীমা পলিসি বিক্রি করা হত না। নৌ-ঝুঁকির বিপরীতে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার করতেন এক বা একাধিক ব্যক্তিবর্গ। যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়ামের বিনিময়ে পণ্য ও জাহাজের মালিককে নির্দিষ্ট ঝুঁকির বিপরীতে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার করতেন তাদেরকে বলা হত আন্ডাররাইটার বা বীমাকারী। পলিসিপত্রের নিচে এরা তাদের নাম দস্তখত করতেন বলেই তারা আন্ডাররাইটার বলে পরিচিত হন। ১৬৮০ সালে এডওয়ার্ড লয়েড নামক এক ভদ্রলোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কফি হাউস নৌ-বীমার প্রধান কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। লয়েড এর কফি হাউস থেকেই প্রকাশিত হয় ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় প্রাচীনতম সংবাদপত্র "লয়েডস লিস্ট" যা আজও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

ষষ্ঠদশ শতকের শেষভাবে ১৮ জুন ১৫৮৩ সালে উইলিয়াম গীবন নামে এক লবণ ব্যবসায়ীর জীবনের ওপর একটি পলিসি ইস্যু করা হয়েছিল। পলিসির মেয়াদ ছিল মাত্র এক বছরের। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে মি: গীবনের মৃত্যু হলে বীমাকারীগণ তার উত্তরাধিকারীকে তিনশত তিরাশি পাউন্ড ছয় শিলিং আট পেন্স প্রদান করবেন। এই মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ৩৪৫ দিনের মাথায় জনাব গীবন মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু বীমাকারীগণ দাবি পরিশোধে অস্বীকার করেন এবং বিষয়টি আদালতে পর্যন্ত গড়ায়। বীমাকারীগণ এই মর্মে যুক্তি খাড়া করেন যে, পলিসি মেয়াদ ১২ মাসের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং তারা ২৮ দিনের চন্দ্র মাস হিসাবে তা নির্ধারণ করেছিলেন। অতএব গীবনের মৃত্যুদাবী পরিশোধযোগ্য হবে না। পরবর্তীতে আদালত এই যুক্তি অগ্রাহ্য করেন এবং বীমাকারীগণ দাবি পরিশোধে বাধ্য হন। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আমাদের জানামতে প্রথম জীবনবীমা পলিসির ক্ষেত্রেও একটি আইনগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

ইংল্যান্ডের প্রথম রেজিস্ট্রিভুক্ত জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান "The Hand-In Hand society"। এটি প্রথম ১৬৯৬ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এর সদস্য সংখ্যা একশ'র মধ্যে সীমিত ছিল। এ ধরনের আরও অনেক সোসাইটি সে সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেমন- Old Amicable Society ১৭০৬ সালে ইংল্যান্ডের রানী কর্তৃক প্রদত্ত রাজকীয় চার্টারের বলে জীবনবীমা ব্যবসা শুরু করে। সোসাইটির সদস্যরা নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম প্রদান করত। ইংল্যান্ড ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই সময় জীবনবীমা ব্যবসা ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে।

মৃত্যুর হার বিষয়ক সারণী (Mortality Table) উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনবীমা ক্রমশ সঠিক বিজ্ঞানভিত্তিক চরিত্র অর্জন করে। The Equitable Society (দি ইকুইটেবল সোসাইটি) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬২ সালে। James Dodson নামে একজন গণিতবিদ বয়স ও ঝুঁকি ভিত্তিক প্রিমিয়াম ব্যবস্থার প্রচলন করেন। এ কারণেই কোম্পানীর নাম দেয়া হয়েছিল ইকুইটেবল বা ন্যায়নীতি ভিত্তিক। তখন থেকে ঝুঁকি ও

www.pathagar.com

বয়সের বিচার করে প্রতিটি সদস্যের প্রিমিয়াম পৃথক পৃথকভাবে ধার্য করা শুরু হল। অবশ্য তখনও ডাক্তারী পরীক্ষার কোন প্রচলন হয়নি। এমনকি জীবনবীমার ক্ষেত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থ (Insurable Interest) ব্যতিরেকেই পলিসি বিক্রয় করা যেত। ফলে বিচারাধীন আসামীদের জীবনের উপর বীমা যে কেউ করতে পারতেন। বিচারে আসামীর ফাঁসি হলে বীমা গ্রহণকারী ব্যক্তি বীমার টাকা পেয়ে যেতেন। এর ফলে ১৭৭৪ সালে ইংল্যান্ডে Gambling Act পাশ করা হয়। এই আইন পাশের পরেই বীমাযোগ্য স্বার্থ ব্যতিরেকে বীমা বিক্রয় বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

১৬৬৬ সালে লন্ডন শহরে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ফলে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এরপর থেকেই অগ্নিবীমার প্রচলন শুরু হয়। ১৬৮০ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে The Fire Office। বসতবাড়ীর অগ্নিবীমার পাশাপাশি পণ্য ও গৃহস্থালী দ্রব্যের জন্য বীমা প্রচলন হয় ১৭০৮ সালে। এই সমস্ত বীমাকারীগণ আগুনের ক্ষয়ক্ষতি হতে বীমাগ্রহীতার সম্পদ রক্ষা করার জন্য নিজস্ব (Fire Brigade) ফায়ার ব্রিগেডের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে অগ্নিবীমাকারীগণ যৌথভাবে ফায়ার ব্রিগেড স্থাপন করেন। এভাবে বীমাকারীদের মধ্যে সার্বিক সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে অগ্নিবীমাকারীগণ বিভিন্ন শ্রেণীর বীমা ঝুঁকির জন্য Tariff বা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের হার (মূল্য তালিকা) নিরূপণ করেন। অগ্নিবীমাকারীগণ পরবর্তীতে আরও এক ধাপ এগিয়ে সমিতি গঠন করেন ১৮৫৮ সালে। এই সমিতি Fire Office কমিটি নামে পরিচিতি লাভ করে।

উনিশ শতকের শেষভাগে মোটর গাড়ী আবিষ্কারের সাথে সাথে দুর্ঘটনা বীমা ও মোটর বীমার উদ্ভব ঘটে। এই সময়ে সিঁধেল চুরি বা বাগলারী ইনসিওরেন্সের প্রচলন হয়। বিমান আবিষ্কারের সাথে সাথে Aviation Insurance-এর সূত্রপাত ঘটে। ১৯৩০ সালে মোটর গাড়ীর দুর্ঘটনার ফলে তৃতীয় পক্ষের সম্পদ ও জীবনের ক্ষতিজনিত দায় নিরসনের জন্য Third Party Liability Insurance বাধ্যতামূলক করা হয়।

নৌ-বীমা থেকে বীমার উৎপত্তি হলেও এই উপমহাদেশে বীমার উদ্ভব ঘটে জীবনবীমা দিয়ে। ভারত বর্ষে প্রথম জীবনবীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৮১৮ সালে। "ওরিয়েন্টাল লাইফ ইনসিওরেন্স সোসাইটি" নামে এই প্রথম জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন ইউরোপের অধিবাসী। গুর্খাদের সাথে বৃটিশ সৈন্যদের সংঘাতের ফলশ্রুতিতে বৃটিশ সৈনিকদের বিধবা পত্নীদের সহায়তা করবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। ওরিয়েন্টাল লাইফ ইনসিওরেন্স সোসাইটি শুধুমাত্র ইউরোপীয়ানদের জীবনবীমা করত। বাবু মুতিলাল শীলের ব্যাপক প্রচারণা ও দাবির মুখে পরবর্তীতে ইউরোপীয়ান কোম্পানীসমূহ ভারতীয়দের জন্য জীবনবীমা বিক্রি শুরু করলেও তুলনামূলকভাবে অধিক হারে প্রিমিয়াম আদায় করত। উনিশ শতকে দু'টি ইংরেজ কোম্পানী "দি ইউরোপীয়ান" ও "এ্যালবার্ট" দীর্ঘদিন জীবনবীমা ব্যবসা করার পর

www.pathagar.com

১৮৬৯ সালে দেউলিয়া হয়ে যায়। ১৮৭০ সালে ভারতীয়দের জন্য প্রথম জীবনবীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয় বোম্বাই নগরীতে "বোম্বে মিউচিয়্যাল এ্যাসিউরেন্স সোসাইটি" নামে। এরপর গঠিত হয় "ওরিয়েন্টাল" জীবন বীমা কোম্পানী ১৮৭৪ সালে, "ভারত" ১৮৯৬ সালে এবং "এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া" ১৮৯৭ সালে।

স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে এই উপমহাদেশে গড়ে উঠে অনেকগুলি জীবনবীমা কোম্পানী। কিন্তু এই সমস্ত কোম্পানীগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি। সর্বপ্রথম ১৯৩২ সালে বীমা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তৎকালীন বৃটিশ সরকার উপমহাদেশের বীমা ব্যবসার ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ জারি করেন। পরবর্তীকালে জীবনবীমা ও সাধারণ বীমা উভয় ব্যবসার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন The Insurance Act 1938 চালু করা হয়। এই আইনই হচ্ছে প্রথম বীমা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকারী আইন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও পাকিস্তানে এই আইন বলবৎ ছিল এবং আজ পর্যন্ত এই আইনটি বাংলাদেশে বেশ কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের পর চালু রয়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে ভারত উপমহাদেশে দুই শতাধিক বীমা কোম্পানী ব্যবসা করত। এদের মধ্যে কুড়িটি কোম্পানী ছিল অভারতীয়। দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৬টি বীমা কোম্পানী ব্যবসা করত। এদের মধ্যে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল মাত্র আটটি। সমগ্র পাকিস্তানে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের বীমা ব্যবসার পরিমাণ ছিল ত্রিশ কোটি রূপি। কিন্তু মুসলমানদের বীমা অংকের পরিমাণ ছিল এই অংকের শতকরা পাঁচভাগ মাত্র।

বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে বীমা পেশায় তেমন কেউ এগিয়ে আসেনি। এর মধ্যে একজন ব্যতিক্রম হচ্ছেন কলকাতার অধিবাসী মরহুম শমসের আলী। ১৯২৪ সালে তিনি বীমাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং বীমা বিক্রির ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। বীমা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সফলতা এই উপমহাদেশে সর্বজন বিদিত। বাঙ্গালী মুসলমানদের দ্বারা প্রথম বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে হোমল্যান্ড ইনসিওরেন্স নামে। ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পাকিস্তানে বেশ কিছু বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালে করাচীতে প্রতিষ্ঠিত হয় আলফা ইনসিওরেন্স কোম্পানী। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সময় তৎকালীন পাকিস্তানে ৬৭টি বীমা কোম্পানী ব্যবসা করত। তার মধ্যে বাংলাদেশে প্রধান অফিস ছিল এগারটি কোম্পানীর। ১৯৭৩ সালে সমস্ত বীমা কোম্পানীকে জাতীয়করণ করা হয় এবং ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র আমেরিকান লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী ছাড়া বীমা ব্যবসা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই বীমা ব্যবসা পরিচালিত হয়।

www.pathagar.com

তিন.

উপমহাদেশে জীবনবীমার ইতিহাস প্রেক্ষাপট ও বিশিষ্ট বীমা ব্যক্তিত্ব

আমাদের জীবন যেন এক অপার বিস্ময়! সৃষ্টিকর্তার এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি হচ্ছে মানবজীবন। কারো কাছে জীবন মানে আনন্দ। কারও কাছে জীবন মানে দুঃখ। স্বাভাবিকভাবে আমাদের জীবন হাসি-কান্নায় ভরা। মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে আবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আমাদের জীবন হারিয়ে যায় অজানা এক জগতে। মহাকালের তুলনায় আমাদের জীবনকাল অতি সামান্য। আমরা কেউ জানিনা জীবনের এই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অতি সামান্য কালের মধ্যে কার স্থায়িত্ব কতটুকু। কখন, কে, কিভাবে চিরতরে হারিয়ে যাবে। কে, কখন, কোথায়, কোন বিপদের সম্মুখীন হবে তা আমরা কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। সেজন্যে অনেকে বলেন "জীবন মানে পদ্ম পাতার জল, করে টলমল।"

জীবনের প্রতি মুহূর্তে আছে অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি ও অনেক ধরনের বিপত্তি। জীবন তাই দুঃখময়, বিষাদময়। অনেকের কাছে জীবন মানে অবিরাম যুদ্ধ। আবার জীবন মানে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা। জীবন মানে স্নেহ, মায়া, মমতা। জীবন আছে বলেই আমরা বেঁচে থাকি, নতুন আশায় বুক বাঁধি। ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে আমরা পেতে চাই সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা। কিন্তু জীবনের প্রতিক্ষণে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। ঝুঁকিহীন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা আমাদের কাম্য হলেও বাস্তবে তা পাওয়া সম্ভব হয় না। কালের এক অমোঘ নিয়মে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যায়। কিংবা পদে পদে আশংকা থাকে দুর্ঘটনা ও ক্ষতির। ঝুঁকি, বিপদ ও মৃত্যুর মাঝে আমরা অবিরাম ছুটে চলি গতিময় এ জীবনে।

মানুষ কোন না কোনভাবে ঝুঁকি মোকাবেলার পথ ও পদ্ধতি সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ব্যবহার করে এসেছে। আদম (আঃ)কে যখন পৃথিবীতে পাঠানো হল তখন তিনি প্রবেশ করলেন অচেনা, অজানা এবং অনিশ্চয়তায় ভরপুর এক জীবনে। শুরু হল জীবন সংগ্রাম। সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই মানুষকে মোকাবেলা করতে হয়েছে বন্যা, ঘূর্ণীঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি। আবার হিংস্র, বন্য জীবজন্তুর হাত থেকে মানুষ নিজেকে রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ ও দলবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে বিভিন্নভাবে। আজকের যে বীমা ব্যবস্থা মূলত

www.pathagar.com

তা হচ্ছে সংঘবদ্ধভাবে আর্থিক ক্ষতি ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মানুষ পরস্পরের সহযোগিতায় যৌথ সঞ্চয়ের মাধ্যমে একটি তহবিল গঠন করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বা তার পরিবারকে এই তহবিল থেকে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

বীমা শব্দটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অতি পরিচিত। গ্রাম-বাংলার অর্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও অনেকে এই শব্দটি শুনেছেন বা জানেন। যারা বীমা সম্পর্কে শুনেছেন বা জানেন তারা সবাই যে বীমা ব্যবস্থা বা পদ্ধতি সম্পর্কে খুব বেশী ওয়াকেফহাল তা বোধ হয় ঠিক নয়। তবে একথা সত্যি যে, গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ "বীমা" বলতে "সাধারণ বীমা" নয় বরং "জীবনবীমা" বুঝে থাকেন। যারা বীমা বলতে জীবনবীমাকেই বোঝেন তারা নিশ্চয় এটা বোঝেন যে, "জীবনবীমা" মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনের আর্থিক অসহায়ত্ব দূর করতে সাহায্য করে। জীবনবীমাকে তাই বলা হয় "দুর্দিনের বন্ধু"।

জীবনবীমা আমাদের চলমান জীবনের কোন কোন বিপত্তির মুখে আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অকাল মৃত্যু, বার্ধক্য, অসুস্থতা, পঙ্গুত্ব প্রভৃতি মোকাবেলায় একটি সম্মিলিত সহযোগিতার নাম হচ্ছে জীবনবীমা। জীবনবীমা জীবনের বিভিন্ন বিপত্তির ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় সাহায্য করে। আধুনিক জীবন যাত্রায় জীবনবীমা একটি অনন্য সঞ্চয় ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

উনিশ শতকের কথা

এই উপমহাদেশে জীবনবীমার সূত্রপাত ঘটেছে বৃটিশ শাসনকালে। আজ থেকে প্রায় দুইশত বছর আগে বৃটিশ ব্যবসায়ী ও খ্রিস্টান মিশনারীদের মাধ্যমে তৎকালীন বৃটিশ ভারতে জীবনবীমার আবির্ভাব ঘটে। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে "ওরিয়েন্টাল লাইফ ইনসিওরেন্স" নামে তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রথম জীবনবীমার প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছিল মূলত বৃটিশ সৈন্যদের জীবনবীমা করার জন্য। এর প্রায় পাঁচ বছর পর ১৮২৩ সালের পহেলা মে তারিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বোম্বে লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী এবং ১৮২৯ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় "মাদ্রাজ ইকুইট্যাবল"। এরপর ১৮৪৭ সালে "খ্রিস্টান মিউচুয়াল" নামে আরও একটি জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় যুক্ত প্রদেশের মীরাটে এবং পরবর্তীতে তা লাহোরে স্থানান্তরিত করা হয়।

তৎকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পটভূমিতে জীবনবীমার উত্তরণ খুব সহজসাধ্য ছিল না। প্রথমত এই সব জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ইউরোপীয়ানদের কিংবা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জীবনের বীমা করত। কোলকাতার একজন বিশিষ্ট বীমা ব্যক্তিত্ব বাবু মুতীলালশীল এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব

www.pathagar.com

করেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পরবর্তীতে বিশেষ বিশেষ নির্বাচিত ভারতীয়দের জীবনের বীমা গ্রহণ করা হতে থাকে।

কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারতীয়দের জন্য ধার্য করা হত তুলনামূলকভাবে অধিক হারে প্রিমিয়াম। ভারতীয়দের বীমা পলিসি প্রদান না করার ক্ষেত্রে ইংরেজদের কোন রাখঢাক ছিল না। ১৯০৬ সালেও "দি মেইল" পত্রিকার "মাদ্রাজ ইকিউটেবল এ্যাসুরেন্স সোসাইটিজ"-এর একটি বিজ্ঞাপনে পরিষ্কার উল্লেখ ছিল "The Society does not insure the lives of Natives of India."

জীবনবীমার ক্ষেত্রে এহেন বৈষম্যমূলক নীতি অনভিপ্রেত হলেও তৎকালীন ভারতবর্ষে এটি ছিল বাস্তবতা। বাস্তবতার এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয়দের জন্য প্রথম জীবনবীমা কোম্পানী গঠিত ১৮৭০ সালের ৩রা ডিসেম্বর। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম "বোম্বে মিউচিয়াল লাইফ ইনসিওরেন্স সোসাইটি" যা "বোম্বে মিউচিয়াল" নামে পরিচিত। শুরু থেকেই বোম্বে মিউচুয়াল সতর্কতার কারণে অধিক হারে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করতে থাকে। তাদের এই সতর্কতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেই সময়ে একাধিক বীমা কোম্পানীর দেউলিয়াত্বের ফলে বীমার ওপর মানুষের আস্থার অভাব সৃষ্টি হয়েছিল। "বোম্বে মিউচুয়াল" তাই প্রথম থেকেই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাদের ব্যবসা শুরু করে। পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও আস্থা সৃষ্টির জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল। "বোম্বে মিউচুয়াল" প্রতিষ্ঠার পরপর জনগণের আস্থা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে ১৮৭৪ সালে আরো একটি জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করে "ওরিয়েন্টাল গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এ্যাসুরেন্স কোম্পানী" নামে।

কয়েকজন ভারতীয় প্রায় প্রথম থেকেই বীমার সাথে যুক্ত ছিলেন। এরা হলেন স্বনামধন্য ধনাঢ্য জমিদার প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী এবং বিপুল সম্পদশালী পার্শী ব্যবসায়ী রস্তমজী কাওয়াসজী। এছাড়া হিন্দু ধর্মের সংস্কারবাদী নেতা রাজা রামমোহন রায়ের অবদান স্মরণযোগ্য। তিনি সতীদাহ প্রথা রহিতের আন্দোলন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, হিন্দু বিধবাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করার জন্য সংবাদপত্রের মাধ্যমে জীবনবীমার অনুরূপ সংগঠন বা সমিতি গড়ে তোলার জন্য তিনি ভারতীয়দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার এ আহ্বানের তাৎক্ষণিক কোন ফল পাওয়া না গেলেও হিন্দু সমাজে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল।

হিন্দু সমাজে জীবনবীমার প্রয়োজনীয়তা প্রাথমিক অবস্থায় খুব তীব্রভাবে অনুভূত হয়নি সম্ভবত তাদের যৌথ পরিবার প্রথার কারণে। পরিবারের "কর্তা" যৌথ পরিবারের সকল সদস্যদের ভরণ-পোষণ ও দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতেন ফলে হিন্দু বিধবাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিয়ে সমাজপতিদের হয়তো তেমন উদ্বেগ ছিল না। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে যৌথ পরিবারপ্রথা ভেঙ্গে পড়ায় হিন্দু ধর্মের অনুসারীগণ জীবনবীমার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হন। এছাড়া উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল তাদের অনুকূলে। ফলে

www.pathagar.com

আমরা লক্ষ্য করি যে, ভারতে জীবনবীমার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ প্রথম থেকেই অগ্রসর ছিলেন।

ভারতীয় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীগণও জীবনবীমাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেন। বস্তুত এই উপমহাদেশে জীবনবীমার প্রসারে খ্রিস্টান মিশনারীদের ভূমিকা ছিল প্রথম কাতারে। খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা ১৮৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'টিনেভেলী উইডোজ ফান্ড" এবং "খ্রিস্টিয়ান মিউচিয়াল অফ মীরাট"। পরবর্তীতে এই প্রতিষ্ঠানটি লাহোরে স্থানান্তরিত হয়। পাকিস্তান নামক ভূখণ্ডে সম্ভবত এটিই প্রথম বীমা প্রতিষ্ঠান। এরপর ১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে "বেঙ্গল ক্রিস্টিয়ান ফ্যামিলি পেনসন ফান্ড" ইত্যাদি। এর দুই দশক পরে ১৮৭১ সালে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন "হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুইটি ফান্ড"। হিন্দু বিধবাদের জন্য অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছিল ১৮৭৬ সালে "বোম্বে উইডোজ এ্যান্ড পেনশন ফান্ড" নামে।

ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত কোম্পানীসমূহের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা খুব সন্তোজনক ছিল না। প্রথম বীমা প্রতিষ্ঠান "ওরিয়েন্টাল লাইফ ইনসিওরেন্স সোসাইটি" ১৮২৯ সালে পুনর্গঠিত করা হলেও ১৮৩৩ সালে সংকটের মুখে পতিত হয়। চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে উত্তরণের পর ১৮৫৩ সালে ইংল্যান্ডের "মেডিক্যাল ইনভ্যালিড এন্ড জেনারেল" এর দ্বারা ওরিয়েন্টাল অধিকৃত হয়। কিন্তু ১৮৬০ সালে "মেডিক্যাল ইনভ্যালিড এন্ড জেনারেল", "এ্যালবার্ট" কোম্পানীর সাথে একীভূত হয় এবং ১৮৬৯ সালে "এ্যালবার্ট" দেউলিয়াত্বের শিকার হয়। এভাবে প্রথম "ওরিয়েন্টাল" এর মৃত্যু ঘটে। পরবর্তী বছরেই "ইউরোপীয়ান" নামে আরও একটি বৃটিশ কোম্পানী দেউলিয়াত্ব বরণ করে। অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, জালিয়াতি ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত ইংল্যান্ডের দুটি জীবনবীমা কোম্পানীর এহেন পরিণতিতে উপমহাদেশে জীবনবীমার প্রসারে কিছুটা সংকট শুরু হয়। অবশ্য এর ফলশ্রুতিতে বৃটিশ পার্লামেন্ট সে বছর পাশ করে "লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীজ এ্যাক্ট- ১৮৭০"।

এদিকে উপমহাদেশে ঐ একই বছরে "বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এ্যাসুরেন্স সোসাইটির" নামে প্রথম ভারতীয় জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে। এরপর ১৮৭৪ সালে জন্ম লাভ করে "ওরিয়েন্টাল গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটিজ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড"। দ্বিতীয় "ওরিয়েন্টাল" এর প্রতিষ্ঠাতাগণ ছিলেন ভারতীয় এবং ভারতীয়দের জন্য কোনরূপ অতিরিক্ত প্রিমিয়াম ব্যতিরেকে তারা বীমা পলিসি বিক্রয় করতে থাকে। "ওরিয়েন্টাল" লাইফের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন কমরুদ্দীন তৈয়বজী নামে বোহরা সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট আইনবিদ। বোম্বে শহরে তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলমান এ্যাটর্নী এবং সংগত কারণে তাকে বাইবেলের পরিবর্তে কোরআনের মাধ্যমে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। কমরুদ্দীন তৈয়বজী এরপর আরও

www.pathagar.com

একজন খোজা সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিম ব্যবসায়ী এম আবদুল্লাহ ধরমসী ১৮৯৭ সালে বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত "এমপায়ার অফ ইন্ডিয়া"-এর পরিচালক ছিলেন। বোম্বে নগরীর এই ধনশালী ব্যবসায়ী তার সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি।

"বোম্বে মিউচুয়াল" ও "ওরিয়েন্টাল"-এর পাশাপাশি এই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি, সোসাইটি ও "প্রভিডেন্ট ফান্ড" এর বিস্তার লাভ ঘটে যেমন- "বোম্বে উইডোজ ফান্ড" (১৮৭৫), "হিন্দু প্রভিডেন্ট ফান্ড" (১৮৯১), "পাঞ্জাব মিউচুয়াল হিন্দু রিলিফ ফান্ড" (১৮৯৩), "সিন্ধ হিন্দু ফান্ড (১৮৯৪) ইত্যাদি। মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড গঠনের কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। বোম্বে, মাদ্রাজ ও কোলকাতা কেন্দ্রিক শত শত প্রভিডেন্ট সমিতি যেমন ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ছিল তেমনি এ সব সমিতির অধিকাংশ খুব দ্রুত বিলীন হয়ে যায়।

উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে সমগ্র ভারতে মহামারীরূপে প্লেগ রোগ শুরু হয়। হাজার হাজার লোকের প্রাণীহানী হলেও জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে তেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। কারণ প্লেগ রোগে মারা যান তারা প্রায় সবাই ছিলেন গরীব শ্রেণীভুক্ত এবং তাদের জীবনবীমা ছিল না।

ভারতবর্ষের মুসলমানরা প্রথম থেকেই বীমা ব্যবস্থাকে বিশেষ করে জীবনবীমাকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা দেখল যে, এই ব্যবস্থার ধারক, বাহক ও গ্রাহক সবাই বিধর্মী ও বিদেশী। উপরন্তু তারা মনে করল বীমা ব্যবস্থা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সংঘর্ষশীল। অতএব বীমার গ্রাহক হওয়া থেকে যেমন তারা দূরে থেকেছে তেমনি মুসলমান শিল্পপতি বা সমাজপতিগণ প্রাথমিক অবস্থায় বীমা ব্যবসার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেননি। সর্বোপরি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই উপমহাদেশের বিশেষ করে তৎকালীন বাংলার মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে সব দিক থেকেই ছিল পশ্চাৎপদ। সাধারণভাবে এ দেশের কৃষক সমাজ তখন "নীল চাষের" ভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল।

শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজী প্রবর্তন করা হলে মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা বর্জনের নীতি গ্রহণ করে এবং চাকুরীর বাজারে গ্রহণযোগ্যতা হারায়। সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী মুসলমান পরিবারের সদস্যরাও রাজনৈতিক অঙ্গনে পট পরিবর্তনের ফলে জীবিকা অর্জনের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতকে তৎকালীন বাংলার 'তাঁত' শিল্প ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং তাঁতীরা ছিল অধিকাংশ মুসলমান। ইংরেজরা বাংলার বস্ত্র শিল্পকে ধ্বংস করে গড়ে তোলে মানচেস্টারের বস্ত্রশিল্প। বাংলার মসলিন ইউরোপের বাজারে রপ্তানী হওয়ার পরিবর্তে ইংল্যান্ড থেকে বস্ত্র আমদানী হতে থাকল। তাঁতীদের পুরনো পেশা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

পলাশী যুদ্ধের করুণ পরিণতিতে বাংলার স্বাধীনতা শুধু হারাতে হয়নি, মুসলমানরা একে একে হারিয়েছিল সব কিছু। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা গ্রহণের পর মুসলিম

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হলে হাজার হাজার সৈনিক বেকারত্ব ও দরিদ্রতার মুখে পড়ে। ১৭৯৩ সালে গ্রাম্য পুলিশ প্রথা রহিতকরণের ফলে হাজার হাজার মুসলমান বেকার হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের পূর্বেই রাজস্ব বিভাগের মুসলমান কর্মচারী ও ভূমির প্রকৃত মালিকের স্থান অধিকার করে বসে অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্তগণ। নানান অজুহাতে "লাখেরাজ" সম্পত্তির মালিকানা হতে মুসলমানদের উচ্ছেদ করা হয়। সৈ সব ক্রমাবনতিশীল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং ধর্মীয় কারণে বীমা ব্যবস্থা বা বীমা ব্যবসার প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ ছিল প্রথম থেকেই নেতিবাচক। তাই আমরা লক্ষ্য করি যে, ১৯৪৭ সালে যখন দেশ বিভাগ হল এবং পাকিস্তান নামক এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল তখন জীবনবীমার গ্রাহকদের ৯৫%-এর বেশী ছিল হিন্দু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলমানদের মধ্যে জীবনবীমার গ্রাহক ছিল শতকরা পাঁচ ভাগের কম।

বিশ শতকের জাগরণ

বিশ শতকের শুরুতেই উপমহাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। বিদেশী পণ্য ও বিদেশী সেবার পরিবর্তে দেশীয় পণ্য ও সেবার প্রতি ভারতীয়দের আগ্রহ প্রবলভাবে বাড়তে থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতায় বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে ভারতীয়দের দ্বারা একে একে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে ব্যাংক, বীমা ও শিপিং কোম্পানীসমূহ। ১৯০৬ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় "ইউনাইটেড ইন্ডিয়া লাইফ এ্যাসুরেন্স কোম্পানী" এবং অন্যটি হচ্ছে "ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ইনসিওরেন্স কোম্পানী"।

উভয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত ব্যবসায়ী, বীমাব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। "ন্যাশনাল"-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশিষ্ট বীমাব্যক্তিত্ব শ্রী পান্নালাল ব্যানার্জী। পান্নালাল ব্যানার্জীর মৃত্যুর পর তার পুত্র স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ন্যাশনালের হাল ধরেন। এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় যারা উদ্যোগী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন স্যার আবদুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী (আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা হুসেন সুহরাওয়ার্দীর পিতা)। অন্যদিকে "ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান"-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জননন্দিত ব্যবসায়ী, প্রখ্যাত পণ্ডিত স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী। এখানে আরও যে সব গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল তারা হচ্ছেন স্যার প্রদ্যুত কুমার ঠাকুর, ড: নীলরতন সরকার এবং ড: শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর মত জননেতা।

১৯০৭ সালে কোলকাতার 'মহর্ষী ভবনের" একটি কক্ষে জন্ম লাভ করে "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি"। সাহিত্যের ছাত্ররা হয়তো জানেন যে, মহর্ষী ভবনে বাস করতেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩৪ সালে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সিলভার জুবিলী (রৌপ্য জয়ন্তী) অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রাকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ঠাকুর পরিবারের কৃতি সন্তান শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিখ্যাত জমিদার বংশের প্রাচুর্যের মধ্যে কাটিয়েও যিনি অতি সাদাসিধে জীবনে নিজেকে অভ্যস্ত

www.pathagar.com

করেছিলেন। জীবনবীমা বিক্রির কলা-কৌশল সম্পর্কে তার ছিল নিজস্ব চিন্তা-ধারা। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে জীবনবীমার বিকাশে একজন উৎসর্গীকৃত প্রাণপুরুষ এবং অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন বাংলার স্বনামধন্য জননেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ-এর পরিচালনা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। এছাড়াও ১৯১২ সালে বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত "ইউনিক" ইনসিউরেন্স-এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশ বন্ধু সি আর দাস।

১৯১৯ সালে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ কোম্পানীর চাকুরীতে সামান্য কেরানী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ময়মনসিংহের কৃতি সন্তান নলিনী রঞ্জন সরকার। আর্থিক অনটনের কারণে প্রবেশিকা পাশ করার পর বেশী পড়াশুনা করতে না পারলেও তিনি তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন বীমা ও রাজনৈতিক জগতে। ১৯৩২ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার এবং পরবর্তীতে প্রেসিডেন্টের পদ অলংকৃত করেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ১৯২৩ সালে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। শেরে বাংলা ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় তিনি মন্ত্রী হন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ভারত বিভাগের পর তিনি ড: বিধান চন্দ্র রায়ের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি কোলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এবং "ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রির" সভাপতি নির্বাচিত হন।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব নলিনী রঞ্জন সরকার ছিলেন আজীবন মানবকল্যাণে ব্রতী। জীবনবীমাকে নিছক ব্যবসা হিসেবে গণ্য না করে সমাজকল্যাণমুখী এক অনন্য পদ্ধতি হিসেবে তিনি তা গণ্য করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, জীবনবীমাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার কারণেই তিনি জননেতা হিসেবে সমাজে সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ময়মনসিংহের নলিনী সরকারের মত আরও একজন বীমাব্যক্তিত্ব অতি সাধারণ অবস্থা থেকে উপমহাদেশের বীমা জগতে এবং তার বাইরে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন কলকাতায় জন্মগ্রহণকারী (১৮৬৬) পার্শী ব্যবসায়ী স্যার ফিরোজ সেথনা। তিনি কর্মজীবনের শুরুতে পারিবারিক ব্যবসা দেখাশুনা করতেন; কিন্তু পরবর্তীতে স্বেচ্ছায় বীমা পেশা গ্রহণ করেন। ১৯০১ সালে তিনি "সান লাইফ অফ কানাডা"-এর বীমা বিক্রয়কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। বোম্বে নগরীর চার্চগেট স্ট্রীটে ছিল তার নিয়মিত বিচরণ এবং প্রতিটি পথচারীর নিকট ছিল একটি সাধারণ প্রশ্ন "আপনার কি বীমা পলিসি আছে?" তার দীর্ঘ গোঁফ, ফ্রেঞ্চ কাট" দাড়ি এবং আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গীর জন্য তিনি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ক্রমান্বয়ে তিনি কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের ফলে বিশ্বের এই বৃহৎ বীমা কোম্পানীর শীর্ষস্থানে নিজের অবস্থান করে নিয়েছিলেন। এছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যবসা জগতে তিনি তার বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হন। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক

www.pathagar.com

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া)-এর চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি দুই দশক ধরে। এছাড়াও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সংগঠন (ইন্ডিয়া মার্চেন্টস চেম্বার) এবং "বোম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন"-এর প্রেসিডেন্ট পদ তিনি অলংকৃত করেন। চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি হিসেবে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। রাজনৈতিক জগতেও তার ছিল পদচারণা। তৎকালীন ইংরেজ সরকারের সাথে "গোলটেবিল বৈঠকে" স্যার ফিরোজের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাণবন্ত। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর তিনি সান লাইফ অফ কানাডার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং শুধু ভারতের বিভিন্ন শহর, নগর, বন্দর নয়, ভারতের বাইরে কলম্বো ও রেঙ্গুনেও তিনি "সান লাইফের" ব্যবসা বিস্তৃতি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবকে জীবনবীমার প্রসারে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে বোম্বে নগরীতে ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল "স্বদেশী লাইফ এ্যাসুরেন্স কোম্পানী"। ভারতীয় কোম্পানীসমূহের মধ্যে "স্বদেশী লাইফ" সর্বপ্রথম জর্জ কিং নামের একজন ইংরেজ "এ্যাকচুয়ারী"কে নিয়োগদান করে এবং জর্জ কিং এর তত্ত্বাবধানে ভারতীয়গণকে "এ্যাকচুয়ারী" বিদ্যায় তালিম দেয়ারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১৯০৩ সাল হতে ১৯১২ সালের মধ্যে পাঞ্জাব, বাংলা, বোম্বে ও মাদ্রাজে প্রায় ৩৫টি বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব কোম্পানীর অধিকাংশ (২৬টি) তাদের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে বা বন্ধ হয়ে যায়। কোন কোন কোম্পানীর দুই/এক বছরের মধ্যেই পরিসমাপ্তি ঘটে। স্বাভাবিকভাবে জীবনবীমা কোম্পানীকে অনেকে "হায় হায় কোম্পানী" হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে। সে সময় (১৯০৫ সালের এক প্রতিবেদন অনুসারে) একটি আমেরিকান কোম্পানীসহ প্রায় ২৬টি অভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীর ব্যবসা ভারতে ছিল।

বিশ শতকের প্রথম দিকে উপমহাদেশের বীমা ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯১২ সালের "বীমা আইন" বলবৎ বা ইন্ডিয়ান লাইফ এ্যাসুরেন্স কোম্পানীজ এ্যাক্ট ১৯১২ প্রবর্তন। এই সময় আরও একটি আইন বলবৎ হয় "ইন্ডিয়ান প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স সোসাইটিজ এ্যাক্ট ১৯১২" নামে। এই আইন বলবতের পূর্বে প্রায় ১২০০টি প্রভিডেন্ট সোসাইটি ছিল। আইন পাশের পর ১৯১৫ সালে এই সংখ্যা নব্বইতে নেমে আসে।

এরপর ১৯১৩ সালে বীমা বিধি (Rules) প্রণীত হয়। এইভাবে প্রথমবারের মত দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দী পরে রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা বীমা ব্যবসা পরিচালিত হতে থাকে। ১৯১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় বীমা ব্যবসার তথ্য সম্বলিত "ইয়ার বুক" বা বর্ষপঞ্জী। বীমা আইনের ফলশ্রুতিতে ভালো ব্যবসা করা সত্ত্বেও কয়েকটি বিদেশী কোম্পানী ভারতে তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। এদের মধ্যে "লন্ডন এ্যাসুরেন্স কর্পোরেশন" এবং "ন্যাশনাল মিউচুয়াল" প্রধান। এ্যাকচুয়ারী ভিত্তিক টেবল, প্রিমিয়াম নির্ধারণ ও ভ্যালুয়েশন নির্ণয়ের আইনগত ভিত্তি রচিত হওয়ার ফলে যে সব কোম্পানী লাভ না হলেও

www.pathagar.com

"ডিভিডেন্ড" ঘোষণা করত তাদের পক্ষে তা আর সম্ভব হল না। অবশ্য ১৯১২ সালের বীমা আইনে ২৩টি বিদেশী কোম্পানীকে কিছু কিছু বিধি-বিধান থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। ফলে এই সব কোম্পানীর "কন্ট্রোলার জেনারেল" অফিসে কোন ডিপোজিট রাখতে হত না।

১৯২৮ সালে সর্বপ্রথম ভারতীয় বীমাকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে গঠিত হয় "ইন্ডিয়ান ইনসিওরেন্স অফিসেস এসোসিয়েশন" ও "ইন্ডিয়া লাইফ এ্যাসুরেন্স অফিসেস এ্যাসোসিয়েশন"। ১৯২৮ সালেই "ইন্ডিয়ান ইনসিওরেন্স কোম্পানিজ এ্যাক্ট" পাশ হয়। এই আইনের ফলে প্রতিটি বীমা কোম্পানীকে দেশের ভেতরের ও বাইরের সকল ব্যবসার বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন ও প্রেরণ বাধ্যতামূলক করা হয়।

যুদ্ধোত্তর বিপর্যয় ও পুনর্জীবন

বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে জীবনবীমা ব্যবসায় ইতিবাচক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ভারতবর্ষের ব্যাংক ব্যবসায় একটি বড় ধরনের ধস শুরু হয় তখনই। এর প্রভাব পড়তে শুরু করে জীবনবীমা ব্যবসায়। জীবনবীমার নতুন ব্যবসার পরিমাণ প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে। ১৯১২ সালের বীমা আইন পাশের পর এবং যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনেক বীমা কোম্পানী ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অবশ্য যুদ্ধোত্তর ভারতে বেশ কয়েকটি "কম্পোজিট" ইনসিওরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর মধ্যে "নিউ ইন্ডিয়া এ্যাসুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড" ও "জুপিটার জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড" অন্যতম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পুনরায় জীবনবীমা ব্যবসা নবজীবন লাভ করে। ১৯১৯ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে ভারতে ৩৯টি নতুন জীবনবীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সময় গড়ে প্রতি বছর কমপক্ষে তিনটি জীবনবীমা কোম্পানীর জন্ম হয় এবং জীবনবীমার ব্যবসা দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। কিন্তু নতুন জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের অধিকাংশ কোন ডিভিডেন্ড ঘোষণা করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত "ইয়ার বুকে" নতুন জীবনবীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার পূর্বে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯২৭ সালে দিল্লীতে "ট্রপিকাল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ" প্রতিষ্ঠা লাভ করে যার উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের স্বনামধন্য নেতৃবৃন্দ যেমন- পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল খান, ড: এমএ আনসারী, সুভাস চন্দ্র বোস ইত্যাদি। এই সময় দেশী-বিদেশী মিলে প্রায় ৬০টি জীবনবীমা কোম্পানী একযোগে ব্যবসা করতে থাকে এবং এক দশকের মধ্যে নতুন বীমা ব্যবসা প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবে দেশীয় কোম্পানীগুলো তুলনামূলকভাবে ভালো ব্যবসা করতে থাকে। ভারতে প্রায় শত বছর ধরে (১৮১৮-১৯১৮) জীবনবীমা

www.pathagar.com

ব্যবসা চালু হলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবনবীমাকে গ্রহণ করবার তেমন কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে মুসলমানরা ছিল আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে জর্জরিত। জাতীয় স্বাতন্ত্র্য এবং প্যান ইসলামিক চিন্তায় তারা ছিল অধিক মনোযোগী। ১৯০৬ সালে "মুসলিম লীগ" নামে ঢাকার বুকে মুসলমানদের একটি নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়।। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই নতুন প্রতিষ্ঠানের দিকে ক্রমশ আকৃষ্ট হতে থাকে। রাজনৈতিক অঙ্গনে "বঙ্গ ভঙ্গ", "খিলাফত আন্দোলন", "হিজরত আন্দোলন", "অসহযোগ আন্দোলন" প্রভৃতির প্রতি মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি পদ্ধতি হিসেবে জীবনবীমার প্রতি তেমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন মুসলিম ব্যবসায়ী/ধনাঢ্য ব্যক্তি বীমা ব্যবসার সাথে সংযুক্ত থাকলেও জাতি হিসেবে জীবনবীমার প্রতি ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। ত্রিশের দশকে সর্বপ্রথম মুসলমানদের দ্বারা একটি জীবনবীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয় বোম্বে নগরীতে। "ইস্টার্ণ ফেডারেল ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড" নামে এই বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আব্দুর রহমান সিদ্দিকী। এর ঠিক দুই বছর পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে "মুসলিম ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ"। "মুসলিম ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা মহাকবি ড: মুহাম্মদ ইকবাল। ড: ইকবাল ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক ও লেখক। মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক ভূ-খণ্ডের স্বাধীনতার দাবি তিনি করেন। সমগ্র ভারতব্যাপী ছিল তার পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা। জনাব সিদ্দিকী ও ড: ইকবাল দুটি পৃথক জীবনবীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতের তৎকালীন দিশেহারা মুসলিম জনসাধারণকে জীবনবীমার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করার প্রয়াস নেন।

ত্রিশের দশকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। কংগ্রেস এসময়ে "অসহযোগ আন্দোলন" শুরু করে। ১৯২৮ সালে গঠিত "সাইমন" কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বৃটিশ সরকার ১৯৩০ সালে লন্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। প্রায় দুইমাসব্যাপী স্থায়ী বৈঠকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার দাবি প্রচণ্ডভাবে তুলে ধরেন (কংগ্রেস এ বৈঠক বয়কট করে)। ১৯৩৭ সালে ভারতে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই দু'টি প্রধান দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনের পরে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি এবং স্বতন্ত্র সদস্যদের নিয়ে শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এর ফলে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নব জাগরণের সূত্রপাত হয়। এই সময় ফজলুল হক (১৯৪০) লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে "পাকিস্তান" প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯৩৫ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতার বহু চেষ্টা করা হয় কিন্তু সে সব প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি হয় এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানির মাধ্যমে এক বেদনাদায়ক ইতিহাস রচিত হয়।

www.pathagar.com

১৯৩০ এর দশকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়। তার প্রভাব ভারতবর্ষের বীমা ব্যবসার ওপর পড়তে শুরু করে। এই বছরে নতুন বীমা ব্যবসা পূর্বের বছরের ১৭,২৫ কোটি টাকার তুলনায় ১৫,৫ কোটি টাকায় নেমে আসে। অর্থনৈতিক মন্দা চলাকালীন সময়ে নতুন বীমা ব্যবসা করা কষ্টসাধ্য হলেও নতুন বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা বন্ধ হয়নি। ১৯২৯ সালে ১৯৩৯ সালের মধ্যে দেশ শতাধিক নতুন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে একশতটি কোম্পানীর বার্ষিক নতুন ব্যবসা ছিল পাঁচ লাখের (রুপী) কম। লক্ষ্যণীয় যে, এই দশকে কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লীর বাইরেও বিভিন্ন প্রধান শহর যেমন বরোদা, করাচী, লাহোর, পাটনা, গৌ-হাটি, এলাহাবাদ, আগ্রা, হায়দরাবাদ প্রভৃতি শহরে বীমা কোম্পানীসমূহ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

১৯৩৮ সালে নতুন বীমা আইন "ইনসিওরেন্স এ্যাক্ট" প্রবর্তিত হয়। এ সময় ভারতে মোট বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৩৬৪টি। এর মধ্যে ২১৭টি ভারতীয় এবং ১৪৭টি বিদেশী কোম্পানী। মোট বিক্রীত জীবনবীমা পলিসি ছিল পনের লাখের অধিক। এছাড়াও পাঁচ শতাধিক "প্রভিডেন্ট সোসাইটি" তখন ভারতে চালু ছিল। ১৯৩৮ সালে জীবনবীমা কোম্পানী সংখ্যা ছিল ২০০। এই বীমা আইনের বলে জে এইচ থমাস নামে একজন ইংরেজ এ্যাকচুয়ারী "ইনসিওরেন্স সুপারিনটেনডেন্ট" নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে প্রখ্যাত বীমাবিদ এম এ আজিজ আনসারী তার স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯৩৮ সালে সুভাসচন্দ্র বোস কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তার সাথে মুসলিম লীগের নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দীর্ঘ পত্র বিনিময় হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হিন্দু-মুসলিম মিলনের সর্বশ্রেষ্ঠ চেষ্টা করে। বস্তুত ১৯৩৫ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের সাথে কংগ্রেসের সমঝোতা আসার অনেক চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলন জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে।

১৯৩৮ সালের বীমা আইন, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবের ফলে ভারতের জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের বৃদ্ধি কিছুটা কম হলেও ১৯৩৯ সালে চারটি নতুন কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন করা হয়। ১৯৪১ সালে করাচীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে "ইস্টার্ণ লাইফ"। মুসলমান ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ১৯৪২ সালে বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হয় "হাবিব ইনসিওরেন্স কোং লিঃ। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "জয় ভারত", "নিউ গ্রেট", "পৃথ্বী" ইত্যাদি। ১৯৪৩ সাল থেকে জীবনবীমা ব্যবসা আবার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৮ সালে ২০০টি জীবনবীমা কোম্পানী ছিল। পরবর্তীতে এ সংখ্যা কিছুটা কমে গেলেও ১৯৪৫ সালে আবার তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮টিতে দাঁড়ায় এবং নতুন ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৬ কোটি রূপি। ১৯৪৬ সালে নতুন বীমার পরিমাণ হয় ১৫৩ কোটি রূপি। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি নতুন রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। বিভাগের পূর্বে (১৯৪৬) সমগ্র ভারতে জীবনবীমার কার্যকর পলিসির সংখ্যা ছিল প্রায় আটাশ লক্ষ এবং মোট ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৬৫০ কোটি রূপি।

www.pathagar.com

উপমহাদেশের বীমা ব্যক্তিত্ব

এই উপমহাদেশে বীমা, বিশেষ করে জীবন বীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে নেতিবাচক ধারণা। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। বীমা যদিও একটি জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা তবু কেন মানুষ সাগ্রহে বীমা পেশা গ্রহণ করতে সম্মত হন না বা কেন জীবন বীমার মাঠ কর্মীদের প্রতি সাধারণ মানুষের অনীহা তা আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। উপমহাদেশে বীমার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনাকালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উপমহাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠী বীমার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অবস্থায় ততটা অনুভব করেননি, কারণ তাদের পরিবার প্রথার মাধ্যমে এক ধরনের আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বীমা গ্রহণযোগ্য নয় এ মনোভাব মুসলমানদের মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করেছে। অতএব উনিশ শতকে যখন উপমহাদেশে বৃটিশদের দ্বারা শুধুমাত্র সাদা চামড়ার (ইউরোপীয়ান) মানুষের জন্য বীমা ব্যবসার প্রচলন করা হয় তখন থেকে আজ পর্যন্ত নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূলতার মধ্যে বীমা একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ক্রমে ক্রমে আমাদের নেতিবাচক ধারণা দূর করতে সক্ষম হয়েছে বা হচ্ছে।

বীমা ব্যবস্থা তথা জীবন বীমার সুফল সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য অনেক জ্ঞানী, গুণী, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আমরা অনেকেই এসব সম্মানিত বীমা ব্যক্তিত্বদের কথা জানিনা বা মনে রাখিনি। বাংলাদেশে জীবনবীমা ব্যবসায় জড়িত রয়েছেন লক্ষাধিক ব্যক্তি। যারা জীবনবীমাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন তারা যদি বীমা ব্যবসার সাথে জড়িত মহান ব্যক্তিত্বদের কথা কিছুটা জানতে পারেন, তারা আরো অনুপ্রাণিত হবেন এবং পেশার প্রতি অধিকতর নিবেদিত হবেন বলে আশা করা যায়। আজকের আলোচনায় আমরা তাই উপমহাদেশের সেই সব সম্মানিত বীমা সেবীদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই।

সমাজ সংস্কারক রাজা রাম মোহন রায়

উপমহাদেশের সর্বজনবিদিত সমাজ সংস্কারক হিসেবে রাজা রাম মোহন রায়ের নাম শিক্ষিত সমাজের নিকট অজ্ঞাত নয়। কিন্তু আমরা অনেকেই জানিনা যে, জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা সম্ভবত: তিনি লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কথা হিন্দু সমাজ বিশেষ করে হিন্দু নারীগণ যেমন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন, বীমা বিকাশেও তাঁর অবদান তেমনি শ্রদ্ধার দাবি রাখে। হিন্দু বিধবাদের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি তাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। আর তাই তিনি অনুভব করেন জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা। ১৮২১ সালে "সম্বাদ কৌমুদী" (Sambad Kaumudi) পত্রিকার মাধ্যমে ভারতবর্ষে দানশীল ধনীদের প্রতি তিনি আবেদন রেখেছিলেন যে, তারা যেন হিন্দু বিধবা নারীদের জন্য জীবন

www.pathagar.com

বীমা ব্যবস্থার প্রচলনে এগিয়ে আসেন। তার আবেদনের শেষে তিনি বলেন, "..... if two or three respectable native gentlemen were to institute a life insurance, this would be most advantageous to people in narrow circumstances,.... should some charitable persons be kind enough to establish such a society and be desirous to know how to proceed in this affairs, we shall by their writing to the "Sambad Kaumudi" press publish them as may be found convenient."

রাজা রাম মোহন রায়ের এ আবেদনে তাৎক্ষণিকভাবে কেউ সাড়া দিয়েছিলেন এমন কোন উদাহরণ খুঁজে না পাওয়া গেলেও তার চিন্তা-চেতনা তৎকালীন ভারতবর্ষের অনেককে নাড়া দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে তার ভক্ত বা অনুরাগীদের কেউ কেউ বীমা পেশায় যুক্ত হয়ে জীবন বীমার প্রসারে কাজ করেছিলেন এমন নজীর রয়েছে।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

ধনাঢ্য জমিদার, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিক্ষানুরাগী এবং প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা-চেতনার অনুরাগী ও অনুসারী ছিলেন। তিনি ব্যাংক ও বীমা ব্যবসার গুরুত্ব অনুভব করেন। বৃটিশদের দ্বারা পরিচালিত Laudable Society নামক প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ছিলেন তিনি। বৃটিশদের সাথে একত্রে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন মাত্র ভারতীয় ব্যবসা শুরু করেন তার মধ্যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর একজন। Laudable Society সেকালে সামরিক ও বেসামরিক বৃটিশ কর্মচারীদের, বিধবাদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিছক ব্যবসায়িক কারণে অথবা আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে বীমা অতীব প্রয়োজনীয় এই বোধ থেকে যে তিনি Laudable Society এর সাথে জড়িত হয়েছিলেন তা আমরা জানি না। তবে বীমা ব্যবসার সাথে জড়িত ভারতীয়দের মধ্যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে একজন অগ্রনায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ব্যবসায়ী রুস্তমজী কাওয়াসজী

বোম্বাইয়ের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও ১৮২১ সাল থেকে কোলকাতায় ব্যবসা করতেন রুস্তমজী কাওয়াসজী নামে পার্শী ব্যবসায়ী। ১৮২৮ সালে তিনি বৃটিশদের সাথে অংশীদার হিসেবে বীমা ব্যবসা শুরু করেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত তিনিও প্রথম অবস্থায় Laudable Society-এর সাথে জড়িত ছিলেন।

পরবর্তীতে তিনি প্রায় ছয়টি বীমা কোম্পানীতে বিনিয়োগ করেন। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সান লাইফ, নিউ অরিয়েন্টাল, ইউনিভার্সাল লাইফ ইত্যাদি। তিনি ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স কোম্পানীতেও বিনিয়োগ করেন। এই কোম্পানীতে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভারতীয়।

www.pathagar.com

আইনবিদ কামরুদ্দীন তৈয়বজী

বীমা ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত একজন সফল ব্যক্তিত্ব হিসেবে যার নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে তিনি হচ্ছেন কামরুদ্দীন তৈয়বজী। ভারতীয়দের জন্য ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান "ওরিয়েন্টাল"-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন কামরুদ্দীন। সেলেমানী বোহরা সম্প্রদায়ভূক্ত তৈয়বজীর পিতা বোম্বে নগরীর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী ছিলেন। সেকালে তার পিতার ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতবর্ষে সীমা অতিক্রম করে চীন, ইংল্যান্ডসহ বহুদেশে সম্প্রসারিত হয়েছিল। কামরুদ্দীন তৈয়বজী ইংল্যান্ডে আইন পড়াশোনা শেষ করে বোম্বে নগরীতে আইন পেশায় যোগদান করেন। বোম্বে নগরীতে মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম আইন পেশায় যোগ দেন। একজন শিক্ষানুরাগী এবং দানশীল ব্যক্তি হিসেবেও তার প্রচুর সুনাম ছিল। ১৮৬৩ সালে ২৭ বছর বয়সে তিনি ১৮৮৯ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ওরিয়েন্টাল-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো, বোম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একজন সদস্য হিসেবেও তিনি মনোনীত হয়েছিলেন। বোহরা সম্প্রদায়ের জন্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন Lodge Islam.

শিক্ষাবিদ স্যার সৈয়দ আহমদ

উপমহাদেশে মুসলমানদের অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য বহু অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ। রাজা রাম মোহন রায় যেমন হিন্দু নবজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত, স্যার সৈয়দ আহমদ তেমনিভাবে মুসলমানদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ব্যাপক জাগরণ ও আন্দোলন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Anglo Oriental College আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় নামে আজও যা পরিচিত। মুসলিম রেনেসাঁ বা নবজাগরণের অগ্রপথিক স্যার সৈয়দ আহমদ অনেক ছোট ছোট পারস্পরিক সাহায্য সমিতি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। পারস্পরিক সহযোগিতামূলক (Mutual) এই সব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবত বীমা ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে এই উপমহাদেশে মুসলিমদের মধ্যে কাজ করেছে। দেশ ভাগ হওয়ার পর ভারতে ১৯৫৬ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলো জাতীয়করণ করা হয়।

আইনবিদ লালা হর কৃষেণলাল

১৮৯৬ সালে লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হয় "ভারত" নামের জীবন বীমা কোম্পানী আইনবিদ কৃষেণলালের উদ্যোগে। ভারতীয়দের দ্বারা, ভারতীয়দের জন্য ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠাকে সহায়তা করার লক্ষ্যে এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়। অতি ক্ষুদ্র আকারে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হলেও এই কোম্পানীর প্রতি ভারতীয় শিল্পপতি ও পুঁজিপতিগণ ক্রমশ: আকৃষ্ট হতে থাকেন। পেশায় আইনবিদ হলেও লাল হর কৃষেণলাল ছিলেন একজন সফল শিল্পপতি

www.pathagar.com

এবং আদর্শ দেশপ্রেমিক। জন্মভূমির প্রতি তার অগাধ দেশপ্রেম তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল জীবন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তিনি দেখেছিলেন যে, জীবন বীমা কোম্পানীর উদ্বৃত্ত অর্থ দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ভারতবর্ষকে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব। বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রাধিকার দিতেন জনহিতকর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে। পাঞ্জাবের বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার সমূহে "ভারতের" অর্থ বিনিয়োগের ফলে পাঞ্জাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। বিনিয়োগ ও শিল্পায়নের প্রতি ছিল তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা এবং সাহসিকতা। সেই সময় তাকে "নেপোলিয়ান অফ ইন্ডিয়ান ফিনান্স" নামে অভিহিত করা হত।

জননেতা পান্নালাল ব্যানার্জী ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

উপমহাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। বৃটিশ দ্রব্য ও বৃটিশ ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে দেশীয় দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সেবা গ্রহণের প্রতি সাধারণ মানুষ প্রবলভাবে আকৃষ্ট হতে থাকে। এই সময় পান্নালাল ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল National Insurance Company Ltd.। পি ব্যানার্জী (পান্নালাল ব্যানার্জী) ছিলেন একজন সফল বীমাবিদ। যে কোন মূল্যে নতুন ব্যবসা সংগ্রহ করতে হবে এটি তিনি চাইতেন না। বীমাকে ভারতীয়দের জন্য একটি সম্মানিত পেশা হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি তিনি অধিক মনোযোগী হন। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ বীমা পেশায় আকৃষ্ট হোক এবং সবাই বীমা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হোক এটিই ছিল তার প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী। তার কোম্পানীর শ্লোগান ছিল "National is the nations own"। ১৯২১ সালে অসুস্থ হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ন্যাশনালের হাল ধরেছিলেন অত্যন্ত সফলভাবে।

পান্নালাল ব্যানার্জীর পুত্র প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীও পরবর্তীতে ন্যাশনাল পরিচালনা পরিষদে যোগদান করেন। এস, এন ব্যানার্জীর মত বাগ্মী ও সফল রাজনীতিবিদ ন্যাশনালের বোর্ড সভায় থাকার ফলে এই কোম্পানীর ভাবমূর্তি অনেক বেড়ে যায়। শুধু এন, এন ব্যানার্জীই ন্যাশনালের পরিচালনা পরিষদে ছিলেন তা নয় স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী ও স্যার নলিনী রঞ্জন সরকারের মত সফল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও এ পরিচালনা পরিষদে ছিলেন।

জমিদার সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে (Indian Civil Service) প্রথম ভারতীয় আমলা হিসেবে যিনি যোগদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন জমিদার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপমহাদেশের বীমা ব্যবসা প্রসারে প্রভূত অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ করে বীমা বিক্রয়ের কলা-কৌশল সংক্রান্ত বিভিন্ন

www.pathagar.com

রচনা, পুস্তিকা, লিফলেট তৈরীর ক্ষেত্রে তিনি অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন। ধনাঢ্য জমিদার পরিবারের এবং সফল আমলার সন্তান হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে আরাম আয়েশ ও বিলাসবহুল জীবন কাটানো অতি সহজ ছিল। কিন্তু তিনি বীমা ব্যবসাকে জীবনের এক মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি"। জোড়াসাকোর মহর্ষি ভবনে "হিন্দুস্থান"-এর জন্ম। বাংলার মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পরিবারের নিকট বীমা সেবা পৌঁছে দেয়া ছিল "হিন্দুস্থানে"র মূল লক্ষ্য। এছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিপুল পুঁজি সৃষ্টি করে তা বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করার যে সুযোগ বীমা ব্যবসার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। তাকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির অগ্রগতি নিশ্চিত করার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অগাধ সাহিত্য চর্চার মাঝেও বীমা শিল্পের প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেন। "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটি'র রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার ভাষণে বলেন, "It gives me no little pleasure on this occasion of this silver Jubilee, to look back on the day when the infant institution.... had its birth in one of the rooms of my house in Jorasanko. The reason why I was tempted to do what little I could do to help in ushering it into the world was my own strong faith in the principles embodied in its constitution" বীমা ব্যবসার নীতিমালা সমাজ সেবার একটি মহান সুযোগ এই বোধ ও চিন্তার প্রতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী।

তাই তিনি "হিন্দুস্থান"-এর ক্রম অগ্রযাত্রায় শরীক হতে পেরে আনন্দিত হয়েছিলেন এবং গর্ববোধ করতেন। তিনি তার বক্তৃতায় আরো বলেছিলেন, ".... It is my earnest appeal to the present administrators not to allow themselves to be lured by the glamours of success to desert the great ideal with which the institution was inspired at the start, the ideal of bringing equitable relations and mutual helpfulness, peace and harmony, into the process of wealth production; to ignore the ideal would be to cut at the root of the success..."

রাজনীতিবিদ নলিনী রঞ্জন সরকার

রাজনীতিবিদ নলিনী রঞ্জন ছিলেন ময়মনসিংহের সন্তান। বীমাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার পর সফলতার এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছিলেন বাবু নলিনী রঞ্জন সরকার।

www.pathagar.com

১৯১১ সালে "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ"-এর একজন কেরানী হিসেবে যোগদান করেছিলেন তিনি। এরপর ক্রমে ক্রমে তার অসাধারণ গুণাবলী ও দক্ষতার কারণে তিনি ১৯৩২ সালে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ এর জেনারেল ম্যানেজার-এর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট-এর পদ প্রাপ্ত হন। এন আর সরকার বীমাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও মূলত: তিনি ছিলেন একজন জনদরদী রাজনীতিবিদ। ১৯২৩ সালে তিনি আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং সংসদে স্বরাজ পার্টির প্রধান হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি শেরে বাংলা ফজলুল হক-এর মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এছাড়া তিনি ভারতীয় চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি এবং কোলকাতার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারত বিভাগের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। একজন সমাজসেবী ও জনদরদী রাজনীতিবিদ হিসেবে বীমাকে তিনি জনকল্যাণের একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং বীমা কোম্পানীর উদ্বৃত্ত অর্থ শিল্পায়নে বিনিয়োগ করেন। একজন বীমা পেশাবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন গর্বিত ও আনন্দিত। রাজনীতিতে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকায় তিনি পেশার সাথে শেষ জীবন পর্যন্ত জড়িত না থাকলেও তার মননে, চিন্তায় এবং কর্মে বীমা পেশার প্রতি ছিল আন্তরিক দরদ। "হিন্দুস্থান"-এর বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে এক আবেগময়ী বক্তৃতায় তিনি বলেন, It is because of the Hindustan that I am what I am today. It is the Hindustan which opened up a wider vista for me. It is the Hindustan which provide me training group or larger public Life" নলিনী সরকার ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ বীমাকর্মী। নতুন ধরনের পলিসি উদ্ভাবনে এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে।

তিনি প্রবর্তন করেছিলেন নতুন ধারা। তার নিষ্ঠা এবং দক্ষতার ফলেই কো-অপারেটিভ বিভিন্ন সংকট হতে উত্তরণের মাধ্যমে বীমা শিল্পে অসাধারণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

স্যার ফিরোজ সেথনা

বিদেশী বীমা কোম্পানীতে কাজ করেও উপমহাদেশের সফল বীমা ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেদের সুনাম যারা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন স্যার ফিরোজ সেথনা। পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত ফিরোজ সেথনার শৈশব কেটেছে কোলকাতায়। বোম্বাই হতে স্নাতক অর্জন করার পর তিনি পিতার ব্যবসা দেখাশুনা শুরু করেন। পরে তিনি স্বেচ্ছায় বীমা পেশায় যোগদান করেন এবং ১৮৫১ সালে সান লাইফ অব কানাডার একজন মাঠ কর্মী হিসেবে তার কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ তেইশ বছর তিনি সান লাইফ অব কানাডার বিভিন্ন পদে কাজ করে এই কোম্পানীকে তৎকালীন ভারতের একটি জনপ্রিয় কোম্পানীতে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতের প্রায় সকল বড় বড় শহর ও নগরে সান লাইফ-এর শাখা খোলার পর কলম্বো ও রেঙ্গুনেও শাখা অফিস খোলা

www.pathagar.com

হয়। সান লাইফ-এর জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে ভারত, বার্মা ও শ্রীলংকার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন তিনি।

বোম্বাই এর সামাজিক ও রাজনৈতিক অংগনে তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তীর নায়ক। চার্চ গেইট স্ট্রীটের "বীমা বাবু" নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। বীমা জগতের বাইরেও তার প্রতিষ্ঠা ছিল বিভিন্নমুখী। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি সুদীর্ঘ কুড়ি বছর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া Merchants Chamber-এর প্রেসিডেন্ট, বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট ও ভারতীয় চলচ্চিত্র সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। একজন সুবক্তা হিসেবে তার সুনাম ছিল। তিনি Justice of Peace উপাধিতে ভূষিত হন এবং প্রায় পঁচিশ বছর Honorary Magistrate হিসেবে কাজ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি বৃটিশ সরকার কর্তৃক O.B.E. এবং ১৯২৬ সালে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত হন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নেহেরু পরিবারের অনন্য ভূমিকা সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবহিত। কিন্তু বীমা জগতে নেহেরু পরিবারের অবদান সম্পর্কে আলোচনা খুব কম হয়েছে বলে মনে হয়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ছিলেন ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের একজন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও উদ্যোক্তা। "হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানী" নামক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। এছাড়া ১৮৮৫ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত "লক্ষ্মী" বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত "ট্রপিক্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর"ও পরিচালক ছিলেন তিনি।

ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা হিসেবে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু অনেক কংগ্রেস নেতাকে বীমার সাথে জড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন পাঞ্জাবের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব "পাঞ্জাবের সিংহ" নামে পরিচিত লালা লাজপত রায়। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং লালা লাজপত-এর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব বীমা ব্যবসার সুনাম অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের উদ্যোগে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ভারতীয়দেরকে ভারতীয় বীমা কোম্পানীতে বীমা করার অনুরোধ জানিয়ে একাধিক প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল। ভারতীয় মিল মালিক ও শিল্পপতিদেরকেও কংগ্রেস-এর পক্ষ হতে বলা হয়েছিল যেন তারা শুধুমাত্র ভারতীয় বীমা কোম্পানী হতে বীমা ক্রয় করেন।

হাকিম আজমল খান ও ডক্টর এম এ আনসারী

ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা বীমা ব্যবসার প্রতি খুব বেশী অগ্রসর ছিলেন না একথা আমরা জানি। তবে ব্যতিক্রমধর্মী মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন মুসলিম নেতৃবৃন্দ বীমা ব্যবসায় জড়িত

www.pathagar.com

হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হাকিম আজমল খান এবং ড: এম এ আনসারী। এরা ছিলেন তৎকালীন মুসলিম বীমা ব্যক্তিত্ব। ১৯২৭ সালে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানী Tropical Insurance কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন খান ও আনসারী। এই কোম্পানীতে অবিভক্ত বাংলার অবিসংবাদী নেতা সুভাস চন্দ্র বসু চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ড: এম এ আনসারী পরবর্তীতে ১৯৩৮-এর বীমা আইনের অধীনে Insurance Supervisor নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে ভারতের বীমা শিল্পের সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য Insurance Administrator বোর্ড গঠন করা হয়। আনসারী এই কমিটিরও অন্যতম সদস্য ছিলেন।

বাবু জ্ঞান চন্দ্র দস্তীদার

বরিশালের কৃতি-সন্তান বাবু জ্ঞান চন্দ্র দস্তীদার তৎকালীন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামে জীবন বীমা প্রসারে অসাধারণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বীমা পেশার প্রতি অগাধ নিষ্ঠা, সততা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে অতি সাধারণ অবস্থা থেকে তিনি নিজেকে একজন সফল বীমা কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। আট বছর বয়সে জ্ঞান চন্দ্রের পিতা মারা যান। ১৯১২ সালে আইনের ছাত্র থাকা অবস্থায় একটি বৃটিশ ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে তিনি শিক্ষানবীশ হিসেবে যোগদান করেন। দুই বছর পর তিনি তৎকালীন "প্রভিন্সিয়াল ইনসিওরেন্স"-এর সচিব পদে যোগদান করেন। এরপর ক্রমে ক্রমে ভারতের বীমা জগতে তার সুনাম ও কৃতিত্ব ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন তিনি All Indian Field Workers Association-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি Indian Insurance Institute-এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

---

www.pathagar.com

চার.

বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইসলামের মৌলিক বিধান ও অর্থায়ন নীতিমালা

ইসলামী আইনের মৌলিক ধারণা

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই বেষ্টন করে আছে ইসলামের কতিপয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ যা মুসলিমগণ প্রতিষ্ঠিত করতে ও বজায় রাখতে নীতিগতভাবে বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলামে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। অর্থাৎ শুধু তাঁর ইচ্ছাই বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত থাকবে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের তাৎপর্য হলো কুরআনে বর্ণিত ও নাযিলকৃত জান্নাতী বিধানের শাসন, যা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নাহর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা। সে আল্লাহ প্রদত্ত আইনকে না পারে বাতিল করতে, না পারে অন্য কোনো আইন তৈরি করতে। মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে, মহাজ্ঞানী আল্লাহই তাঁর সব ব্যাপারে সর্বোৎকৃষ্ট পথনির্দেশক তখনই সে অনিবার্যভাবে আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হয়ে যায়। সার্বভৌমত্বকে একবার স্বীকার করে নিয়ে, একে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব সমগ্র উম্মাহ্‌র উপর ন্যস্ত হয়ে যায়।

ইসলামে "তাওহীদ" একটি প্রধান ও মৌলিক বিষয়। ইসলামী জীবনাচার এখানে বিবৃত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে তাওহীদ বলতে বুঝায় শুধু একক সত্তার সাথে সম্পর্ক সুরক্ষা করা ও অনুরূপ সম্পর্ক অন্য কারো সাথে না রাখা। তাওহীদ আল্লাহর সাথে মানুষের একটি প্রতিজ্ঞা। এখানে আল্লাহর ইচ্ছাই সবচেয়ে মূল্যবান। যে মানুষ আল্লাহর ইচ্ছায় সমর্পিত, সে আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কারো খবরদারী ও পথ নির্দেশনা মেনে নেয় না। তাওহীদের মর্মার্থ হলো, এই বিশ্ব কোনো নির্মাতা ব্যতীত অস্তিত্ব লাভ করেনি, অবশ্যই এর একজন স্রষ্টা রয়েছেন। তিনিই হচ্ছেন, এক ও একক আল্লাহ। মানবগোষ্ঠীর জন্য তিনিই একমাত্র আইনদাতা। তাঁর প্রদত্ত এই আইন দিয়েই সমগ্র মানবজাতির বিভিন্ন দিক ও ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রিত হবে। জীবন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, সমগ্র বিশ্বজগত কতিপয় নিয়মের অধীনে, অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বাস্তবে এটি হলো এক আল্লাহর সাম্রাজ্য। তিনি একাই বিশ্বজগত নির্মাণ করেছেন, তিনিই এর মালিক ও শাসক। তাই আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও পথ-নির্দেশনা বিশ্বাসীগণের জন্য আস্থা ও বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্য পরম ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। মানুষের

www.pathagar.com

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এক সুশৃংখল আচরণের মানদণ্ড স্থাপন করেছে। কুরআন ও সুন্নাহ-নির্দেশিত জীবন দর্শন, যে মুসলিম একবার গ্রহণ করেছে, তাকে অবশ্যই ইসলামী আইন মেনে চলতে হবে। সত্যিকার অর্থে 'মুসলিম' অভিধায় তাদেরকেই অভিহিত করা যায়, যারা আল্লাহ্‌কে সার্বভৌম সত্তা স্বীকার করে নিয়েছে ও তাঁর নির্দেশিত পথে নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে।

শারীয়াহ (ইসলামী আইন)

মুসলিম সমাজে মানুষের নয়, একমাত্র আল্লাহর বাণী ও রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ আইন-এর উৎস। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনায় যে জীবন ব্যবস্থা ইসলাম-এর অনুসারীদের প্রদান করা হয়েছে তাই "শারীয়াহ"। আক্ষরিক অর্থে এই আরবি শব্দটির (শারীয়াহ) অর্থ দাঁড়ায়, জীবনের উৎস-পথ। পারিভাষিক অর্থে, এটা এমন এক আইন-পদ্ধতি যা কুরআন ও সুন্নার আলোকে কোন ব্যবহারবিধিকে বোঝায়। সৎ বিশ্বাসে কোন মুসলিম নিজের ব্যবহারবিধিকে কোনভাবেই ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আবর্তে আবদ্ধ করে রাখতে পারেন না কারণ মুসলিমের সমগ্র জীবনটাই শাসিত হবে শারীয়ার মাধ্যমে।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবন নিয়ন্ত্রণের দিক-নির্দেশনা দেয়াই শারীয়া'তের কাজ। খারাপ, পাপ-পুণ্য নির্ণয় করার পদ্ধতি, শারীয়াহ জানিয়ে দেয়। শারীয়াহ একটি পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা ও সর্ব-পরিব্যাপ্ত সামাজিক শৃংখলার নাম। অংশবিশেষ বা আংশিক জীবনের চেয়ে জীবনের সামগ্রিকতার তাৎপর্য ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। সুতরাং শারীয়াহ কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত করার জন্য সামগ্রিক জীবনপদ্ধতিকে এর আওতায় আনতে হবে, অন্যথায় এর কার্যকারিতা দৃশ্যমান হবে না।

শারীয়াহ্ সম্পর্কে একটি প্রণিধানযোগ্য দিক হলো এই যে, মানব জীবনের সব দিক প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্টভাবে এর আওতায় আসে না। আওতাভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু রয়েছে আনুপুঙ্খ নিয়ন্ত্রিত, আর কিছু রয়েছে কতিপয় দিক-নির্দেশক নীতিমালার আওতায় স্বল্পমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিগত জীবনে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণকে সদাজাগ্রত রাখা প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে শারীয়াহ্ আলোকপাত করেছে। এরপর আসে পারিবারিক জীবন ও তদসম্পর্কীয় আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি। ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রধানত সুনির্দিষ্ট কতিপয় সাধারণ শর্তাধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়।

শারীয়াহ শাসিত সমগ্র জীবন-ব্যবস্থার অংশবিশেষ হচ্ছে ইসলামী আইন। এই সমগ্রতার বাইরে এর কোন স্বকীয় অবস্থান অস্তিত্বহীন। তাই শারীয়াহ পদ্ধতি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। কিছু এমন বিষয় রয়েছে যা প্রয়োগ করতে বাইরের কোন শক্তির দরকার পড়ে না। এগুলো শুধু কোনো মুমিনের ঈমান দ্বারা প্রজ্জ্বলিত, সদা-জাগ্রত বিবেক দ্বারা শাসিত হতে পারে। ইসলামী আইন-এর সুবিশাল পরিধি এমন রয়েছে যার আনুপুঙ্খ প্রয়োগের জন্য

www.pathagar.com

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে শক্তির প্রয়োগ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক প্রেক্ষাপটে সরকার যেসব নির্দেশ ও নিয়ম-কানুন অনুমোদন করে থাকে, সে সবকে আইন বলে মনে করা হয়। সংশ্লিষ্ট ইসলামী ধারণা অনুযায়ী এই আইনের সমার্থক হিসেবে শারীয়াহকে দাঁড় করানো যায়। কারণ, এই সমগ্র জীবন-ব্যবস্থা যিনি উপহার দিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন সর্ব ক্ষমতার উৎস ও বিশ্বে সার্বভৌমত্বের কর্তৃত্ব তারই। অবশ্য এমন অনেক বিষয়ও (শারীয়াহ্) এর অন্তর্ভুক্ত, যা অন্য ক্ষেত্রে জরুরীভাবে আইন হিসেবে বিবেচিত হয় না।

ইসলামে ধর্ম ও আইন এমন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটা হতে অন্যটা বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ধর্ম ও আইন দুটোই শারীয়াহর আওতাভুক্ত। পরিবর্তনশীল সময়ের দাবি ইসলামী আইন-অবকাঠামোর ওপর সব সময় চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে। তা সত্ত্বেও শারীয়াহ তার অন্তঃস্থিত সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি সামাজিক প্রয়োজনে নতুন নতুন চিন্তা ও বিষয়ে স্পষ্ট সুরাহা দেখানো সম্ভব হয়েছে।

সব মুনকারাতকে (পাপ) মারুফাত (পুণ্য) দিয়ে বিধৌত করে এর ভিত্তিতে মানবজীবন বিনির্মাণ করাই ইসলামী শারীয়ার প্রধান লক্ষ্য। মারুফাত দ্বারা সব ভালো গুণকে ও পুণ্যকে বুঝায় যা সব সময় ভালো হিসেবে বিবেচিত, বাঞ্ছিত এবং আবশ্যকীয়। পক্ষান্তরে, মুনকারাত সমস্ত খারাপ ও পাপকে বুঝায়, যাকে মানব প্রকৃতি সব সময় মন্দ হিসেবে ঘৃণা করে আসছে। শারীয়াহ মারুফাত ও মুনকারাত-এর ব্যাপারে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে যে, এর মাধ্যমেই ব্যক্তি ও সমাজের ব্যবহারিক আদর্শ নিরূপিত হয়। পাপ-পুণ্যের নির্ঘন্ট তৈরি করেই শারীয়াহ ক্ষান্ত থাকেনি বরং; জীবন পরিক্রমাকে এমনভাবে সাজিয়েছে যাতে পুণ্য উৎকর্ষতা লাভ করতে পারে আর পাপ মানবজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে।

শারীয়ার দুটি অংশ রয়েছে : একটি স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়, অন্যটি পরিবর্তনীয় যা যুগ ও সময়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সক্ষম। ক্রমবর্ধমান মানবিক-সামাজিক চাহিদা পূরণকল্পে শারীয়াহ আইনের দ্বিতীয়াংশে সংশোধনী আনা যায়। দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট ভাষায় যেসব আইন, নির্দেশক-নীতিমালা ও সীমারেখার কথা কুরআনে এবং রাসূলের সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে শুধু সেগুলোই ইসলামী আইনের অপরিবর্তনীয় উপাদান। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থাকে স্থায়ীরূপ দেয়ার জন্য এই অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলোই ইসলামী আইনের অলংঘনীয় ধারা।

মারুফাতকে শারীয়া ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

ক) **ফরজ ও ওয়াজিব ঃ** ফরজ ও ওয়াজিব মুসলিম হিসেবে দাবিকারী প্রত্যেকের ওপর অবশ্য পালনীয় কর্ম। যথাঃ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, রামাদানের সাওম ও যাকাত, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য পালনীয়।

www.pathagar.com

খ) **মুস্তাহাব এবং মাতলুব :** মুস্তাহাব ও মাতলুব সেসব কর্মকে বুঝায় যা অবশ্য পালনীয় নয় অথচ তা পালন করার জন্য মুসলিমদেরকে খুবই তাকিদ দেয়া হয়েছে। যেমন : নফল সালাত, রামাদান মাস ব্যতীত অন্যান্য সময়ে সিয়াম পালন করা ইত্যাদি।

গ) **মুবাহ :** মুবাহ হচ্ছে সেই সব কার্যাবলী, যে কাজকে অবশ্য পালনীয় বা অবশ্য পরিহার্য বলা হয়নি। যেমন : কোনো মুসলিম এক রকম অনুমোদিত খাবারের ওপর অন্য রকম খাবার পছন্দ করতে পারে অথবা কেউ বাগান করা, খেলাধুলা ইত্যাদি পছন্দ করতে পারে এগুলো বৈধ, কিন্তু বাধ্যবাধকতা নেই। মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর এগুলো নির্ভরশীল।

মুনকারাতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

খ) **হারাম :** হারাম কর্ম অবৈধ ও নিষিদ্ধ। ওসব কর্ম কেউ করে থাকলে, তা হবে বড় ধরনের পাপ। যেমন : হত্যা, ব্যাভিচার, মদ পান। ঐসব কর্ম পরকালে আল্লাহর কঠিন শাস্তি ও দুনিয়ায় আইনগত শাস্তি পাওয়ার যোগ্য অপরাধ।

খ) **মাকরূহ :** মাকরূহ কর্মগুলো পুরোপুরি নিষেধ নয় অথচ অপছন্দনীয়। মাকরূহ কর্মগুলো হারামের তুলনায় স্বল্পমাত্রার, সেই হিসেবে হারামের শাস্তির তুলনায় মাকরূহের শাস্তিও স্বল্প। অবশ্য পৌনঃপুনিকভাবে অতিমাত্রায় মাকরূহ কাজ সম্পাদন করলে তা হারামের পর্যায়ে চলে আসে। সেক্ষেত্রে তা সম্পাদনকারীকে হারাম কর্ম সম্পাদনকারীর অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে হয়। ধূমপান স্পষ্টভাবে মদ পানের ন্যায় হারাম ঘোষিত না হলেও তা একটি মাকরূহ কাজ ধূমপানে আসক্তি ও নেশা আবশ্য বর্জনীয়।

সত্যিকারভাবে বলতে গেলে শারীয়াহ যেসব কর্মকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেনি, সেগুলো অনুমোদনযোগ্য মারুফাত (মুবাহ)। মাতলুব হচ্ছে সেইসব কর্ম যা পালন করলে এতে শারীয়াতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু হারাম কর্ম সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলার জন্য শারীয়াহর কঠোর নির্দেশ ও সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। মাকরূহ শারীয়ার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় সুতরাং তা ঘৃণিত ও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

ইসলামী আইনের উৎসসমূহ :

ইসলামী আইনের প্রধান উৎস চারটি

১) পবিত্র কুরআন
২) সুন্নাহ
৩) ইজমা ও
৪) কিয়াস

কুরআন আর সুন্নাহ ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস।

www.pathagar.com

কুরআন : কুরআনকে ফুরকানও বলা হয়। যার অর্থ হচ্ছে সত্যকে মিথ্যা হতে এবং শুদ্ধকে ভুল হতে পরখ করা। কুরআনে প্রায় পাঁচশ'র মতো এমন আয়াত রয়েছে যেগুলোয় আইনগত নীতিমালা আলোচিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে বৃহত্তর নীতি-নির্ধারক আয়াতসমূহ। যেহেতু কুরআন কোন জাগতিক সূত্র হতে উৎসারিত নয়, সেহেতু একথা পরিষ্কার যে, কোন মানুষ বা প্রতিষ্ঠান এর পরিবর্তন করতে পারে না। এটা এই কারণে যে, এই কুরআনের প্রতিটি শব্দ আল্লাহর যা নবী মুহাম্মদ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। মাঝে মধ্যে যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কতিপয় আইনগত সমস্যায় আপতিত হতেন তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশ কামনা করতেন। ওহীর মাধ্যমে সমস্যার যে সমাধান তিনি পেতেন, তাই কুরআনে সুনির্দিষ্ট আইনী উপাদান হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই আইনী আয়াত ছাড়াও নৈতিকতা ও বিবেকবোধ সম্পর্কিত অনেক আলোচনা কুরআনে স্থান পেয়েছে, সেগুলো ইসলামের আইন বিজ্ঞানের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কুরআন প্রদত্ত ধারণা অনুযায়ী এই আইন হচ্ছে আল্লাহর প্রত্যক্ষ আদেশ-নির্দেশ। তিনি এক, তার দেয়া আইনও নিরংকুশ ও পরিপূর্ণ। কুরআন বলে "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সেই বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে" (৩৩:৩৬)। মুসলিম বিশ্বাস করে যে, কুরআন আসমানী উৎস হতে উৎসারিত। এর প্রতিটি কথা স্বয়ং আল্লাহর এবং জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর অবতীর্ণ।

সুন্নাহ : সুন্নাহ শব্দের অর্থ বারবার অতিক্রান্ত পথ, অভ্যাস ও আচরিত স্বভাব যা মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক অনুশীলিত ও আচরিত স্বভাবকে বুঝায়। কুরআনের বর্ণিত নীতিমালা রাসূলের (সাঃ) হাতে প্রায়োগিকরূপ লাভ করেছে। এই প্রায়োগিক রূপই হচ্ছে হাদিস। আইনের উৎস হিসেবে কুরআনের মতো হাদিস-এর নীতিমালাও পরিপালনযোগ্য। কুরআন বলে, "যা কিছু নবী তোমাদের আদেশ করেন, তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু তিনি নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাকো।" (৪৯ ঃ৭)

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারীগণ তাঁর অনুসৃত পথ অনুসরণ করতেন। কোন বিষয়ে মহানবীর সিদ্ধান্ত কি ছিল তা জানতে না পারলে তারা তাঁর সহযোগির (সাহাবাগণের) নিকট সেই বিষয়ে জানতে চাইতেন। তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদিস জানা থাকলে তা উদ্ধৃত করে বিষয়ানুগ সিদ্ধান্ত দিতেন। অবশ্যই তারা হাদিসের নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করে নিতেন।

মহানবীর (সাঃ) ওফাত পরবর্তী সময়ে তার অনুসৃত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহর স্বরূপ নির্ণয়ের এবং মনগড়া পন্থায় কোন নতুন উদ্ভাবন (বিদআত) এই প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহতে অনুপ্রবেশ করলো কিনা এই ব্যাপারে মুসলিমগণ নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। কারণ তাদের নিকট সুন্নাহ আইনের মর্যাদায় অভিষিক্ত। সুন্নাহ আইনের আদালতে বিচার-বিভাগীয়

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তের ভিত্তি। সে কারণে, তাবত রক্ষণশীল মুসলিম বিচারকবৃন্দ সুন্নাহকে ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে মেনে নেয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।

ইজমা ঃ ইজমা অর্থ হচ্ছে উম্মাহর তাবত উলামাবৃন্দ কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা। এই ঐকমত্য হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন বিচার্য বিষয়ে মুসলিম বিচারকগণের ঐকমত্য। ইজমার সত্যায়ন কুরআনেই নিহিত রয়েছে। কুরআন বলে, "হে মুসলমানগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করো তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্টতর। (৪ঃ৫৯) রাসূলের একটি হাদিস থেকে ইজমার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদিসটিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কোন ভুল বিষয়ের ওপর ঐকমত্য পোষণ করতে দেবেন না। এইরূপে ইজমা আইনের একটি উৎসরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোন আইনী বিষয়ে সমগ্র উম্মাহ ঐকমত্য পোষণ করার পর কোন ব্যক্তির পক্ষে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করার অধিকার থাকে না। কারণ সমগ্র উম্মাহ কোন ভুলের ওপর ঐকমত্য পোষণ করতে পারে না।

ইজমা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

ক) মহানবী (সাঃ) ও সাহাবাদের ইজমা
খ) বিচারকমণ্ডলীর ইজমা।
গ) জনগণের ইজমা।

উপরে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর ইজমা সার্বজনীনভাবে গৃহীত এবং তা বাতিল করার অধিকার কারও নেই; পক্ষান্তরে শেষোক্ত প্রকারের ইজমা নিয়ে মতভেদের অবকাশ রয়ে গেছে।

কিয়াস ঃ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যুক্তিসংগত অবরোহন হচ্ছে ইসলামী আইনের চতুর্থ উৎস। এটা অনুমানের ভিত্তিতে যুক্তি দাঁড় করানোর মতো। কোন বিষয়ে পরিষ্কার কোন দিক-নির্দেশনা পাওয়া না গেলে কিয়াস প্রয়োগ করা হয়। কিয়াস-এর প্রসঙ্গে রাসূলের একটি হাদিস উল্লেখ্য। হাদিসটি নিম্নরূপ ঃ ইয়েমেনের প্রধান বিচারপতি রাসূলের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, বিচারকার্য পরিচালনার জন্য যদি তিনি কুরআন ও সুন্নাহর কোন পথ-নির্দেশ না পান, সেক্ষেত্রে তিনি নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করবেন। তার এই জবাবের প্রতি রাসূল (সাঃ) পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

কিয়াস ইসতিহসান-এর জন্ম দেয়। ইসতিহসান হচ্ছে নিষেধ নয়, এরূপ বিষয়ে ইসলামী আইনের আলোকে প্রয়োজনের খাতিরে কোন নিয়ম প্রচলন করা। ক্ষেত্রবিশেষে সমস্যার সমাধান দেয়ার জন্য বিচারকগণ নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি ও মতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এইভাবে কিয়াস, আইনের সুনির্দিষ্ট উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে, যাকে অতি সহজে পাশ

www.pathagar.com

কাটানো যায় না। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে কোন মজবুত ভিত্তি পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে কিয়াস পরিত্যাগ করে ইসতিহসানের আলোকে মজবুত ভিত্তিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। শক্তিশালী কোনো উৎসের বর্তমানে তদসদৃশ্য অন্য উৎসকে বাতিল করার নামই ইসতিহসান, যা শারীয়ায় গ্রহণযোগ্যতা লাভে সক্ষম হয়েছে।

ইজতিহাদ ঃ ইজমার মাধ্যমে ইসলামী আইনের বিকাশে ইজতিহাদী মতবাদ করা হয়। বিধান-দাতার ইচ্ছানুযায়ী জীবনকে একটি সামগ্রিক রূপ পরিগ্রহ করানোর প্রয়াসকেই ইজতিহাদ বলা হয়। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে সাদৃশ্য অনুমান বা পদ্ধতিগত যুক্তিতে সার্বিক উপসংহারে আসার মধ্যেই ইজতিহাদ সীমিত। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও ইসতিহসান ইত্যাদি সূত্র হতে ইসলামী আইন উৎসারিত হয়েছে। ইজতিহাদ হচ্ছে উৎসারিত ব্যাখ্যা বা উৎসারিত বিধানগুলো ব্যবস্থা করার মাধ্যম। কুরআন ও সুন্নায় কোন কোন ব্যাপারে অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্টভাবে আদেশ-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো অপরিবর্তনীয়; কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্র রয়ে গেছে, যেখানে পুঁথিগত গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস হতে কিছু নিয়ম-নীতি বের করা সম্ভবপর। যা ইসলামী আইনী পদ্ধতিকে গতিশীল করে তুলতে পারে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ইজতিহাদ মানে প্রয়াস, বৃদ্ধি করা। পারিভাষিক অর্থে ইজতিহাদ হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় কোন বিধানের যথার্থ ও অন্তর্নিহিত মর্মার্থ নিশ্চিত করা। কোন আইনের সঠিক, আনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও কোন্ শর্তাধীনে আইনটি প্রয়োগ করা হয়েছিল তা পর্যবেক্ষণ করাই ইজতিহাদের উদ্দেশ্য।

ইজতিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে শারীয়ার বিধানকে যথাযথভাবে আত্মস্থ করা এবং শারীয়াতের বুনিয়াদী দিক-নির্দেশনার আলোকে ইসলামী আইন ব্যবস্থায় গতি সঞ্চার করা। ইজতিহাদ এমন বিষয়ে আইনী মতামত প্রদান করে, যে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন আদেশ-নিষেধ নেই; কিংবা অতীতেও ছিল না। আর এই মতামত পুরোপুরিভাবে শারীয়াহ্‌র সাধারণ নীতিমালা ও চেতনার আওতায় হতে হবে।

ফিক্‌হ ঃ (ইসলামী আইন বিজ্ঞান)। ফিক্‌হ-এর আক্ষরিক অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি। পারিভাষিক অর্থে ইসলামী আইনের মাধ্যমে ইসলামকে জানার নামই ফিক্‌হ। একে ইসলামী আইন বিজ্ঞান হিসেবেও ভূষিত করা হয়। সমগ্র ইসলামী আইন ব্যবস্থা ও আইনের কোন বিষয় স্বাধীনভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ফিকাহর আওতাভুক্ত। ইসলামী আইনের উৎসগুলোই ফিকাহ-এর ভিত্তি। ফিকাহ সাধারণত বিচার-ব্যবস্থা নিয়ে আলোকপাত করে অর্থাৎ উৎসগুলোর বিচার-সম্পর্কিত যথার্থতা প্রতিষ্ঠায় প্রাথমিক নীতিমালাই ফিকাহ। ফিকাহ-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন কাজ, হয় বৈধ নতুবা অবৈধ। অর্থাৎ যে কাজ বৈধ নৈতিক, অন্য দিকে অবৈধ কাজ অনৈতিক। মুসলমানদের জন্য অবৈধ কর্ম পরিহার করা অত্যন্ত জরুরী। অপরদিকে অবৈধকে বৈধ বানানোও অসংগত। একজন মুসলমানের

www.pathagar.com

কোনোভাবেই নিজেকে এমন কোন কর্মে জড়িত করা উচিত নয়, যা আল্লাহ স্পষ্টভাষায় নিষেধ করেছেন এবং ঐ নিষিদ্ধ কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ যা হালাল করেছেন কোন মুসলিম তাকে হারাম করতে পারে না এবং যা হারাম করেছেন তা হালাল করতে পারে না।

যাই হোক, অপেক্ষাকৃতভাবে স্বল্প সংখ্যক জিনিসই হারাম অথবা মাকরূহ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। হারামগুলো সকলের কাছেই একইভাবে নিষিদ্ধ। সৎ নিয়ত কোন হারামকে গ্রহণযোগ্য বানাতে পারে না। তথাপি বিশেষ প্রেক্ষাপটে কোন কোন হারাম গ্রহণযোগ্য। কোন মুসলিম-এর পক্ষে শূকরের মাংস ভক্ষণ করা হারাম; কিন্তু যদি অবস্থা এমন হয়ে যে, সে ক্ষুধার কষ্টে মারা যাবে; কিন্তু শূকরের মাংস ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য দুষ্প্রাপ্য, সেক্ষেত্রে শূকরের মাংস খাওয়া সেই ব্যক্তির জন্য তদবস্থায় অনুমোদনযোগ্য। কোন কিছুকে আইনগতভাবে বৈধ বা অবৈধ ঘোষণা করার অধিকার কেবল আল্লাহরই। হালালের ভেতর হারামের প্রচ্ছন্ন অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। আল্লাহ স্বীয় কুরআনে বলেছেন– "বলো, আচ্ছা নিজেই লক্ষ্য করে দেখ, যা কিছু আল্লাহ রিযক হিসেবে তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে হারাম আর কোনটিকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বল, আল্লাহ্ কি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপ করছো? (১০ঃ৫৯)

ফিকাহ-এর মৌলিক নীতিমালা হলো, কোনো জিনিসের অনুমোদন ও নিষেধাজ্ঞা সেই জিনিসের ক্ষতিকর দিক ও অপরিশুদ্ধতার সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যা হারাম তা অতিরিক্ত অন্যদিকে যা হালাল তাই পর্যাপ্ত। ইসলামের শাশ্বত বিধান শুধু ধর্মাচারণে সীমিত নয় বরং এর ব্যাপ্তি মুসলিম জিন্দেগীর প্রতিটি ক্ষেত্রে। একজন মুসলিম জাগতিক ব্যাপারে এই উদ্দেশ্যেই নিজেকে সম্পৃক্ত করবে যে, কোনো বস্তুগত সমৃদ্ধি ও উন্নতি অবশ্যি তাকে যুগপৎ ও উম্মাহর প্রতি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আত্মিক উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করবে।

এই জাগতিক জীবনে সম্পৃক্ত হওয়ার সাথে সাথে তাকে স্মরণ রাখতে হবে, সে যেন তার দৈনন্দিন জীবন ও আল্লাহর বন্দেগীর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে পারে। যেহেতু মুসলিম মাত্রই এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, বিশ্বের সবকিছুর মালিক আল্লাহ্ যিনি তাকেও সৃষ্টি করেছেন। তাই সে তাঁর চিন্তায় ও আচরণে হবে সুষম ও নৈর্ব্যক্তিক। কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সবচেয়ে কার্যকর প্রভাব হলো, এক আল্লাহর আইন মেনে নেয়া। কেননা, সে এই মর্মে বিশ্বাস পোষণ করে যে, প্রতিটি কর্ম গোপন বা প্রকাশ্য সবই আল্লাহ জানেন। কোন সংকল্প বা কর্ম, কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। কিছুই লুকানো সম্ভব নয়। ফলশ্রুতিতে, সে নিষিদ্ধ জিনিস পরিহার করবে আর বৈধ ও ভাল জিনিসকে অবলম্বন করবে।

www.pathagar.com

সুদের নিষিদ্ধতা

ইসলামি আইনে যে সব বিষয়ে নিষিদ্ধতা রয়েছে তার মধ্যে সুদ অন্যতম। সুদ বা রিবা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আরবি শব্দ রিবা-এর অর্থ কোন কিছুতে বৃদ্ধি বা যোগ করা। অর্থ ব্যবহারের ফলে আহরিত পূর্ব নির্ধারিত মূল্য বা ফলাফল। ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ; কারণ সুদ দাতাকে ধ্বংস করে দেয় ও গ্রহণকারীকে লোভী ও স্বার্থপর করে তোলে। দুর্বলকে শোষণ থেকে মুক্ত করাই ইসলামের লক্ষ্য। সুদের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধতাকে সমস্ত মুসলিম আইনবিদগণ মেনে নিয়েছেন। উৎপাদনশীল বা অনুৎপাদনশীল উভয় ক্ষেত্রেই সরল বা মিশ্র সুদ নিষিদ্ধ। সুদকে কুরআন ও সুন্নাহ-উভয়েই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে যারা সুদের নিষিদ্ধতা অমান্য করল তারা সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল।

ইসলামী আইনে সুদ পুরোপুরি নিষিদ্ধ, কারণ শারীয়াহ্ অর্থকে পণ্য মনে করে না, যার ব্যবহারের ওপর মূল্য ধার্য হতে পারে। কোন আর্থিক লেনদেন থেকে মুনাফা অর্জনকে ইসলাম অনুমতি দেয় না, যদি না এর সুবিধাভোগী এই লেনদেন হতে সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে। ইসলাম মনে করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ-এর তুলনায় সুদের ভিত্তিতে আহরিত সম্পদ অত্যন্ত স্বার্থপরতার পরিচায়ক।

ঋণ প্রদানের শর্তে কোন উপহার, সেবা, অগ্রিম অর্থ বা মেয়াদান্তে যা কিছু প্রাপ্য তা স্থির হোক বা পরিবর্তনশীল হোক যা কিছু নির্ধারিত করা হবে, তা সুদ হিসেবে গণ্য। রিবা চক্রবৃদ্ধি সুদ, সরল সুদ নয়, এই কথা বলে চালিয়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই। সুদের নিরংকুশ অবৈধতা ঘোষণার মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহ এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন করার নির্দেশ দেয় যেখানে সবরকম লোভ তিরোহিত হবে। অর্থ সরবরাহকারী ও উদ্যোক্তার মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসলামী ফিকাহ্ অনুসারে সুদ দুই প্রকার যথা ঃ

ক) রিবা আন নাসিয়া
খ) রিবা আল ফদল

ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের যে বিলম্বিত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয় তাই নাসিয়া। এটা এই জন্য করা হয় যে, গ্রহীতা ঋণ পরিশোধের জন্য যে বিলম্বিত সময়ের সুযোগটা নেয়, তার জন্যই ঋণের অংকের অতিরিক্ত এই অর্থ ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে হয়। রিবা নাসিয়া এমন একটি ঋণ চুক্তি যেখানে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে তার আসল অর্থের অতিরিক্ত পূর্ব নির্ধারিত হারে ঋণের টাকা পরিশোধে বিলম্বিত সময়ের জন্য প্রদান করে থাকে। এতে অপর পক্ষকে সুবিধা-বঞ্চিত করে অন্যায়ভাবে সম্পদশালী হওয়া ও আর্থিক সুবিধা ভোগের সুযোগ নিহিত থাকায় একে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বিক্রয় লেনদেন-এর ক্ষেত্রে যা অতিরিক্ত আদায় করা হয় তাই রিবা ফদল। এটা এমন এক পণ্য বিনিময় চুক্তি যেখানে পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমপরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পণ্য দাবি করা হয়। সতর্কতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে মহানবী (সাঃ) রিবা ফদলকে নিষিদ্ধ করেছেন, অন্যথায় এটাও রিবা নাসিয়ায় পরিণত হতে পারে।

কুরআনে বর্ণিত সুদের ধারণা ও সংজ্ঞায় কোন দ্ব্যর্থবোধকতার অবকাশ নেই। অত্যন্ত পরিষ্কার ও সাবলীল ভাষায় কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের অবশিষ্ট অংশ তোমরা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ঈমানদার হও।" (২ঃ২৭৮) আরও বলা হয়েছে, "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম" (২ঃ২৭৫)। সুতরাং মানবিক অথবা নৈতিক কারণে কোন ঋণ গ্রহণ করা হলে অথবা প্রদত্ত হলে শুধু আসল অর্থই বিবেচ্য হবে। এর ওপর অতিরিক্ত কিছু ধার্য করা অনৈতিক ও শোষণমূলক। যদি ঋণ বা বিনিয়োগ কোন অর্থনৈতিক কারণে হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ঋণ বা বিনিয়োগদাতা নির্ধারিত হারে কোন মুনাফা দাবি করতে পারবে না। ব্যবসায় ঝুঁকির অংশীদার না হয়ে কেউ অতিরিক্ত প্রাপ্তির অধিকার লাভ করতে পারে না। উৎপাদনশীল উদ্যোগ ও ভোগের জন্য প্রদত্ত ঋণের মাঝে কুরআন কোন রকম পার্থক্য করে না।

ইসলামী আইন অনুযায়ী সমবায়ী ও দাতব্য কার্যক্রমের জন্যই সুদবিহীন ঋণ প্রযোজ্য। বাণিজ্যিক অর্থায়নের জন্য ইসলামী শারীয়াতের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এখানে যে নীতিটি ক্রিয়াশীল, তা হলো, ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতাকে সহায়তা করতে চায়, না তার অর্জিত মুনাফার অংশ নিতে চায়। যদি ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতাকে সাহায্য করতে চায়, তাহলে অতিরিক্ত আদায় করার দাবি পরিত্যাগ করতে হবে। আসলই শুধু তার প্রাপ্য, এর ওপর অতিরিক্ত কোন দাবি অবৈধ। যদি ঋণদাতা অন্য পক্ষকে দেয়া অর্থে তার অর্জিত মুনাফায় অংশ নিতে চায়, সেক্ষেত্রে আসলে অর্জিত মুনাফার ওপর সমানুপাতিকহারে নির্ধারিত মুনাফার অংশ পেতে পারে অবশ্য যদি লোকসান হয়, লোকসানের অংশও তাকে নিতে হবে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অর্থায়ন করা হলে, সেক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তা পরিচালিত হবে।

সুদ নিষিদ্ধকরণের যৌক্তিকতা

বাণিজ্যিক অর্থায়নে স্থির ও পূর্বনির্ধারিত মুনাফাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। উৎপাদনশীল ও লাভজনকখাতে পরিবর্তনশীল মুনাফা পুরোপুরি বৈধ। সত্যিকারের উৎপাদনমুখী ও লাভজনক উদ্যোগে অর্জিত পরিবর্তনশীল আয়/মুনাফা সম্পূর্ণ বৈধ। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামী অর্থায়নের সবক'টি পদ্ধতিতে ঝুঁকি বিদ্যমান থাকবে ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। সম্পদের বিপরীতে অর্থের যোগান দেয়াই ইসলামী অর্থায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, ইসলাম অর্থকে ব্যবসার

www.pathagar.com

বিষয়বস্তু বলে মনে করে না। অর্থের কোনো অন্তর্নিহিত মূল্য নেই, তাই অর্থের বিনিময়ে মুনাফা অর্জনের কোনো সুযোগ নেই। অর্থ বিনিয়োগ করে যে আয় করা হয়, তাই সুদ, সুতরাং সুদ হারাম। তরল সম্পদই ইসলামী অর্থায়নের ভিত্তি। তরল সম্পদ প্রকৃত সম্পদ সৃষ্টি করে ও সম্পদের নির্যন্টি তৈরি করে। সুতরাং ইসলামী আইনে ঐরূপ অর্থায়নের যে কোন পদ্ধতিতে ঝুঁকি রয়েছে এবং সেই ভিত্তিতে লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব জড়িত।

ইসলাম মূলধন ও উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের দু'টো স্বতন্ত্র উপাদান বলে মনে করে না। কোনো ব্যক্তি যে কোনো বাণিজ্যিক উদ্যোগে মূলধন সরবরাহ করলেই লোকসানের ঝুঁকি কাঁধে নেয়, সুতরাং সমানুপাতিক হারে সে অর্জিত আসল মুনাফারও অংশীদার হয়। এ ভাবেই ব্যবসায় ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে মূলধনেই উদ্যোক্তার অন্তর্নিহিত উপাদান লুকায়িত থাকে। সুতরাং স্থির উপার্জন হিসেবে সুদের চেয়ে মুশারাকা ও মুদারাবা হচ্ছে লাভ-ক্ষতির অংশগ্রহণে পরিচালিত ব্যবসার মধ্যে মুনাফা অর্জনের সবচেয়ে পরিচিত পদ্ধতি।

বাণিজ্যিক, অ-বাণিজ্যিক, ব্যষ্টিক বা সামষ্টিক, ব্যক্তিগত বা সামগ্রিক যে কোন ধরনের লেন-দেন-এ পূর্ব নির্ধারিত আরো যদি কোন অতিরিক্ত অর্থ বা দ্রব্য ধার্য করা হয়, তবে তা রিবার অন্তর্ভুক্ত এবং নিষিদ্ধ। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে অগ্রিম ঋণ বা আর্থিক ইনস্ট্রুম্যান্ট ব্যবহার করে সবগুলোই ইসলামী কাঠামোর অধীনে সুদ বলে পরিগণিত। তাই, মুসলিমগণ বিকল্প অর্থায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ ক্ষেত্রে জনহিতকর ও নৈতিক দিক বিবেচনায় অর্থায়ন করে থাকে। ঋণ-ভিত্তিক অর্থনীতির সাথে ইসলাম অপরিচিত। ইসলামী ব্যবস্থায়, স্ব-অর্থায়ন, সমবায়-ভিত্তিক-অর্থায়ন ও পরোক্ষ অর্থায়নে ঝুঁকি নেয়ার ভিত্তিতে একটি ভূমিকা থাকে যা পূর্ব নির্ধারিত স্থির উপার্জনে সম্ভব নয়। লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ ও বহন করার মাধ্যমে আর্থিক মূলধন আয় করতে পারে। তাই, ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়নের জন্য এমন খাতের অনুসন্ধান করতে হবে, যেখানে ঝুঁকি বহন করার উপাদান নিহিত থাকবে।

ইসলামী বিধিবিধান অনুযায়ী অর্থায়নকারীকে আগে নির্ধারণ করতে হবে, সে ঋণগ্রহীতাকে মানবিক কারণে সহায়তা করার জন্য ঋণ দিচ্ছে, নাকি তাকে মুনাফা অর্জনের জন্য ঋণ দিচ্ছে। যদি সহায়তা করার মানসে ঋণ দেয়া হয়, তাহলে প্রদত্ত ঋণের অতিরিক্ত আদায়ের দাবি ত্যাগ করতে হবে। অন্যদিকে যদি সে তার মুনাফায় অংশ পেতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে লোকসানের ঝুঁকিও মাথা পেতে নিতে হবে। ইসলামিক পরিভাষায় তাকেই বলে মুশারাকা, যার শব্দগত অর্থ অংশীদারিত্ব। যেহেতু সব ধরনের সুদ ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাই ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থায় মুশারাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সুদের নিষিদ্ধতা ইসলামী অর্থনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ। এই নিষেধাজ্ঞাকে নির্বাসিত করা অথবা ইসলামী বিশ্বাসের প্রতিকূলে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। সুদের নিষেধাজ্ঞা মানবতার জন্য অন্যান্য আশীষগুলোর অন্যতম। মানবিক দ্বন্দ্বের

www.pathagar.com

মূলোৎপাটনে সুদের এই নিষেধাজ্ঞা অন্যতম প্রতিষেধক। শান্তি, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ গঠনে সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল। চলুন আমরা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত কয়েকটি অর্থায়নে পদ্ধতির আলোচনা করি ঃ

মুশারাকা (অংশগ্রহণ) ঃ ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবস্থায় মুশারাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মুশারাকা শব্দের অর্থ অংশগ্রহণ। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পটভূমিতে মুশারাকা অর্থ কোন যৌথ উদ্যোগে সকল অংশীদারের লাভ-ক্ষতির যৌথ অংশীদার হওয়া। যৌথ কারবারে প্রকৃত মুনাফার ভিত্তিতে মুশারাকার আয় নির্ধারিত হয়। যৌথ উদ্যোগে মুনাফা না হলে, অর্থের যোগানদাতা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অথচ সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় ঋণদাতা ক্ষতির অংশ নিতে বাধ্য নয়।

সুদভিত্তিক অর্থায়নের বিকল্প হিসেবে ইসলাম মুশারাকাকে উপস্থাপিত করেছে। চুক্তির মাধ্যমে মুশারাকায় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চুক্তি সম্পাদনের সময়েই পক্ষগুলোর মধ্যে মুনাফা বন্টনের আনুপাতিক হার পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। বিনিয়োগকৃত অর্থের ভিত্তিতে বা কোন নির্দিষ্ট অংশ, মুনাফা হিসেবে নির্ধারণের কোন সুযোগ এতে নেই। অবশ্য লোকসানের ক্ষেত্রে মূলধনের অনুপাতে লোকসান ভাগাভাগি করতে হয়।

মুশারাকা নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় বা ব্যবসার জন্য কাজ করতে পারে। তবুও অংশীদারগণ সম্মত হলে, কোন নিষ্ক্রিয় শরীকদার নেয়া যেতে পারে যিনি শুধু তার বিনিয়োগ-অনুপাতে মুনাফার অংশ পেতে থাকবেন। সেক্ষেত্রে সকল অংশীদার একযোগে যৌথ কারবার পরিচালনার জন্য সম্মত হবেন, তখন প্রত্যেকে অপরের প্রতিনিধিত্ব করবেন। মুশারাকায় যখন অংশীদারগণ তাদের মূলধন মিশ্রণ করে ফেলেন, তখন সমুদয় সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব তাদের নিজ নিজ বিনিয়োগের অনুপাতে নিরূপিত হবে। এভাবে প্রতিটি অংশীদার আয়কৃত সম্পত্তির মূল্য হতে সুবিধা ভোগ করতে পারেন যদি স্বাভাবিক লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জিত নাও হয়। মুশারাকা চুক্তি একবার সম্পাদিত হলে, তৎপরবর্তী সমুদয় লেনদেন যৌথ তহবিলের আওতায় পরিচালিত হয়, তখন কারও আলাদা সত্তা বিবেচনা করা হয় না। চুক্তির বলে, প্রত্যেক অংশীদার প্রতিটি লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়।

মুদারাবা ঃ ইসলামপূর্ব যুগ থেকে প্রচলিত একটি প্রাচীন লেনদেন-পদ্ধতি যা ইসলাম গ্রহণ করেছে। মুদারাবা একটি অংশীদারি চুক্তি যা কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যবসায় পরিচালনার জন্য দিয়ে থাকে। যে অংশীদার অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে তাকে বলা হয় সাহিব আল-মাল আর যিনি ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকেন, তাকে বলা হয় মুদারিব। ব্যবস্থাপনা ও কার্য সম্পাদন করা মুদারিবের কর্তৃত্বাধীন। চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারগণের মধ্যে মুনাফা বণ্টন করা হয়। মুদারিব ও সাহিব-আল-মাল

www.pathagar.com

পরস্পরের মুনাফার অংশ সম্পর্কে অনবহিত থাকলে মুদারাবা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। মুদারাবায় কোন অংশীদারের জন্য মুনাফার কোন বিশেষ অংশ আলাদা করে রাখার অনুমতি নেই। মুদারিব লাভের অংশ পান কিন্তু ক্ষতির প্রত্যক্ষ কোন অংশ তাকে বহন করতে হয় না। কারণ মুদারিব কোন পুঁজি লগ্নি করে না।

মুরাবাহা ঃ বিশেষ এক ধরনের বিক্রয় পদ্ধতির নাম মুরাবাহা। এই বিক্রয় পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতি থেকে একমাত্র একটি বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা। এখানে বিক্রেতা, ক্রেতার নিকট তার ক্রয়মূল্য উল্লেখ করে থাকে এবং ক্রয়মূল্যের সাথে কোন্ হারে মুনাফা সংযোজন করে সেই নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রি করবে, তা উল্লেখ থাকে। যদি কোন বিক্রেতা, ক্রেতার নিকট কোন নির্দিষ্ট পণ্য নির্ধারিত মুনাফায় বিক্রি করে তবে তাকেই মুরাবাহা লেনদেন বলা হয়। মুরাবাহা লেনদেনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো বিক্রেতা কিভাবে, কত দামে পণ্যটি সংগ্রহ করেছে এবং ক্রয়মূল্যের সাথে কত মুনাফা ধার্য করবে তা ক্রেতাকে অবহিত করে থাকে। যে সমস্ত ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুরাবাহাকে ইসলামিক অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে পরিচালনা করছেন সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পারস্পরিক সম্মতিক্রমে পণ্যের পুনঃমূল্য নির্ধারিত হবে।

মুরাবাহা চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য কিছু শর্তাবলী রয়েছে। প্রথমতঃ সুস্পষ্ট আর্থিক পক্ষদ্বয়ের মাঝে মুনাফার হার নির্ধারিত হবে। দ্বিতীয়তঃ সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিক্রেতা এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ক্রেতার মধ্যে সংঘটিত লেন-দেন সম্পূর্ণ আলাদা হবে। তৃতীয়তঃ মুরাবাহা বৈধ হওয়ার জন্য পণ্যের প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত করতে হবে। যদি প্রকৃত মূল্য নিরূপিত না হয় তাহলে সেই পণ্য মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রয় করা যাবে না।

বিভিন্ন আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য মুরাবাহা পদ্ধতির অর্থায়ন যেমন– ভোগ্য-পণ্য, রিয়েল এস্টেট, স্বল্প মেয়াদী অর্থায়নের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। মুরাবাহার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বা উভয় পক্ষের ঐকমত্যে পরবর্তী কোন তারিখে মূল্য পরিশোধ করা যায়।

ইজারা ঃ ইজারা ইংরেজি leasing-এর সমার্থক শব্দ। ইজারা শারীয়াহ-অনুযায়ী পরিচালিত অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে আসছে। এই পদ্ধতিতে কোন সম্পত্তি ক্রয় করে তা ক্রেতার নিকট ভাড়া দেয়া হয়। সম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ভাড়ার সময় নির্ধারিত হয়। ভাড়া চলাকালীন সময়ে সম্পদের মালিকানা থাকবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষান্তরে ব্যবহৃত সম্পদের অবয়বগত স্বত্ব ও ব্যবহারের অধিকার থাকবে ভাড়া গ্রহীতার। চুক্তিবহির্ভূত অন্য কোন ভাড়াকালীন সময় ব্যাপী সম্পত্তির ঝুঁকি ভাড়াগ্রহীতার উপর ন্যস্ত থাকবে।

ইজারাচুক্তি সম্পাদন করার সময়েই ইজারাকৃত সম্পদের ভাড়া নির্ধারিত হয়। ভাড়াকালীন সম্পদের বিভিন্ন হারে ভাড়া নির্ধারণ করা যায় তবে শর্ত থাকে যে,

www.pathagar.com

ইজারাচুক্তি কার্যকর করার সময় এর উল্লেখ থাকতে হবে। ভাড়াদাতা একক সিদ্ধান্তে ভাড়া বৃদ্ধি করতে পারবে না। শারীয়া অনুযায়ী ভাড়া দাবি করতে হবে পণ্য দখলে নেওয়ার পর থেকে, মূল্য পরিশোধ করার দিন থেকে নয়।

সালাম ঃ সাধারণ শারীয়া অনুযায়ী অগ্রিম বিক্রয় নিষিদ্ধ। তবে কতিপয় শর্তাধীনে মহানবী (দঃ) অগ্রীম বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ক্ষুদ্র চাষীদের ফসল তোলার সময় পর্যন্ত ফসল ফলানো ও পরিবার পোষার জন্য অর্থের প্রয়োজন পড়ত। তাই তাদের জন্য কৃষি পণ্য আগাম বিক্রয়ের অনুমোদন ছিল।

ইসলামী শারীয়াতে অগ্রিম বিক্রয় সেসব পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেসব পণ্যের গুণগত মান দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্ধারণ করা হবে, যাতে কোন বিতর্কের অবকাশ না থাকে। সবধরনের আনুপুঙ্খ বর্ণনা অতীব সুস্পষ্ট ভাষায় পণ্যের গুণগত মানসহ উল্লেখ থাকা অপরিহার্য। তাছাড়াও সঠিক তারিখ, পণ্য খালাসের স্থান সুনির্দিষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে। মহানবীর বিখ্যাত একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, যে কেউ সালাম বা আগাম বিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবেন। তাকে অবশ্যই সঠিক ওজন, সঠিক পরীক্ষার ও সরবরাহ করার সঠিক তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

সালাম বৈধ হওয়ার জন্য ক্রেতাকে বিক্রয় সম্পাদনের সময় সমুদয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অগ্রিম বিক্রির ক্ষেত্রে যে অবস্থায় রয়েছে সে অবস্থায় সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্যের চেয়ে নিম্নতর মূল্য, পণ্যের ক্ষেত্রে ধার্য করা যেতে পারে।

এই দুই ধরনের মূল্যের মাঝখানে যা হাতে থাকবে তাই অর্থ যোগানদাতার বৈধ মুনাফা। অর্থায়নকারীকে অবশ্যই মূলের পরিবর্তে পণ্য গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে সরবরাহ হওয়ার পরে সেই পণ্যসমূহ বিক্রি করতে পারবে না।

ইসতিসনা ঃ ইসতিসনা হচ্ছে অন্য রকম একটি বিক্রয়চুক্তি যেখানে পণ্যের উপর কিছু মুনাফা ধরে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা হয় অথচ উৎপাদিত সামগ্রী পরবর্তী কোন সময় সরবরাহ করা হয়। এটা এমন এক বিক্রয় পদ্ধতি যা পণ্য উৎপাদিত হওয়ার পূর্বে সম্পাদিত হয়ে থাকে। ইসতিসনা চুক্তির জন্য পণ্য সর্বদাই উৎপাদিত হওয়ার দরকার পড়ে।

ইসতিসনা চুক্তির আওতায় প্রস্তুতকারী সর্বোচ্চ সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করে থাকে। ইসতিসনা চুক্তিতে পণ্য নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করা আবশ্যকীয় নয়। তথাপি উভয় পক্ষের সম্মতিতে মূল্য নির্ধারণ ও পণ্যের পুরো নমুনা নির্ধারণ সম্পন্ন করতে হয়। প্রস্তুতকৃত পণ্যের নমুনা যদি চুক্তির শর্তানুযায়ী হয়ে থাকে, তাহলে ক্রেতা সেই পণ্য গ্রহণ করতে বাধ্য। তবুও যদি প্রস্তুতকারী পণ্য সরবরাহ করতে বিলম্ব ঘটায় অথবা নমুনা অনুযায়ী প্রস্তুত না করে, ক্রেতা সেই পণ্য গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে না।

ইসলাম সুদভিত্তিক লেনদেন নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু বাণিজ্য ও অর্থায়নের বিকল্প পদ্ধতির অনুমোদন দিয়েছে। অনুমোদিত অর্থায়ন পদ্ধতিগুলো লাভ-লোকসান ভাগাভাগি নীতির

www.pathagar.com

ভিত্তিতে বিবিধ রকমের হয়ে থাকে। হাদিস অনুযায়ী মুনাফা পক্ষগুলোর সম্মতির ভিত্তিতে, আর ক্ষতি স্ব স্ব পুঁজি বিনিয়োগের অনুপাত অনুযায়ী ভাগাভাগি হবে। লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব ব্যতিরেকেও ইসলাম প্রকৃত ব্যবসার জন্য অর্থায়ন-এর অনুমতি দেয়, তবে শুধু অর্থলগ্নি কারবার পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

যে কারণে আল-ঘারার নিষিদ্ধ ঃ ব্যবসায়িক চুক্তির উপাদান হিসেবে আল-ঘারার বা অস্পষ্টতাকে হাদিসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল-ঘারার অর্থ অনিশ্চয়তা বা অস্পষ্টতা। ইসলামী আইন বিজ্ঞান মতে, অনিশ্চয়তামূলক কোন উপাদান ব্যবসায়িক চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। এর পরিণাম অত্যন্ত ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য। কোন চুক্তি বৈধতার জন্য সম্মতির উপাদানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বিধায় যে কোন লেনদেনে ঘারারকে প্রতিহত করা হয়। অপরিহার্য কোন উপাদান সম্পর্কে অথবা অস্পষ্টতা নিয়ে অনবহিত থেকে কোন পক্ষ হতে সে বিষয়ে তার সম্মতি আশা করাটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। মহানবী (সাঃ) বলেছেন কোন কিছু বিক্রির পূর্বে সেই জিনিস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা না দিয়ে উক্ত জিনিস বিক্রয় অনুমোদনযোগ্য নয়, আবার পণ্যের কোন ত্রুটি (যদি তার জানা থাকে) না জানানোও অবৈধ।

ঘারার-এর ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। বিভিন্ন ধরনের লেনদেনে এর অর্থের রকমফের হয়ে থাকে। তবু সাধাণরত ঘারার বলতে চুক্তির ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ ও অনির্দিষ্ট কোন উপাদানকে বুঝায়। এর অর্থ স্বচ্ছতার অভাব। যেখানে সেইসব ব্যবসায়িক কায়কারবার উপস্থিত কোন পক্ষ দরকষাকষির শেষ প্রান্তে পৌছেও তার প্রাপ্য সম্পর্কে অনবহিত থেকে যায়।

নিম্নের যে কোন একটি বা সবকটি ব্যবসায়িক চুক্তিতে তথ্যের অভাবজনিত কারণে ঘারার-এর উপাদান বর্তমান থাকে ঃ

ক) গুণগত মান
খ) পরিমাণ
গ) মূল্য
ঘ) পরিশোধ সংক্রান্ত শর্ত
ঙ) পণ্যের প্রকৃতি
চ) পণ্য সরবরাহের সম্ভাব্যতা ইত্যাদি।

ব্যবসায়িক পণ্যের সহজপ্রাপ্যতা, পরীক্ষা, গুণাগুণ, মূল্য, সম্পন্ন হওয়ার তারিখ, বিষয়বস্তুর সরবরাহ ইত্যকার বিষয়কে ঘিরে যে অনিশ্চয়তা বা অস্বচ্ছতা তাই ঘারার। চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত থাকা অপরিহার্য। কারণ কোন বিষয় সম্পর্ক ওয়াকেফহাল হতে না পারলে, কেউ সে বিষয়ে তার সম্মতি জ্ঞাপন করতে পারে না। ঘারার অনিশ্চয়তার সাথে সম্পর্কিত, ফলশ্রুতিতে চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত না হওয়ার ফলে বিতর্কের সম্ভাবনা থেকে যায়। ইসলামী আইনবিদগণ তাই চুক্তি

www.pathagar.com

সম্পাদনকালে সংশ্লিষ্ট পক্ষের চুক্তির বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার উপর জোর দিয়েছেন।

ঘারার ইয়াসির ঃ (নগণ্য অনিশ্চয়তা) ও ঘারার ফাহিশা (অত্যধিক অনিশ্চয়তা)-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সামাজিকভাবে অপরিহার্য কিছু নিশ্চয়তাকে ইসলামী আইনবিদগণ সাধারণভাবে অনুমোদনযোগ্য বলে মত পোষণ করেন। উপকারিতার নিরিখে এসব অনিশ্চয়তাকে মেনে নিতে হয়। তথাপি অনিশ্চয়তার সহনীয় মাত্রা সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার অভাবে ফকিহগণকে কিয়াস-এর উপর নির্ভর করে ঘারারকে বুঝতে হয়েছে। মহানবী কর্তৃক পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত কতিপয় ঘারার-এর উদাহরণ নিচে দেয়া হল ঃ

ক) পুকুরের মাছের পরিমাণ নির্বিশেষে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করা।

খ) প্রসব হওয়ার পূর্বেই কোন প্রাণীর বাচ্চা বিক্রয়।

গ) বাগানের ফল, কাঁচা অবস্থায় বিক্রয় করা।

ঘ) বিক্রেতাকে কোন পণ্য ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ না দিয়ে টস (toss)-এর মাধ্যমে বিক্রয় করা।

উপরে বর্ণিত নিষিদ্ধ চুক্তির উদাহরণ থেকে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, এই সবক্ষেত্রে স্বচ্ছতার প্রকট অভাব রয়েছে। এই ধরনের লেনদেন পুরোপুরি নিষিদ্ধ। কারণ ক্রেতা, ক্রয় করার সময় পণ্যের পরিমাণ, গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে পারে না। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে, মৌলিক উপাদান হিসেবে এই রকম দ্ব্যর্থবোধকতা অবৈধ। ঠিক এই কারণেই মহানবী (সাঃ) ব্যবসায়িক লেনদেনে ঘারারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যাতে এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর অন্যায় সুযোগ নিতে না পারে। প্রত্যেক ব্যবসায়িক লেনদেনে সততা ও সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইসলাম ঘারারকে হারাম ঘোষণা করেছে।

নিম্নে বর্ণিত প্রেক্ষাপটে ইসলামী আইন অনুযায়ী চুক্তির বৈধতা থাকে না।

ক) চুক্তির বিষয়বস্তুর প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে সংশয়।

খ) চুক্তির সময় বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব বর্তমান থাকলেও পরবর্তীতে বিলোপের বা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

গ) চুক্তির বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব বর্তমান এবং পরবর্তীতেও বর্তমান থাকবে কিন্তু ঐ বিষয়বস্তুর পরীক্ষা ও গুণাগুণ চুক্তি সম্পাদনকালে সঠিকভাবে নিরূপণ করা না গেলে।

ঘ) চুক্তির ভাষায় দ্ব্যর্থবোধকতা থাকলে যা বিষয়োক্ত পণ্যের বিক্রয় বা মূল্যের প্রকৃতিতে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে এরূপ ঘটনা ঘটে থাকে তখন কোন বিক্রেতা লুক্কায়িত ও অজ্ঞাত কোন পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করে এবং বিক্রেতা ইহা প্রকাশ করে না অথচ সেই অজ্ঞাত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

www.pathagar.com

অবৈধ চুক্তির প্রেক্ষাপট পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ হলো, বিক্রয় চুক্তির মধ্যে ঘারার এমন একটি উপাদান যেখানে ক্রেতা জানে না সে কি কিনছে অথবা বিক্রেতা জানে না সে কি বিক্রি করছে। এ হচ্ছে সম্ভাব্য কতিপয় পণ্য বিক্রয়, যার অস্তিত্ব ও প্রকৃতি অনিশ্চিত। এটা এমন ব্যবসায় যা জুয়ার সমতুল্য। তাই দেখা যাচ্ছে যে, ঘারারে রয়েছে চুক্তির দ্ব্যর্থবোধকতা, ফলে এক পক্ষের নিকট এটা গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না পূর্বাহ্নে এ সম্পর্কে জ্ঞাত কেউ হতে পারে। তার মানে, ঘারার চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অধিকার ও বাধ্যবাধকতা ইচ্ছাকৃতভাবে এক পক্ষ অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট করে রেখেছে যার ফলাফল অস্বাভাবিক মুনাফা অথবা লোকসান। ঘারার চুক্তির এই উপাদানের সাথে জুয়ার চুক্তির মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এটি লক্ষ্য করা যায় যে, ঘারার-এর ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক এবং এর কোন সংজ্ঞাই নেই। তথাপি সুদের ঘারার এর তাৎপর্য অনেক কম। ইসলামী ব্যবস্থায় সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও ঘারার বিশেষ অবস্থায় গ্রহণযোগ্য। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ রিবা চুক্তিতে নিশ্চয়তার উপাদান উপস্থিত, অপরদিকে বাস্তব জীবনে কোন নিশ্চয়তা নেই। সুদ এমন একটি পরিশোধ প্রক্রিয়া যা খুবই নিশ্চিত, অন্যদিকে পুঁজি ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে স্থির বা নিশ্চিত নয় এমন সুদের মধ্যে ঝুঁকি অনুপস্থিত, তাই তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অপরদিকে তথ্যের অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট সংশয় ও অনিশ্চয়তার জন্য ঘারার নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত হাদিস রয়েছে। ইসলামী আইনে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য তথ্য জানা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়। পর্যাপ্ত ও নিগূঢ় তথ্যের অনুপস্থিতি ঘারার-এর উৎসস্থল।

আইনবিদদের মাঝে ঘারার-এর সহনীয় মাত্রা সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। যেসব লেনদেন অত্যাবশ্যকীয়, সঠিক প্রয়োজন অথবা কাঙ্ক্ষিত কোন উদ্দেশ্যে অপরিহার্য সেসব লেনদেনকে ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়নি। উপযোগিতার বিবেচনায় সেসব লেনদেন গ্রহণীয়। ইসলামী আইনবিদদের গৃহীত মতানুযায়ী অপরিহার্য কোন কোন নিষিদ্ধ বস্তু বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য হতে পারে। তবে ঘারার কোন বিক্রয় চুক্তিকে ত্রুটিপূর্ণ করে না, কেননা কোন চুক্তিই অনিশ্চয়তা বা অস্বচ্ছতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। বস্তুত, ঘারার নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে এটি বিতর্ক, দ্বেষ ও অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার প্রবণতা সৃষ্টি করে। উৎসের দিক থেকে ঘারার শব্দটি ঘাররা থেকে উদ্গত যার অর্থ প্রতারণা করা। কোন লেনদেনে ঘারার-এর উপর আপত্তি উত্থাপিত হয় এই জন্য যে, চুক্তিতে স্বচ্ছতা প্রদানের আবশ্যকীয় উপাদানকে তা ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইসলামে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর পারস্পরিক সম্মতি ও সততা মৌলিক প্রত্যাশা এবং তা পূরণ করা জরুরী।

অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, বিষয়টির মাত্রার উপরই প্রধানতঃ ঘারার এর আলোচনা প্রাধান্য পাচ্ছে অর্থাৎ ঘারার-এর উপস্থিতি স্বল্প, মাঝারি অথবা অত্যধিক কি না। পরিব্যাপ্ত বর্তমান অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আইনবিদগণ ঘারার-এর মূল্যায়ন করেছেন। বহুল

www.pathagar.com

প্রচলিত প্রথা, নিজস্ব দূরদর্শিতা, জনস্বার্থের বিশ্লেষণ ও অপরিহার্যতা এই মূল্যায়নে ক্রিয়াশীল ছিল। মহানবী মুসলিমগণকে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করতেন। যে কোন ব্যবসায় অনিশ্চয়তার উপাদান নিহিত থাকে। তবে এটাকে ঘারার বলা যাবে না। ঘারার-এর মধ্যে ঝুঁকি রয়েছে; কিন্তু ঝুঁকির উপস্থিতিকে ঘারার হিসেবে চালানো যায় না। ঝুঁকি জীবনের অংশবিশেষ। আমরা ঝুঁকি হতে অব্যাহতি পেতে পারি না, কারণ জীবনের মধ্যে অসংখ্য অনিশ্চয়তা বর্তমান। সামাজিকভাবে অপরিহার্য অথচ অনিশ্চয়তামুক্ত নয়, এমন কায়কারবারকে ইসলামী আইনবিদগণ অনুমোদনযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। ঘারার তখনই নিষিদ্ধ হবে যখন সেখানে প্রতারণা, জুয়াচুরি অথবা কোন সজ্ঞান-ভুল প্রতিনিধিত্বের সম্ভাবনা থাকবে।

ঘারার ও বীমা চুক্তি

কোন পক্ষকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ব্যবসায়ে জুয়াচুরি ও প্রতারণার ব্যাপারে অনেক নিষেধাজ্ঞামূলক আয়াত কুরআনে বিদ্যমান। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (সাঃ) একজন শস্যবিক্রেতার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন বেচাকেনা হচ্ছে? লোকটি উত্তর দেয়ার পর রাসূল (সাঃ) তার শস্যের স্তূপের ভিতর হাত প্রবেশ করালে দেখতে পান শস্যগুলো স্তূপের ভেতরে ভেঁজা। এই অবস্থা দেখে তিনি বললেন, যে লোক অন্যকে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়। কথিত আছে, রাসূল (সাঃ) বলেন, কোন ব্যবসায়িক পণ্য সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে না জানিয়ে বিক্রি করা অথবা পণ্যের কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তা গোপন করা নিষিদ্ধ।

এতে বুঝা যায়, ইসলামে সব বাণিজ্যিক লেনদেনে পরিপূর্ণ ঘোষণা দেয়া অপরিহার্য। প্রথাগত বীমা চুক্তিতে সর্বোচ্চ সরল বিশ্বাসে সব ধরনের বীমা সম্পাদন করা হয়। কোন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বস্তুগত তথ্যের ঘোষণা দেয়া আবশ্যক। সুতরাং সমসাময়িক মুসলিম চিন্তাবিদগণ এই মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ঘারার ফাহিস বীমা চুক্তিতে অনুপস্থিত। যদিও ঘারার ইয়াসীর বীমা চুক্তিতে বর্তমান। কারণ বীমাগ্রহীতা ও বীমা কোম্পানীর কেউই তাদের স্ব স্ব অধিকার ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হতে পারে না; যতক্ষণ না বীমাকৃত ঘটনাটি না ঘটছে। তথাপি বীমা ও এর অপরিহার্যতা একে আধুনিক যুগে একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। তবে বীমাগ্রহীতা ও বীমা কোম্পানী উভয়ের নিকট সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ দ্ব্যর্থহীনভাবে জানা থাকা দরকার। এ কারণে বীমা চুক্তির সকল শর্তাদি দলিলে প্রকাশ করার জন্য শারীয়াহ্ বিশেষজ্ঞগণ অভিমত দিয়েছেন।

কতিপয় নিষিদ্ধ বস্তু আবশ্যকীয়তার নিরিখে অনুমোদনযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। বাস্তবতার নিরিখে বীমাকে ব্যষ্টির বোঝা অপসারণে সামষ্টিক অংশগ্রহণ বলা যেতে

www.pathagar.com

পারে। সমাজে কোন সদস্যের সমস্যাকে সামষ্টিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টিকে কোন মুসলিম অযথার্থ মনে করে না। সাধারণ বা জীবন বীমা উভয় ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এমন চুক্তি সম্পাদন করা হয়, যা কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনার ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা বিধান করে যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী নয়। ইসলাম সমাজকে পরিশ্রমের মাধ্যমে ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে জীবনের নানাবিধ সমস্যা উত্তরণে উৎসাহিত করে থাকে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূল (সাঃ) বলেন, যে কোন মুমিন ব্যক্তির পার্থিব মুসিবত দূর করবে, আল্লাহ পরকালে অনুরূপভাবে তার কষ্ট দূরীভূত করবেন। কোন দুঃস্থ লোকের অসুবিধা যে লাঘব করবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার কষ্ট অনুরূপভাবে প্রশমিত করবেন। (সহীহ মুসলিম) বীমার চুক্তিতে নগণ্য অনিশ্চয়তার (ঘারার) উপাদান নিহিত থাকার কথা নয়। যথাযথ সরল বিশ্বাস-এর নীতি বীমা চুক্তিতে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে বীমাকারী নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকে ঃ

ক) প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক সহায়তা বীমা গ্রহীতা কোন কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাবে।

খ) বীমা গ্রহীতার প্রাপ্য কিসের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হবে।

গ) পলিসির শর্ত ও সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ নির্ণয় নীতির ভিত্তিতে কখন এবং কিভাবে বীমা গ্রহীতা ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক সহায়তা পাবে।

বর্ণিত অবস্থাধীনে বীমা চুক্তিতে ঘারার-এর উপাদান নিহিত থাকার কারণগুলো অকার্যকর হয়ে যায়।

জুয়া (মাইসির)-এর অবৈধতা

মাইসির অর্থাৎ জুয়ার অর্থ ফাও কিছু লাভ করা। এ এমন এক আজগুবি পাওয়া যা পুরোপুরিভাবে ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। এখানে কোন পরিশ্রম করা লাগে না। যে ব্যবসায় পরিশ্রম ব্যতীত আচমকা প্রাপ্তি ঘটে ইসলাম তা অবৈধ ঘোষণা করেছে। দৈবের খেলাকেই কুরআনে জুয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। মাইসির শব্দটির উসর (আরবী) শব্দ থেকে উদ্গত যার অর্থ সহজ ও সুবিধাজনক। অর্থাৎ জুয়াড়ী কোন উদ্যম ছাড়াই সম্পদের পাহাড় গড়তে চায়।

বর্তমান সময়ের নানা রকম জুয়া খেলার সাথে ইসলামপূর্ব আরবের জুয়ার পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। ঘারার-এর ন্যায় দৈবের খেলা বা জুয়া ইসলামে কোনভাবেই স্বীকৃত নয়। জুয়া এমন এক লেনদেন যেখানে জুয়াড়ী বস্তুগত প্রাপ্তির আশা পোষণ করে। এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, বীমাতে মাইসির বা জুয়ার উপাদান নিহিত রয়েছে যেহেতু

www.pathagar.com

বীমা গ্রহীতা এই আশা পোষণ করেই বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ করে যে, ভবিষ্যতে সে বিশাল অংকের অর্থ পেয়ে যাবে। সুতরাং বীমা চুক্তিতে বেআইনী জুয়ার উপাদান সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ রয়েছে।

তবুও বিশেষজ্ঞগণ এই অভিযোগ খণ্ডন করার প্রয়াস চালিয়েছেন এই বলে যে, জুয়ায় আর্থিক প্রেরণা জোরদার হয় বিজয়ী হওয়ার প্রেরণা থেকে। বীমা গ্রহীতা যে অর্থ পায় তা জুয়ার অর্থের সাথে তুল্য নয়। যেহেতু সে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর, ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য এই অর্থ পেয়েছে। অন্যদিকে জুয়াড়ীর অস্বাভাবিক আর্থিক প্রাপ্তি হচ্ছে আচমকা প্রাপ্তির ভিত্তিতে। অধিকন্তু জুয়ায় একপক্ষ প্রতিপক্ষকে বৈষয়িক লাভের মাধ্যমে ঘায়েল করার চেষ্টায় থাকে, পক্ষান্তরে বীমা চুক্তিতে উভয় পক্ষই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অনাগত ভবিষ্যতে ক্ষতির বিপরীতে আর্থিক সহায়তার নিশ্চয়তা পায়।

বীমার লেনদেন বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় যেখানে বীমা কোম্পানী ও গ্রাহক উভয়ের সম্প্রীতির ভিত্তিতে এক পক্ষ ভবিষ্যত নিশ্চয়তা পাওয়ার আশায় অন্য পক্ষকে ট্রাস্ট বা আমানতকারী হিসেবে বিবেচনা করে। কুরআন বলে 'তোমরা আমানতকারীর আমানত ফিরিয়ে দাও' (৪.৫৮) এই আয়াতের আলোকে এই ধরনের লেনদেন ইসলামে অনুমোদনযোগ্য। কোন বীমা চুক্তি গ্রাহককে বস্তুগত দৈব প্রাপ্তির জন্য সুযোগ করে দেয় না; বরং এতে বীমাকারী গ্রাহককে অনাগত অপ্রত্যাশিত কোন ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য সাধ্যানুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করে। বীমাকারী ও গ্রহীতা উভয়েই এই ধরনের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। তাই বীমা চুক্তিতে কোন জুয়ার উপাদান নিহিত নেই বরং বীমা ব্যবস্থা পারস্পরিক সহযোগিতার তাৎপর্য বহন করে।

স্বপ্রণোদিত দান বা চাঁদার নীতিই বীমা চুক্তির ভিত্তি। সাধারণ বীমার গ্রাহক ভবিষ্যতে ঘটিতব্য কোন অপ্রত্যাশিত ক্ষতি বা ধ্বংসের বিপরীতে প্রিমিয়াম পরিশোধ করে। কোন ক্ষতি সংঘটিত না হলে, তার পরিশোধিত প্রিমিয়াম অন্যের ক্ষতি পূরণে চাঁদা হিসেবে বিবেচিত হবে। জীবন বীমার ক্ষেত্রে গ্রাহক তার নির্ভরশীলদের কল্যাণের জন্য সঞ্চয় হিসেবে প্রিমিয়াম পরিশাধ করে থাকে। এটা এমন এক উদ্যোগ যা তার নির্ভরশীলদের কল্যাণে নিবেদিত যারা ভবিষ্যতে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারতো। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা খুবই সংগত ও বাঞ্ছনীয় যেহেতু আল্লাহ তার সৃষ্টির জন্য সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ জীবন চান, চান না কোন ক্লেশকর জীবন। কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য জীরন চান, তিনি তোমাদেরকে কোন কষ্টে নিপতিত করতে চান না।

এই প্রসংগে মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, যে কেউ কারও আর্থিক অনটন দূর করার জন্য চেষ্টা করবে, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এই পার্থিব ও পরজগতে তার কষ্ট দূর করবেন। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের জন্য এ অতি উত্তম যে, তোমরা তোমাদের

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারীদের সম্পদশালী করে রেখে যাও, যাতে তারা দরিদ্র হয়ে অন্যের কাছে মুখাপেক্ষী না হয়। (হাদিসটি আবু হুরায়রা ও সাদ বিন সালিম আবির ওয়াক্কাস বর্ণনা করেছেন)

বলা হয়ে থাকে যে, জুয়াড়ী ও বীমাগ্রাহক উভয়েই নিজেদের পক্ষ থেকে সমানুপাতিক অর্থ না দিয়েই তারা বিপুল পরিমাণ অর্থ পেয়ে যায়। এ কথা সত্য যে, বীমার গ্রাহক পরিশোধিত প্রিমিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ পেয়ে যায়। তার অর্থ এই নয় যে, বীমা একটি পুরোদস্তুর জুয়ার চুক্তি, বীমার উদ্দেশ্য ঝুঁকি দূর করা, অথচ জুয়া নতুন ঝুঁকি সৃষ্টি করে। সতকর্তার সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করার নামই বীমা। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বীমা অত্যন্ত কার্যকর ও সাশ্রয়ী পন্থা। সংখ্যাধিক্যের আইন (law of large number) বীমায় নির্দেশক উপাদান হিসেবে কাজ করে। বীমার এই বৈশিষ্ট্য বোধগম্য হওয়া অত্যন্ত জরুরী। সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে বীমার মূল্য বা প্রিমিয়াম সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্ধারিত হয়। পরিসংখ্যানগত তথ্য ও মৃত্যু হারের উপর ভিত্তি করে গ্রাহক বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ করে থাকে। সাধারণ অভ্যাস বা খেয়াল খুশীর ভিত্তিতে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয় না।

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বীমার প্রধান কাজ হচ্ছে, অল্প সংখ্যকের আর্থিক ক্ষতিকে অনেকের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে বিতরণ করা। প্রত্যেক গ্রাহক, বীমায় তার উপস্থাপিত ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তার প্রিমিয়াম জমা রাখেন। সেই জমাকৃত অর্থ থেকে বীমাকারী বীমাকৃত ব্যক্তিকে পরিশোধ করে থাকে। জীবন বীমার একটি সাধারণ নীতি এই যে, সাধারণ অর্থ ভাণ্ডার সব পলিসি গ্রহীতা এই সংকল্প নিয়েই অর্থ জমা করে, যাতে অন্য কোন চাঁদা দাতার জীবনের কোন পর্যায়ে মৃত্যু হলে, তাদের সেই অবস্থায় সহায়তা করা যায়। জীবন বীমা এমন এক পদ্ধতি যেখানে কতিপয় মানুষ দলবদ্ধভাবে, দলের অন্য কোন সদস্যের মৃত্যুর কারণে তার নির্ভরশীলদেরকে সহায়তা করতে পারে।

জীবনের অনিশ্চয়তার দিকগুলো এমন যে, কেউই বলতে পারে না তার জীবনের ব্যাপ্তিকাল কতদিন। সুতরাং প্রত্যেক বোধসম্পন্ন ও বিবেকবান মানুষ তার তিরোধানের পর তার উপর নির্ভরশীলদের জন্য কিছু সঞ্চয় রেখে যেতে চায়। জীবন বীমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন কিছু সম্পদ আহরণ করে রাখা যা মৃত্যু পরবর্তী সময়ে হাতের নাগালে পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। জীবন বীমার পলিসি অবসরকালীন পেনশন ফান্ড বা অবসর ভাতা স্কীমের মতোই। ইসলামে যেখানে সুদমুক্ত অবসর ভাতা স্কীম অনুমোদন করে সেখানে বীমা স্কীমকে জুয়ার মতো মনে করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

চুক্তি আইনের সাধারণ নীতিমালার অধীনে বীমা চুক্তি পরিচালিত হয়; কিন্তু জুয়ার চুক্তি আইনের আওতায় প্রয়োগ করা যায় না। কোন আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ক্ষতির বিপরীতে কারো সুরক্ষা নিশ্চিত করাই বীমা পলিসির উদ্দেশ্য, যা পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। বিবেচনা, বীমাযোগ্য স্বার্থ, অটুট ও পরিপূর্ণ সৎ

www.pathagar.com

বিশ্বাসই হচ্ছে বীমা চুক্তির মৌল নীতিমালা। এই বুনিয়াদী ও অপরিহার্য উপাদানগুলোই বীমা চুক্তিকে জুয়া থেকে পৃথক করেছে। জয়ের লক্ষ্যই জুয়ার আর্থিক প্রেরণা। অথচ সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সুরক্ষার বাসনাই বীমার লক্ষ্য। বীমাগ্রহীতা বীমার যে অর্থ পায়, তা ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক সহায়তা। এটি আকস্মিক নয়। বীমায় আর্থিক লাভের কোন উপাদান থাকে না, পক্ষান্তরে জুয়ায় যা পাওয়া যায়, তা ফাও লাভ।

বীমা কোম্পানী বীমাগ্রহীতার অর্থ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার দায়ে দোষী কিনা, একটি অতীব প্রাসংগিক আলোচিত বিষয়। এটা তখনই ঘটে, যখন বীমাগ্রহীতা কোন দাবি না করার ফলে তার প্রিমিয়ামের অর্থ ফেরত পায় না। কতিপয় বিজ্ঞজনের মতে বীমার প্রিমিয়াম আসলে সেবার মূল্য বা প্রতিদান বৈ অন্য কিছু নয়। যা বীমা কোম্পানী সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বীমা চুক্তি হচ্ছে ক্ষতিপূরণের চুক্তি। তাই ক্ষতি না হলে, ক্ষতি পূরণের প্রশ্ন অবান্তব। সুতরাং পরিশোধিত প্রিমিয়ামকে সেবার পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য করা হয়। জুয়া হতে অর্জিত অর্থ হতে এটা সম্পূর্ণ পৃথক। একে অসংগত গ্রাস করা বুঝায় না। ক্যাসিনোর মালিক অথবা ঘোড়-দৌড়ের উদ্যোক্তারা জুয়াড়ি বা সমাজকে কোন সেবাই প্রদান করে না, অথচ বীমা কোম্পানী ব্যক্তিকে এবং সমাজকে অপরিহার্য সেবা প্রদান করে থাকে।

অধিকন্তু বীমাকে দৈব খেলা বলা যায় না। সম্ভাব্য ভবিষ্যতে দাবি মিটানোর জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার হয় তা পরিমাপ করার জন্য 'সংখ্যার আধিক্য' (law of large number) তত্ত্বের প্রয়োগ করা হয়। যানবাহন দুর্ঘটনা, অগ্নিজনিত ক্ষতি ইত্যাদির বাৎসরিক গড় নির্ণয় সম্ভব। জীবন বীমা গ্রহীতাদের দীর্ঘমেয়াদী দায় সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য এক্যাচুয়ারী বিজ্ঞান প্রয়োগ করা ব্যতীত বিকল্প নেই। অতীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে মৃত্যুহার ছক, রোগাক্রান্ত হওয়ার হার নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ যদিও কোন ব্যক্তির নিকট ক্ষতি অনিশ্চিত কিংবা অজ্ঞাত তবুও বীমা কোম্পানী এর পূর্বাভাস দিতে সক্ষম এবং সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ ভিত্তিতে বীমার প্রিমিয়াম নির্ণয় করতে হয়। তাই বীমা চুক্তি পুরোদস্তুর নিখাদ ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে। কোন অনিয়ম নির্ভর ঝুঁকি নিয়ে নয়। কোন দল বা গোষ্ঠী সামগ্রিকভাবে যে বাস্তব নিখাদ ঝুঁকির মুখোমুখি হয়, বীমা কোম্পানী সেই ক্ষতির পূর্বাভাস ও ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করতে সক্ষম। অনুমানভিত্তিক ঝুঁকি যথাযথভাবে পুর্বাভাসযোগ্য ও পরিমাণযোগ্য নয়। তাই এসব ঝুঁকির বীমা হয় না।

জুয়া ও বীমা চুক্তির মধ্যে অসংখ্য পার্থক্য বিদ্যমান। বীমাযোগ্য স্বার্থের প্রায়োগিক দিকটা বীমা চুক্তির মৌলিক উপাদান। এর অর্থ দাঁড়ায়, বীমাযোগ্য স্বার্থ ব্যতিরেকে বীমার কার্যকারিতা লোপ পায়। সাধারণতঃ বীমা গ্রহীতার, ক্ষতি সংগঠিত হওয়ার সময় তাতে বীমাযোগ্য স্বার্থ নিহিত থাকতে হবে। এই বীমাযোগ্যতাই, চুক্তিকে আইনের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখে। কিন্তু একজন জুয়াড়ির ক্ষেত্রে জুয়ায় বীমার অনুরূপ কোনো স্বার্থ নিহিত থাকার কথা নয়। জুয়াড়ি কোন সম্পদ রক্ষায় আগ্রহী নয়। সে নিরাপত্তার দিকটা

www.pathagar.com

বিবেচনায়ই আনে না কাজেই ঝুঁকি বহন করতে উৎসাহী হয় না। জুয়াড়ি সব সময় এই আশায় থাকে যে, কখন সে খেলায় জিতবে, জিতলেই মুনাফা। এই জেতার ফলে তার কোন পরিমাণ বা উদ্যম থাকে না। বীমা গ্রহীতা বা গ্রাহক এই মনে করে কোন পলিসি কেনে না যে, তার মোটরযান কোন দুর্ঘটনায় পতিত হবে, অথবা আগুন তার সম্পদ পুড়ে ছাই করে দেবে। সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তার সম্পদের সুরক্ষার জন্যই সে বীমা পলিসি ক্রয় করে থাকে।

একজন জুয়াড়ির প্রেষণা থাকে আর্থিক অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে বীমা গ্রহীতার প্রেষণা থাকে তার সম্পদের সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে আর্থিক নিশ্চয়তা পাবার আকাঙ্ক্ষা। সম্পদের বর্তমান, আসল ও নির্দিষ্ট ক্ষতি পোষাতে বীমার আওতাযুক্ত থাকা অপরিহার্য। জুয়াড়ি সর্বদাই লোকসানের ঝুঁকি বাড়াতে থাকে অথচ বীমায় ক্ষতির মাত্রা কমানোর পথ বাতলিয়ে দেয়। জুয়াড়ি অনাহুত ঝুঁকির ফিকিরে থাকে, যা পরিহার করা যায়। অপরদিকে, সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বীমা করা হোক বা না হোক, আগুন বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকবেই।

উপসংহারে বলা যায়, বীমা সমাজে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে থাকে, তাই এটা বাঞ্ছনীয়; কিন্তু জুয়া সমাজের জন্য উপকারীও নয়, কাঙ্খিতও নয়। উপকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে, এ কথা বলা যায় যে, বীমা চুক্তি জুয়া নয়।

জুয়ার ব্যাপারে কুরআনের নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত পরিষ্কার। কুরআনে আল্লাহ বলছেন, "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার দেবী ও ভাগ্য নির্ণয় করা ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং, তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (৫ঃ৯০)। কুরআনের নিষেধাজ্ঞা হতে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, বিশ্বাসীদের আল্লাহর স্মরণ ও প্রার্থনা থেকে বিরতকারী নেশাজাতীয় দ্রব্য ও জুয়া নিষিদ্ধ। এগুলো তাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসার জন্ম দেয়। বীমার উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি জুয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও বিপরীতমুখী। তাই আধুনিক ফকিহগণ বীমা চুক্তি, জুয়ার মতো নয়, এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন। পূর্বের আলোচনা থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ঘারার চুক্তিতে এর উপস্থিতি একটি চুক্তিকে মাইসর-এ পরিণত করতে পারে। ঘারার-এর উপাদান ব্যতিরেকে মাইসির হতে পারে না। যেহেতু, বীমায় ঘারার অনুপস্থিতি বা স্বল্প মাত্রায় ও উপস্থিত নেই, সেহেতু বীমা, জুয়া হওয়ার প্রশ্নই অবান্তর। আধুনিক যুগের অধিকাংশ ফেকাহবিদগণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি হিসেবে, বীমাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং অনুমোদনযোগ্য মনে করেন, অবশ্যই তা যদি শারীয়ার নির্ধারিত সীমারেখা লংঘিত না করে।

পারস্পরিক কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে আধুনিক মুসলিম ফকীহগণ সমবায় বা যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত বীমাকে শুধু অনুমোদনযোগ্যই মনে করেন না, তারা একে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু বীমা চুক্তিনামায় একথা যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার ভাষায়

৬—

www.pathagar.com

লিপিবদ্ধ করতে হবে যে, বীমা গ্রাহক তার পরিশোধিত প্রিমিয়াম, চাঁদা তথা দান হিসেবে দিচ্ছে যাতে সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি পোষাতে অন্যকে সহায়তা করা যায়। অধিকাংশ ইসলামী পণ্ডিত বীমার ধারণাকে বিরোধিতা করেননি; বরং তারা মনে করেন যে সহযোগিতা মূলক বীমা বৈধ। প্রথাগত বীমা পরিকল্পনা পদ্ধতিতে সংশোধন সাপেক্ষে বাণিজ্যিক বীমাও বৈধ। লক্ষ্যণীয় যে, কুরআন ও সুন্নায় কোথাও বীমার বিরুদ্ধে কোন পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা নেই।

মীরাস ও ওয়াসীয়ত সম্পর্কিত আইন

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, উত্তরাধিকারের আইনগুলো লিখে নাও এবং জনগণকে তা শিক্ষা দাও, কারণ এগুলো প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অর্ধেক। কৌশলগত ও যৌক্তিক উৎকর্ষতার জন্য ইসলামী উত্তরাধিকার আইন ব্যবস্থাকে আধুনিক লেখকগণ প্রশংসা করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তি। কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক রহিত বা পরিবর্তিত হয়নি এমন কিছু আরবীয় প্রথা ও প্রচলনও এই আইনের আওতাভুক্ত।

কুরআনই ইসলামী আইনের নীতিমালার প্রাথমিক ভিত। কুরআনে উত্তরাধিকার আইনের কতিপয় সাধারণ নিয়ম-নীতি বিবৃত হয়েছে। যেগুলোর অধিকাংশই ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। যাইহোক, কুরআনে কতিপয় সুনির্দিষ্ট ও পরিষ্কার বিধি-নিষেধ দেয়া হয়েছে। এগুলো প্রশ্নাতীতভাবে আক্ষরিক অর্থে পালন করতে হবে। নিম্নবর্ণিত নিয়মগুলো এর উদাহরণ ঃ

"তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে, তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ওয়াসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর (৪ঃ১২)। কুরআনের এই আয়াতটি এত সুস্পষ্ট যে, এর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও স্বামী যদি মনে করেন যে, সন্তানরা তাদের মাতার ভরণপোষণ চালিয়ে যাবে না অথবা তার প্রাপ্ত উত্তরাধিকারের অংশ নগণ্য, সেক্ষেত্রে স্বামী ইসলামী বিধান অনুযায়ী স্ত্রীকে পর্যাপ্ত উপহার হিসেবে প্রদান করতে পারে।

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী স্থাবর, অস্থাবর ও স্বঅর্জিত সম্পত্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পূর্ব পুরুষের জীবনাবসানের পরেই সরাসরি বা সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের অধিকার বলবৎ হয়। পূর্ব পুরুষের জীবদ্দশায় সে সম্পত্তির কোন হিসসাই উত্তরাধিকারীর জন্য বৈধ নয়। সুতরাং পিতার জীবদ্দশায় পুত্র তার পিতার সম্পত্তির অধিকার পায় না। শুধু পিতার মৃত্যুই উত্তরাধিকারের জন্ম দেয়। উত্তরাধিকার তিন প্রকার ঃ

ক) অংশীদার
খ) উদ্বৃত্তভোগী
(গ) দূর আত্মীয়

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশ যারা পাবে, তাদেরকে অংশীদার বলা হয়। অংশীদারদের নির্ধারিত অংশ বন্টনের পর অবশিষ্টাংশ যারা পাবেন তারাই উদ্বৃত্তভোগী অপরদিকে দূর আত্মীয়রা, অংশীদার বা উদ্বৃত্তভোগী কেউ নন। একজন মুসলিমের মৃত্যুতে তার সৎকার ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য দেনা মিটানোর পর তার অবশিষ্ট সম্পদ কুরআনে বর্ণিত উত্তরাধিকারীগণের মাঝে বণ্টিত হবে। যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ বা উদ্বৃত্তভোগী কেউ না থাকে, তখন সেই সম্পত্তি দূর আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টিত হবে। কুরআনে উল্লেখিত উত্তরাধিকারী ও উদ্বৃত্তভোগীদের কাউকেও পাওয়া গেলে দূর আত্মীয় উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে।

যদি কোন ওয়ারিশ না থাকে তাহলে সমুদয় সম্পত্তি উদ্বৃত্তভোগীরা পাবে। অংশীদার ও উদ্বৃত্তভোগী কাকেও পাওয়া না গেলে উত্তরাধিকারসূত্রে দূর আত্মীয়দের মাঝে তা বণ্টিত হবে। ওয়ারীশগণের বা উদ্বৃত্তভোগীদের কোন শ্রেণীর প্রজন্ম বর্তমান থাকা অবস্থায় কোন দূর আত্মীয় সম্পত্তির অধিকার পাবে না। নিকট উত্তরাধিকারদের সাথে দূর আত্মীয়দের এমন কেউ, যে মৃতের স্ত্রী বা স্বামী তাহলে সে ক্ষেত্রে সে উত্তরাধিকারসূত্রে তার সম্পত্তির মালিকানা পাবে। এভাবে কোন মুসলিম যদি তার স্ত্রী ও দূর আত্মীয় রেখে মারা যায় সেক্ষেত্রে স্ত্রী এক চতুর্থাংশ ও দূর আত্মীয় অবিশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ পাবে এবং যদি কোন মুসলিম মহিলা মারা যায় তাহলে তার স্বামী তার (মৃতের) সম্পত্তির অর্ধেক ও দূর আত্মীয় পাবে অপর অংশ।

উত্তরাধিকারের রীতি হলো নিকটতম আত্মীয় দূর আত্মীয়কে বাতিল করে দেয়া। এরূপে যদি জীবিত আত্মীয় পিতা এবং দাদা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পিতাই সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, দাদা হবে না। অপরদিকে জীবিত আত্মীয় যদি ছেলে এবং নাতি হয় সেক্ষেত্রে ছেলেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

ইসলামী উত্তরাধিকারী আইনে সম্পত্তি হস্তান্তরের পদ্ধতি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও বিস্তৃত। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞগণ এই পদ্ধতির যৌক্তিক শৌর্যের প্রশংসা করেছেন। তারা এও মনে করেন যে, এর চেয়ে অধিক সংগত ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই উত্তরাধিকার পদ্ধতি এর পরিপূর্ণতার জন্য প্রশংসিত হয়েছে এবং সাথে সাথে ব্যক্তি বিশেষ বা সমগোত্রীয় কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের উত্তরাধিকার সূত্রে ন্যস্ত সম্পদের প্রক্রিয়ায় শুধু সার্থক নয় বরং দূর আত্মীয়দের প্রতিযোগিতামূলক দাবি মিটাতে সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছে।

ওয়াসিয়াতের নীমিতালা

মৃত্যুর পর কোন সম্পত্তি কাকেও সম্প্রদান করাকে ওয়াসিয়াত বলা হয়। কারও মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি সম্প্রদান কার্যকর হয়। ওয়াসিয়াত হচ্ছে কোন মুসলিমের তার সম্পত্তি সম্প্রদান সম্পর্কে আইনগত ঘোষণার অভিব্যক্তি। সুস্থ ও সাবালক যে কোন মুসলিম

www.pathagar.com

লিখিত বা মৌখিকভাবে ওয়াসিয়াত করতে পারে। ওয়াসিয়াত কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী বৈধ। কিন্তু কোন মুসলিম তার সৎকার ও দেনা পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওয়াসিয়াত করতে পারে না।

অধিকন্তু তার (ওয়াসিয়াতকারীর) উত্তরাধিকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে এক-তৃতীয়াংশের অধিক উদ্বৃত্ত সম্পত্তির ওয়াসিয়াত কার্যকর হয় না। এক-তৃতীয়াংশের এই সীমারেখা কুরআনে উল্লেখ নেই। তবে রাসূলের একটি হাদিসের মাধ্যমে এর ভিত্তি পাওয়া যায়। কথিত আছে, একদা আবূ বকর (রাঃ) অসুস্থ হলে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে দেখতে যান। আবূ বকরের এক কন্যা ছাড়া কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। এখন তিনি নবীকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন যে, তার পুরো সম্পত্তিটা কারও নামে ওয়াসিয়াত করে যাবেন কিনা। উত্তরে নবী (সাঃ) বললেন, পুরো সম্পত্তি নয় এমনকি দুই তৃতীয়াংশও নয় কিংবা অর্ধেক নয়, শুধু এক তৃঁতীয়াংশ।

কোন মুসলিম তার উত্তরাধিকারীগণের কাকেও অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের সম্মতি ছাড়া কোন ওয়াসিয়াত করতে পারবে না। মীরাসী (উত্তরাধিকার) আইনের আওতায় তার উত্তরাধিকারীগণের মাঝে সম্পত্তির যে বন্টন নির্ধারিত হয়েছে, তাতে কোন রকম পরিবর্তন এড়াতে এই নীতিমালা নিবেদিত। এতে পরিলক্ষিত হয় যে, কোন মুসলিমের তার সম্পত্তি ওয়াসিয়াতের মাধ্যমে সম্প্রদান করার উপায় দুটিঃ যেমন–

ক) কার নামে ওয়াসিয়াত করা হবে।

খ) কোন্ নিরিখে সম্পত্তি ওয়াসিয়াত করবে।

ওয়ারিশগণের ক্ষেত্রে বিধিগত প্রত্যার্পণ শুধু সেখানেই প্রযোজ্য, যেখানে ওয়াসিয়াত আইনানুসারে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ছাড়িয়ে না যায় এবং ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য নয় এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওয়াসিয়ত কার্যকর হবে। অবশ্য উত্তরাধিকারীগণের সম্মতি সাপেক্ষে আইনানুগ তৃতীয়াংশের অধিক কারও পক্ষে ওয়াসিয়াত করা বৈধতা লাভ করে। ওয়াসিয়াতকারীর যদি কোন ওয়ারিশ না থাকে সেক্ষেত্রে তিনি অপরিচিত কাউকে তার সমুদয় সম্পত্তি সম্প্রদান করতে পারেন। যদি কখনো এমন হয় যে, একই ওয়াসিয়াতে কোন ওয়ারিশকে ও অ-ওয়ারিশকে সম্প্রদান করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে অন্য ওয়ারিশের সম্পত্তি না থাকলে ওয়াসিয়াতপ্রাপ্ত ওয়ারিশের ওয়াসিয়াত বাতিল হয়ে যাবে ও অ-ওয়ারিশ ব্যক্তির ওয়াসিয়াত বলবত থাকবে। অবশ্যই এক্ষেত্রে অ-ওয়ারিশ ওয়াসিয়াত এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

যদিও ইসলামী আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ প্রত্যার্পণ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ; কিন্তু হিবা বা দান-এর কোন সীমাবদ্ধতা নেই। কোন মুসলিম তার জীবদ্দশায় তার সমুদয় সম্পত্তি হিবা বা দান হিসেবে কাকেও সম্প্রদান করে যেতে পারে। কোন বিনিময়ের প্রত্যাশা ব্যতিরেকে ইসলামী আইন, হিবার মাধ্যমে সম্পদের স্বত্ব তাৎক্ষণিক

www.pathagar.com

ও পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করে স্থানান্তর করা যায়। দাতা বা দাতার পক্ষে অন্য কেউ, কোন বিনিময় গ্রহণ ছাড়া, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক সম্পদের স্বত্ব স্থানান্তর, হিবা আইনী দৃষ্টিভঙ্গিতে দাতার পক্ষে, দানের প্রস্তাব ও দান গ্রহীতার সম্পত্তিই হিবা হিসেবে গণ্য।

প্রস্তাবনা ও হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত হিবা কার্যকর হয় না। হিবা গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত হতে হবে। গ্রহণ সুস্পষ্টও হতে পারে আবার কোন নীরব সম্মতির মাধ্যমেও হতে পারে। যখন হিবাকারী তার দান-এর ঘোষণা দেন এবং দান গ্রহীতা তা গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করে, ঠিক তখনই সম্পদের স্বত্ব গ্রহীতার নিকট স্থানান্তর করতে হবে। এই ধরনের হস্তান্তর আসলও হতে পারে আবার প্রক্রিয়াধীনও হতে পারে। স্বত্ব হস্তান্তরের অর্থ এরূপ নয় যে, সম্পদ অবয়বগতভাবে দাতার অধিকারে এবং তা তাৎক্ষণিক গ্রহীতাকে দিয়ে দিতে হবে। আইনগত স্বত্বাধিকারই যথেষ্ট। যেখানে হিবার বিষয়বস্তু গ্রহীতার অধিকারে, সেখানে আনুষ্ঠানিক অবয়বগত স্বত্ব হস্তান্তরিত না হলেও, ঘোষণা গ্রহণ-এর মাধ্যমে হিবা সম্পন্ন হয়ে যায়।

প্রত্যেক সুস্থ ও সাবালক মুসলিম, পুরুষ কিংবা মহিলা হিবা করতে পারে, যদিনা সে কোন জোরজবরদস্তি বা প্রতারণার শিকার না হয়। মৃত্যুশয্যায় প্রদত্ত হিবা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ (মৃতের সৎকার ও দেনা পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত সম্পত্তি) অতিক্রম করতে পারবে না। অবশ্য এই হিবায় দাতার মৃত্যুর পর, তার উত্তরাধিকারীদের সম্মতি অপরিহার্য।

কোন ওয়ারিশকে প্রদত্ত হিবা বৈধ হবে না, দাতার মৃত্যুর পরও যদি অন্যান্য ওয়ারিশগণ এতে সম্মতি না দেয়। মৃত্যু শয্যায় প্রদত্ত হিবা বা দান দাতার মৃত্যুর পরেই কার্যকর হয়। এই ধরনের হিবায় সাধারণ হিবা কার্যকর হওয়ার অন্যান্য শর্তাবলী, যেমন– দাতা কর্তৃক গ্রহীতাকে সম্পত্তির অবয়বগত হস্তান্তর ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে।

নিয়ন্ত্রণযোগ্য যে কোন সম্পত্তির হিবা করা যায়। সুতরাং বীমা পলিসি হিবা করার একটি উপযুক্ত বিষয়। এক্ষেত্রে পলিসির অর্থ ভবিষ্যতে কোন সময় আদায়যোগ্য। একজন পলিসি হোল্ডার তার পলিসি সত্যায়নের মাধ্যমে অন্যকে হস্তান্তর করতে পারে।

ইসলামে হিবার মৌলিক চেতনা হচ্ছে, কোন দাতা তার সম্পত্তির স্বত্ব ও অধিকার পরিপূর্ণভাবে গ্রহীতাকে হস্তান্তর করবে। হিবার আক্ষরিক তাৎপর্য হচ্ছে, এমন কোন জিনিস অন্যকে দান করা, যা থেকে দাতা কোনরূপ সুবিধা ভোগ করতে পারতো, সুতরাং, বীমা পলিসি হস্তান্তর করা ও এর অর্থ ভবিষ্যতে উত্তোলিত হবে, এই শর্তই এটাকে হিবা হিসেবে অযথার্থ বলার জন্য যথেষ্ট নয়।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, বীমা পলিসি, মীরাস ও ওয়াসিয়াত-এর নীতির সাথে বিপরীতমুখী। এটা এই জন্য বলা হয়ে থাকে যে, বীমাকারীর মৃত্যুর পর তার মনোনীত

www.pathagar.com

প্রতিনিধি (নমিনীই) একমাত্র চূড়ান্তভাবে পলিসির অর্থ পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু ইসলামী আইন অনুসারে নমিনী মৃতের পক্ষে একজন ট্রাস্টি হিসেবে ওয়ারিশগণের পক্ষ হয়ে বীমার সুবিধাগুলো গ্রহণ করে থাকে এবং ইসলামী বীমা ও ওয়াসিয়াহ্ আইন অনুসারে উত্তরাধিকারীগণের মাঝে বিতরণ করে। জীবন বীমার চুক্তিতে নমিনী একচ্ছত্র সুবিধাভোগী নয়, সে একজন ট্রাস্টি মাত্র। নমিনী মৃত পলিসি হোল্ডারের আইনতঃ উত্তরাধিকারীগণের মধ্য থেকে কেউ হলে, সেক্ষেত্রে ঐ সুবিধার অংশবিশেষ তার প্রাপ্য। পাকিস্তানে ১৯৭৪ সালে মুসলিম ধর্ম বিষয়ক জাতীয় পরিষদ এই মর্মে একটি ফতোয়া জারি করেছেন। এই ফতোয়া অনুযায়ী, নমিনী একজন ট্রাস্টি হিসেবে বীমা পলিসির সুবিধা গ্রহণ করবে এবং ইসলামী বীমায় ও ওয়াসিয়াহ আইন অনুযায়ী, তা মৃত পলিসি হোল্ডারের ওয়ারিশগণের মাঝে বণ্টন করবে। পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট আমাতোল হাবি বনাম মুসাররত পারভীন (১৯৭৪ পিএলডি ১৮৫ এসসি) কেইসে করাচি হাই কোর্টের (কাসিম বনাম হানিফা) সিদ্ধান্তকে অকার্যকর ঘোষণা করে। সেই কেইসে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, বীমার ক্ষেত্রে নমিনী নিয়োগ, হিবা অথবা ওয়াসিয়াহ কোনটাই আওতায় পড়ে না। সুতরাং এই পলিসি কোন অবস্থাতেই আইনতঃ ওয়ারিশগণকে তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

পলিসির অর্থের নিরাপত্তা ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য পলিসি হোল্ডার যে কোন ব্যক্তিকে নমিনী নিয়োগ করতে পারে। এতে দোষের কিছু নেই। এই নমিনী নিয়োগ কোন হিবা বা দান নয়, এটা একটা ট্রাস্টি নিয়োগের মতোই, যেখানে ট্রাস্ট হিসেবে কোন ব্যক্তি পলিসির অর্থ উত্তোলন করে পলিসি হোল্ডারের সঠিক উত্তরাধিকারীগণের মাঝে বণ্টন করবে। বীমার নীতি অনুসারে নমিনীও পলিসির সুবিধার একটা আনুপাতিক অংশ প্রাপ্য হবেন। যদি পলিসি হোল্ডার নমিনীর পক্ষে কোনো ওয়াসিয়াত করে যান, তবে সে ক্ষেত্রে তিনি এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সুবিধা ভোগ করবেন আর যদি নমিনী আইনতঃ উত্তরাধিকারীগণের মধ্য থেকে কেউ হন, তাহলে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণের সম্পত্তি হওয়া সাপেক্ষে সুবিধার এক-তৃতীয়াংশ পাবেন।

অধিকাংশ মুসলিম দেশের আইনগুলো বৃটিশ প্রণীত অথবা ইংল্যান্ডের সাধারণ আইনের আদলে প্রণীত। তাই বিচারকগণ বীমা পলিসির নমিনীকে নিরংকুশ সুবিধাভোগী হিসেবে ব্যাখ্যা করার দিকে ঝুঁকে পড়েন। যাই হোক, মালয়েশিয়ায় বীমা আইন ১৯৯৬ অনুযায়ী নমিনী পলিসির অর্থের একজন গ্রহীতা মাত্র। গৃহীত অর্থ সে ইসলামী আইন অনুযায়ী বণ্টন করবে। মালয়েশিয়ার বীমা আইন-এর ধারা ১৬৭ তে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, মুসলিম পলিসি হোল্ডারের মৃত্যু, পলিসির প্রাপ্য অর্থ নমিনী একজন কার্যকারক হিসেবে গ্রহণ করবেন, শুধু সুবিধাভোগী হিসেবে নয়। নমিনীকে পরিশোধিত অর্থ মৃত পলিসি হোল্ডারের সম্পত্তির অংশ বিশেষ। বীমা কোম্পানী পলিসির অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে মৃত পলিসি হোল্ডারের দায়-দেনা থেকে অবমুক্ত থাকবে। অ-মুসলিমদের ক্ষেত্রে, পলিসির

www.pathagar.com

মালিক নমিনী নিয়োগ করতে পারে। এখানে নমিনী স্বামী-স্ত্রী বা সন্তানের পক্ষে ট্রাস্টি করতে পারে। মৃত্যুর পর পরিশোধযোগ্য পলিসির অর্থ পলিসির মালিকের সম্পদের অংশ ও দায়-দেনা পরিশোধে বিবেচ্য হবে না।

ইসলামী আইনের অধীনে, বীমা পলিসির ক্ষেত্রে অবশ্যই বীমাযোগ্য স্বার্থ নিহিত আছে কি না, তা শুধু মীরাস-এর নীতিমালার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। মালয়েশিয়ার তাকাফুল ব্যবস্থাপনায় ওয়াসিয়াহ ফরম পূর্ণ করার জন্য পলিসির প্রস্তাবককে বলা হয়। সেই ওয়াসিয়াহ ফরমে প্রস্তাবক নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির উল্লেখ করবে, পরবর্তীতে যার বীমাযোগ্য স্বার্থ নিহিত থাকবে। ইসলামী আইন অনুসারে, বীমা পলিসি-এর মালিকের সম্পত্তির অংশবিশেষ, সুতরাং পলিসির নমিনীকে অবশ্যই একজন কার্যকারক হিসেবে দেখতে হবে। নিরংকুশ সুবিধাভোগী হিসেবে নয়। অধিকন্তু মুসলিম মীরাস ও হিবার বিধান মোতাবেক পলিসির অর্থ ঋণ পরিশোধ সাপেক্ষে পলিসির মৃত মালিকের উত্তরাধিকারীগণের নিকট বন্টন করতে হবে। এক্ষেত্রে নমিনী যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে, তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। পলিসির মালিকের অন্যান্য সহায়-সম্পদ ও এর সাথে পলিসির অর্থ হিসাব গণ্য করতে হবে। পলিসি হোল্ডারের বকেয়া ঋণ থাকলে, তা আগে পরিশোধ করবে। তারপর পলিসির অর্থসহ অন্যান্য সম্পদ থেকে তার সৎকারের ব্যয় নির্বাহ করবে। তারপরেই কোন ওয়াসিয়াহ থাকলে, মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তা বন্টন করবে। এইসব দায়-দেনা ও খরচপত্র মিটানোর পর পলিসি হোল্ডারের অবশিষ্ট সম্পত্তি ইসলামী মিরাস আইনের আলোকে বন্টন করবে।

সনাতন বীমা ও ইসলামী আইন ঃ সনাতন বীমার ক্ষেত্রে শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিষয়ে আপত্তি করা হয় তা আমরা আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। প্রথমত আমরা ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস এবং ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহের দিকে আলোকপাত করেছি। ঐশী আইন মানুষের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। এছাড়া শরীয়া আইনে যা হারাম বা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলবার জন্য কঠোরভাবে হুকুম ও হুশিয়ারী ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব সুদের মত নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা না হলে বীমা ব্যবস্থা ইসলামী আদলে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সুদের বিকল্প হিসেবে ইসলামের যে সব পদ্ধতি অনুমোদিত হয়েছে তার মধ্যে মুদারাবা পদ্ধতিকে ইসলামী বীমায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য হিসেবে মনে করা হচ্ছে। বলা হয়েছে যে, বীমা গ্রহীতা বীমাকারীকে প্রিমিয়াম হিসেবে যে অর্থ প্রদান করবে তা বীমা কোম্পানী মুদারিব হিসেবে গ্রহণ করবে এবং লাভের অংশীদার হবে। এক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতাকে লাভের যে হিস্যা প্রদান করা হবে তা বীমা চুক্তির সময় স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে। মুদারিব কর্তৃক অর্থ বিনিয়োগ করার ফলে ক্ষতি হলে বীমা গ্রহীতাকে তা বহন করতে হবে এবং বীমা কোম্পানী সে ক্ষেত্রে কোন পারিশ্রমিক পাবে না। ফলে

www.pathagar.com

পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মুদারাবার বিপরীতে বীমা গ্রহীতা বীমা কোম্পানীকে ওয়াকিল হিসেবে নিয়োগ করেও বীমা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী হতে পারে। ওয়াকালা পদ্ধতিতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনা শরীয়ার দৃষ্টিকোণে গ্রহণযোগ্য বিধায় মুদারাবা বা ওয়াকালা পদ্ধতিতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনা করা হলে শরীয়াহ ভিত্তিক বীমা ব্যবস্থা প্রচলন করতে আর কোন আপত্তিকর বিষয় থাকবে না।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সনাতন বীমা ব্যবস্থাকে মুদারাবা ঘারার বা জুয়া হিসেবে চিহ্নিত করাটা মূলতঃ বীমা চুক্তির অন্তর্নিহিত বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। বীমা জুয়া নয় বরং এর বিপরীতে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক পদ্ধতি যা ঝুঁকির সৃষ্টি করে না কিন্তু ঝুঁকি নিরসনের সহায়ক। বীমা পদ্ধতি যদি পারস্পরিক সহযোগিতা নীতিমালা অনুসারে ঢেলে সাজানো হয় তবে তা শুধু বৈধ নয় বরং একটি মুবাহ কাজ হিসেবে গণ্য হতে পারে। কারণ বীমা অবশ্যই একটি জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা এবং সমাজের অগ্রগতির জন্য এটি অপরিহার্য। সমাজকল্যাণ মূলক কাজে যদি পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে করা হয় তবে তা একটি আমালুস সালেহ বা সৎকর্ম হিসেবে গণ্য হবে বলে আশা করা যায়। কেননা কুরআনে ভালো কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। যদিও বীমা জুয়া নয়, কিন্তু কিছু উপাদান সনাতন বীমা ব্যবস্থায় রয়েছে যার ফলে ঘারার সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থেকেই যায়। এ রকম ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় তায়ূন বা সহযোগিতাকে বীমার ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে এবং তাবাররু বা দান-এর মাধ্যমে তহবিল গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন বীমা গ্রহীতাকে যদি তাবাররুর পরিমাণ জানিয়ে দেয়া হয় এবং বলে দেয়া হয় এই তহবিল থেকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বীমা গ্রহীতাদের ক্ষতিপূরণ কিংবা আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে এবং উদ্বৃত্ত কিভাবে বীমাকারী ও বীমা গ্রহীতার মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। তাহলে বীমা চুক্তি অচ্ছতার জন্য ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে না। বস্তুত ইসলামী বীমার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর স্বচ্ছতা যা সনাতন বীমায় অনুপস্থিত। চুক্তিতে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা না থাকলে এক পক্ষ অপর পক্ষকে প্রতারণা করার বা ঠকানোর সুযোগ থাকে। এ কারণে শরীয়া আইনে অস্বচ্ছ চুক্তিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

সনাতন জীবন বীমা ব্যবস্থায় ইসলামের শরীয়া আইনের বিপরীত নমিনীকে বীমা অংকের পরিপূর্ণ মালিকানা দেবার সুযোগ আছে। অতএব শরীয়া বীমা চুক্তিতে মীরাসের আইন অনুসারে অন্যান্য সম্পদের ন্যায় বণ্টন ব্যবস্থার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। মীরাসের আইন হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা। ওয়ারিশগণ যেন তাদের ন্যায্য পাওনা বঞ্চিত না হয় সে জন্য বীমা চুক্তি পত্রে বিশেষ শর্ত আরোপের মাধ্যমে মীরাসের আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব। ওয়াসিয়াত ও বীমা হিসেবেও বীমার অংক নমিনিকে দেয়ার সুযোগ আছে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে শারীয়াতের শর্তসমূহ পালন করা জরুরী।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন বা শারীয়ার মূল লক্ষ্য মানব কল্যাণ। অতএব মানব কল্যাণে নিবেদিত কোন পদ্ধতি বা ব্যবস্থা শারীয়াহ বিরোধী হতে পারে না। আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে যদি কোন কিছু আমাদের নিকট অস্পষ্ট হয়, তবে অবশ্যই আমাদের ইসলামী আইনের উৎসসমূহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এবং অবশ্যই ইজতিহাদের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে আমাদের উপনীত হতে হবে। বীমা বিশেষজ্ঞদের শরীয়াহ না জানার কারণে এবং শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের বীমা সম্পর্কে অস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ ধারণা না থাকার কারণে অনেক জটিলতা হচ্ছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের সাথে শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সকল জটিলতার নিরসন সম্ভব এবং সেই সাথেই ইসলামী আইনের মৌলিক বিষয় ও ব্যবস্থাতে প্রয়োগসমূহ কিভাবে বীমা ব্যবস্থাতে প্রয়োগ করা যায় তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন।

---

www.pathagar.com

পাঁচ.

ইসলামী বীমার ভিত্তি, বিকাশ ও ইজতিহাদের গুরুত্ব

পারস্পরিক সহযোগিতার প্রথা ও অনুশীলন

বীমা একটি চুক্তি যা বীমাগ্রহীতার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। কারণ প্রয়োজনীয় সময়ে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। বীমাকারকের অবস্থান হলো মধ্যস্থতাকারীর মতো, যে বীমাগ্রহীতার নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে। বর্তমানে যেভাবে বীমা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে মহানবীর (সাঃ)-এর আমলে সেরকম কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। তবে একই ধরনের ব্যবস্থা মহানবী (সাঃ)-এর আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। শরিয়াহ নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক না হলে প্রথাসমূহ ইসলামে গ্রহণযোগ্য। অতএব প্রাচীন প্রথার অনুসরণে একালে ইসলামী বীমা ব্যবস্থার প্রচলন করা সম্ভব হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, বীমার ধারণাটি প্রধানত কোন দুর্যোগকালীন সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহায়তার বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হতো। যেমন, একটি গোত্রের কোন সদস্যের অপকর্মের জন্য অন্য গোত্রের সদস্যদের দ্বারা কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা। ইসলামের আবির্ভাবের আগে, আকিলা ছিল একটি সুপরিচিত প্রথা, যেখানে কোন পরিবার বা গোত্র সম্মিলিতভাবে উক্ত পরিবার বা গোত্রের কোন সদস্যের অনিচ্ছাকৃত খুনের মুক্তিপণ হিসেবে সম্পদ একত্রিত করতো। তারা প্রতিশোধের হাত থেকে দায়ী ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য নিহত ব্যক্তির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে "দিয়াত" (রক্তমূল্য) প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করতো। মহানবী মোহাম্মদের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির আগে মক্কার বণিকদের মধ্যে আরেকটি প্রথা প্রচলিত ছিল, যেখানে বাণিজ্যিক সফরের সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতার জন্য বণিকরা একটি যৌথ তহবিল গঠন করতো।

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পরপরই এক ধরনের সামাজিক বীমার প্রবর্তন করেন। মদিনা সনদে বলা হয় যে, অভাবগ্রস্ত, অসুস্থ ও দরিদ্রদের প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমাজ একটি সম্মিলিত তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেবে। মদিনা সংবিধানে আরো বলা হয়, মোহাজিরগণ তাদের ওয়াদা পূরণের জন্য দায়ী

www.pathagar.com

থাকবে, তারা তাদের রক্তমূল্য প্রদান করবে এবং মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার আমলে আকিলা পদ্ধতি প্রয়োগ আরো উন্নত হয়। তিনি নির্দেশ দেন যে, মুজাহিদিনের দিওয়ান কায়েম করা হবে এবং দিওয়ানে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে তারা রক্তমূল্য পরিশোধে আন্তরিকভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা করবে। এভাবে এই আমলে বীমাব্যবস্থার উপাদানের প্রতিফলন দেখা যায়। মুসলমানদের সমাজে বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও সমঝোতার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সম্ভাব্য যেকোন দুর্যোগে গোত্র বা পরিবারের সদস্যরা উক্ত পরিবার বা গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের নিকট থেকে সহযোগিতা পেত।

আরব উপদ্বীপের গোত্রীয় সদস্যরা চৌদ্দশত বছর আগে পারস্পরিক সহযোগিতার অনুশীলন করতো। এসব ব্যবস্থা নবী মোহাম্মদ (সাঃ) গ্রহণ করেন এবং বৈধতা প্রদান করেন এবং ইসলামী সমাজে তা আত্মীকরণ করে নেন। ষষ্ঠ শতকে প্রচলিত বীমা প্রকৃতপক্ষে প্রাক-ইসলামী আমলের গোত্রীয় পারস্পরিক সহযোগিতার বিবর্তিত রূপ। প্রাক-ইসলামী ইতিহাসের অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে পরিবার, গোত্র বা আত্মীয়-স্বজনরা স্বেচ্ছায় বা কৃতজ্ঞতাবশে অভাবীদের সহযোগিতার জন্য তাদের সম্পদরাজি একত্রিত করতো। প্রাচীন আরবে সহযোগিতার যেসব পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নরূপ ঃ

ক) আকিলা নামক গ্রুপব্যবস্থার মাধ্যমে নিহত নির্দোষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের পরিবারকে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হতো।

খ) মক্কার বণিকরা বাণিজ্যিক সফরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ভোগের কবলে পতিতদের সহায়তা দেয়ার জন্য তহবিল গঠন করতো। মক্কায় মহানবী (সাঃ) বাণিজ্যের সময়ে এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটে, উক্ত ঘটনায় কয়েকজন ছাড়া পুরো বাণিজ্যিক কাফেলাটিই মরুভূমিতে হারিয়ে যায়। চাঁদা প্রদানকারীদের ব্যবস্থাপনা বোর্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত উট ও ঘোড়ার মূল্যসহ ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারসমূহকে বাণিজ্যিক মালামালের মূল্য প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। সেসময় খাদিজার (রাঃ) মূলধনে বাণিজ্যরত নবী মোহাম্মদ (সাঃ)ও লাভ থেকে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করেন।

গ) "দামন খাতর আল-তারিক" নামে অভিহিত নিরাপত্তার বিধান ছিল বাণিজ্যিক রুটে সফরকালে কোন ক্ষতির শিকার হওয়া ব্যবসায়ীদের জন্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে কোন বিশেষ রুটের প্রতি উৎসাহ দেখিয়ে বলে, এটা নিরাপদ এবং যেকোন ক্ষতি থেকে সে নিশ্চয়তা দিচ্ছে, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন ক্ষতি সংগঠিত হলে তার জন্য সে দায়ী থাকতো।

ঘ) ইসলামী আমলের দ্বিতীয় শতকের প্রথমদিকে সাধারণভাবে গৃহীত আরো সুনির্দিষ্ট ইসলামী বীমার প্রাচীনতম নমুনাটির সন্ধান পাওয়া যায়। সেসময়ে আরব

www.pathagar.com

মুসলমানরা বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশে তাদের দীর্ঘ বাণিজ্যিক সফরের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব সফরের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দস্যুতা, পথ হারিয়ে ফেলা ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে পড়তো। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মূলনীতি প্রয়োগ করে উক্ত ব্যবসায়ীগণ একটি সাধারণ তহবিল গঠন করতেন, তাদের মধ্যকার কেউ যেকোন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই তহবিল থেকে তা পুষিয়ে দেয়া হতো।

তাকাফুলের ভিত্তি

সনাতন বীমাব্যবস্থার ইসলামী বিকল্প তাকাফুল নামে পরিচিত। এটা "তা'য়ুন" (পারস্পরিক সহযোগিতা) ধারণার ভিত্তিতে প্রবর্তিত। এই ব্যবস্থার আওতায়, সমাজের সদস্যরা স্বেচ্ছায় সদস্যদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের একটি অভিন্ন লক্ষ্যে চাঁদা প্রদান করতে সম্মত হয়। এই ব্যবস্থাটি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা, নিরাপত্তা ও সংহতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

তা'য়ুন বা পারস্পরিক সহযোগিতা অনেক ইসলামী ব্যবস্থার ভিত্তি। ইসলামী নীতিমালার শিক্ষা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার অনেক ধরনের পন্থা বাতলে দেয়। ষষ্ঠ শতকে প্রচলিত তাকাফুল প্রকৃতপক্ষে প্রাক-ইসলামী সময়কাল থেকে বিদ্যমান পারস্পরিক সহযোগিতার একটি গোত্রীয় ব্যবস্থা। প্রাক-ইসলামী ইতিহাসে অনেক উদাহরণই আছে, যেখানে পরিবার, গোত্র বা নিকট আত্মীয়গণ স্বেচ্ছায় এবং কৃতজ্ঞতাবশত অভাবগ্রস্তকে সহায়তার জন্য তাদের সম্পদরাজি একত্রিত করেছে। এসব ব্যবস্থাকে মহানবী মোহাম্মদ (সাঃ) বৈধতা দিয়েছেন এবং প্রাথমিক ইসলামী রাষ্ট্রের বিধান হিসেবে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। গোত্রীয় সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা কোন বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল না, বরং তা ছিল লাভ বা সুবিধা গ্রহণের বিষয় থেকে মুক্ত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটা বিবর্তিত হয়েছিল, যাতে কোন ব্যক্তির বোঝা লাঘবের জন্য তার সাথী সহযাত্রী বা গোত্রের সদস্যরা এগিয়ে আসতো।

বর্তমানকালে, তাকাফুলের প্রয়োগ পদ্ধতি কুরআনের তিনটি নীতি তথা পারস্পরিক নিরাপত্তা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক দায়বদ্ধতা থেকে উদ্ভূত। কুরআনে অনেকস্থানেই ক্ষুধা ও ভীতি থেকে নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।" (কোরাইশ: ৪) মহানবী (সাঃ) বলেন, "ঈমানদার সেই যে মানুষকে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করে ও তত্ত্বাবধান করে।" (ইবনে মাজাহ) মহানবী (সাঃ) আরো বলেন, "কোন ব্যক্তি মুসলমান নয়, যে নিজে পেটপুরে খেয়ে ঘুমালো আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধায় কাতর হলো।" সহযোগিতার ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে, "সৎকর্ম

www.pathagar.com

ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।" (মায়েদা ৫:২)

মহানবীর সুন্নাহ হতেও আমরা সহযোগিতার নীতিমালা পেয়ে থাকি। মহানবী (সাঃ) বলেন, "একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তাকে নির্যাতন করবে না কিংবা ক্ষতি করবে না; এবং সে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন, যে তার ভাইয়ের কষ্ট দূর করে দেবে, আল্লাহ হাশরের ময়দানে তার কষ্ট দূর করে দেবেন।" তিনি আরো বলেন,

> "কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইকে নিজের মতো ভাল না বাসবে, ততক্ষণ সে সত্যাশ্রয়ী হিসেবে পরিগণিত হবে না।" (বুখারী)
>
> "কেউ যতক্ষণ অন্যের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবে না, আল্লাহও তার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবে না।" (মুত্তাফাক আলাইহি)
>
> "তোমাদের প্রত্যেকেরই দায়দায়িত্ব আছে এবং তোমাদের প্রত্যেককে তোমাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (মুত্তাফাক আলাইহি)

বাস্তবিকই, একে অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধের অনুভূতি ইসলামী সমাজের সংহতির মৌলিক ভিত্তি। আমাদের দায়দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের কর্তব্য সহযোগিতা করা এবং আমাদের উচিত সমাজের সদস্যদের সম্পদ ও জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করা। ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় যৌথ তহবিলে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। এটা করার জন্য, তাকাফুল পরিচালনা প্রতিষ্ঠানের উচিত তাকাফুল কর্মসূচি পরিচালনার জন্য যথার্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া প্রতি সদস্যকে সুষম ও ন্যায্য পাওনা প্রদানের জন্য সকল অংশগ্রহণকারীর বিবরণ সংরক্ষণ, পরিসংখ্যানগত তথ্য সংরক্ষণ ও সকল সদস্যদের যৌক্তিক চাঁদা নির্ধারণ প্রয়োজন। তাকাফুল প্রতিষ্ঠান প্রাপ্তচাঁদা হালাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করবে এবং তাবাররুক তহবিলের উদ্বৃত্তের পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং অংশগ্রহণকারী ও পরিচালনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীর দাবি পূরণ করবে।

এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সদস্যদের কল্যাণের লক্ষ্যে এসব কাজ করার জন্য সবচেয়ে নিষ্ঠাবান, কর্মক্ষম ও পেশাদারিত্বের মনোভাব কাজ করা দরকার। তাকাফুল প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য চাঁদার একটি যৌক্তিক হার অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এটাও ঠিক যে, আত্মত্যাগী, পেশাদার, উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ও খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা ছাড়া তাকাফুল কর্মসূচি সাংগঠনিক বা কাঠামোগতভাবে সফলতার সাথে সম্পন্ন করা যায় না। তাই, তাকাফুল কর্মসূচি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ইসলামের নীতিমালা অনুসারে যে কোন ব্যক্তি যেকোন কাজ ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য একজন এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেন। এজেন্ট চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী সম্মানী পাওয়ার অধিকার রাখেন। তাকাফুল সদস্যদের জন্য টেকনিক্যাল ও প্রশাসনিক কাজ নিজেদের পক্ষে চালিয়ে নেয়া কঠিন হওয়ায় তাকাফুল কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কোন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা খুবই ন্যায়সংগত ও যৌক্তিক। কারণ স্কিমটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সদস্যদের তাকাফুল তহবিল পরিচালনার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা নাও থাকতে পারে। আন্ডাররাইটিং, মার্কেটিং, দাবি ব্যবস্থাপনা, আইনগত বিষয়াবলী, হিসাব রক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তি এবং আরো বহুমাত্রিক অনেক দায়িত্ব পালনের জন্য দক্ষতার প্রয়োজন। তাই এটা যৌক্তিক যে, তাকাফুল স্কিমের অংশগ্রহণকারীরা তাদের পক্ষ থেকে ইসলামের পারস্পরিক নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিমালার আলোকে তাকাফুল কর্মসূচি পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছায় কোন এজেন্টকে দায়িত্ব প্রদান করবে। এ কারণে একটি তাকাফুল প্রতিষ্ঠান মূলত একজন এজেন্ট। তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের উচিত হবে সকল অংশগ্রহণকারীর পক্ষ থেকে তাকাফুল তহবিলের জিম্মাদারিত্ব বজায় রেখে সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা। তাকাফুল পরিচালকগণ জিম্মাদার হিসেবে কাজ করবে এবং অবশ্যই তাদের সেবার জন্য পারিতোষিক পাবে।

ইসলামী বীমার প্রয়োজন

ইসলামী বীমা বা তাকাফুল হলো অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যের পারস্পরিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার একটি ধারণা। উম্মাহ'র কল্যাণে পারস্পরিক সহযোগিতার যে ভিত্তি আল্লাহ মুসলমানদের নিকট থেকে কামনা করেন, এটা তাই। দুর্ভাগ্যপীড়িত ও অভাবগ্রস্তদের আর্থিক সহযোগিতার সামাজিক বাধ্যবাধকতাও পূরণ করে এটা। তাকাফুল ব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি সেবা। এটা মূলত একটি কল্যাণমূলক স্কিম। ইসলামী শরিয়াহ'র আলোকে সাম্য, ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি নতুন আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি কিভাবে কাজ করতে পারে তাকাফুল হলো তার একটি উদাহরণ।

প্রয়োজনের সময়ে আর্থিক সহযোগিতার নিশ্চিতকরণ এবং দুর্ঘটনাজনিত কারণে সম্পদের ক্ষতি পূরণের মাধ্যমে তাকাফুল জনস্বার্থমূলক কাজ করে এবং তাই মুসলিম সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পারিবারিক তাকাফুল ব্যবস্থা পরিবারকেন্দ্রিক মূলধন সৃষ্টিতে কাজ করতে পারে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে গঠিত সম্মিলিত তহবিল সামাজিক কল্যাণকর প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যায় এবং সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। সাধারণ তাকাফুল স্কিমগুলো ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে পারে। তাকাফুল কর্মপদ্ধতি বিনিয়োগের ধরন হিসেবে মুদারাবাকে উৎসাহিত করতে পারে এবং সারা বিশ্বের মুসলমান সমাজের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

www.pathagar.com

পশ্চিমা অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন তাকাফুল হলো একটি অভিনব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এটা পুরোপুরি সত্য নয়। এটা মূলত একটা আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি, যা শরিয়াহ নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং যেখানে বস্তুগত লাভের চেয়ে মানবকল্যাণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুগত বিষয়াবলীর চেয়ে নৈতিক, মূল্যবোধভিত্তিক ও মানবিক বিষয়ের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। তাকাফুল এমন এক পদ্ধতি যেখানে প্রয়োজনের সময়ে পারস্পরিক সহায়তার জন্য অর্থ প্রদানে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। এই পদ্ধতি সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা নিশ্চিত করে।

লাভ বণ্টনের নীতির প্রয়োগের কারণে সমাজের সদস্যরা ইসলামী বীমা থেকে তুলনামূলক কম খরচে সুবিধা পেয়ে থাকে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে, সনাতন বীমা ব্যবস্থার চেয়ে এতে বীমার সুবিধা পাওয়ার খরচ অনেক কম। কারণ উদ্বৃত্তের অংশ পলিসিহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টিত হয়। উদ্বৃত্ত অর্থ পলিসিহোল্ডারগণের মধ্যে বণ্টিত হওয়ায় বীমার খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয়। যেহেতু ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো মূলত পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। সেহেতু তাদের পরিচালনা খরচ তুলনামূলক কম হওয়াই স্বাভাবিক।

অধিকন্তু, লক্ষ্য করা গেছে, অবিবেচক বীমাগ্রহীতার ইচ্ছাকৃত ক্ষতি কিংবা বাড়িয়ে তোলা দাবি মেটাতে হয় সনাতন বীমা কোম্পানীগুলোকে। যখনই জানাজানি হয়ে যায় যে, ঘটনার সাথে বীমা কোম্পানী সম্পৃক্ত, তখন জরিপকারী, মেরামতকারী, চিকিৎসকগণের মধ্যে বিষয়টি বাড়িয়ে দেখানোর প্রবণতা দেখা যায়। এটা সাধারণভাবে করা হয় অসাধু বীমাগ্রহীতার সাথে আঁতাতের মাধ্যমে। এটা আশা করা যায়, ইসলামী বীমাব্যবস্থায় বাড়িয়ে দেখানো কিংবা ইচ্ছাকৃত ক্ষতি তুলনামূলক কম হবে। খোদাভীরু মানুষের উচ্চ নৈতিকতা থাকে এবং তারা সৎ জীবনযাপন করতে চায়। অতএব সাধারণ তাকাফুল ব্যবসায় মিথ্যা দাবি বা অতিরিক্ত দাবি পূরণের বিষয়টি অনেক কম হবে বলে আশা করা যায়।

তাকাফুল শুধুমাত্র ব্যক্তিগত, পরিবার এবং সংগঠনের জন্যই নয়, বরং তা পুঁজিবাজারের অর্থনৈতিক প্রয়োজনও পূরণ করতে পারে। ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে তাকাফুল উম্মাহ'র মূলধন ও সম্পদের প্রবাহের কার্যকারিতা আরো বাড়াতে পারে। তাকাফুল ও পুনঃতাকাফুল বাজারের সম্প্রসারণ মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

তাকাফুল ইসলামী বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের পরিপূরক ও সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন তাকাফুল ইসলামী সমাজে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা দূরীকরণে অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গত কয়েক বছরে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলে বীমা ক্রমবর্ধমান হারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। দরিদ্র ও দারিদ্র্য সীমারেখার সামান্য উপরে অবস্থানকারীদের জন্য আয়

www.pathagar.com

হ্রাস কিংবা ব্যয় বৃদ্ধি দরিদ্রদের জীবন মানে ধ্বংসকারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অনেকেই নিয়মিতভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে, যার প্রতিকারের উপায় জানা নেই। বাংলাদেশসহ অনেক দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় হিসেবে ক্ষুদ্র-অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ প্রদান করছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা উচ্চহারে সুদ ধার্য করছে। সঞ্চয়ের সামর্থ্য কম থাকায় এবং ঋণকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করতে হওয়ায় দরিদ্র ঋণগ্রহীতারা এতে খুব কমই উপকৃত হচ্ছে। অধিকন্তু, অসুস্থতা, উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটির মৃত্যু কিংবা অক্ষমতায় ঋণ পরিশোধ হয়ে পড়ে খুবই কঠিন। এমতাবস্থায়, মৃত্যু, রোগ এবং তাদের ক্ষুদ্র সম্পদ রক্ষায় দরিদ্রদের দারিদ্র্য লাঘবের কার্যকর মাধ্যম হতে পারে তাকাফুল বা ইসলামী বীমা। তাই, ক্ষুদ্র-তাকাফুল স্কিম উন্নয়নশীল ইসলামী দেশগুলোতে বিকশিত হতে পারে।

ইসলামী বীমার চুক্তিগত ভিত্তি

একটি ইসলামী বীমা চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীদের চুক্তিগত সম্পর্ক কয়েক রকম হতে পারে। মূল চুক্তিটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দান (তাবাররু) সমঝোতার উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও আছে ওয়াকালা চুক্তি, মুদারাবা চুক্তি, মুশারাকা চুক্তি। তাকাফুলের মডেলগুলোতে তাবাররুর ধারণা মৌলিক ভিত্তি। সকল মডেলেই দানকে কেন্দ্র করেই তহবিলের পরিচালনা হয়ে থাকে। পার্থক্য প্রতীয়মান হয় আইনগত বিষয়ের চেয়ে পরিচালনাগত ব্যাপারে। ওয়াকালা বা মুদারাবা চুক্তি অংশগ্রহণকারীদের তহবিল গঠনের ভিত্তি নয়। তাকাফুল কার্যক্রমের আইনগত বিষয়টি দান ও সহযোগিতার ধারণার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ইসলামী বীমা কোম্পানি অংশগ্রহণকারী বা পলিসিহোল্ডারদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংহতি অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এটা অর্জিত হয়ে থাকে দান হিসেবে অংশগ্রহণকারীর প্রদত্ত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে। দানকৃত অর্থের মালিক অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। সনাতন বীমা কোম্পানীগুলোতে বিদ্যমান নীতির মতো তা শেয়ারহোল্ডারদের সাথে একীভূত থাকে না। অংশগ্রহণকারীগণ চাঁদার অর্থ চুক্তির শর্তাবলীর আলোকে এজেন্সির ভিত্তিতে কিংবা মুদারাবা ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য পরিচালনা প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃত্ব দেবে। ওয়াকালা ব্যবস্থায় প্রদত্ত অর্থের পুরোটাই তাবাররুর হিসেবে প্রদান করা হয় এবং মুদারাবা ধারণায় চাঁদার একটি অংশ বীমা পুল গঠনের জন্য নির্ধারিত হয়। মুদারাবা ধারণায় তাবাররুর অর্থ প্রদানের পর বাকিটুকু অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের হয়ে থাকে এবং তা মুদারাবা ভিত্তিতে কোম্পানী বিনিয়োগ করে থাকে। তাবাররুর অর্থও মুদারাবা বা মুশারাকা ভিত্তিতে কোম্পানী বিনিয়োগ করে থাকে। শরিয়াহ বিশেষজ্ঞগণ এব্যাপারে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন প্রায়ই উত্থাপন করেন। পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য সৃষ্ট তাবারু তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ কী অংশগ্রহণকারীরা পুনরায় গ্রহণ করতে পারেন?

www.pathagar.com

এই প্রশ্নের সঠিক জবাবের জন্য আমরা ইসলামী বীমা চুক্তির ভিত্তির দিকে তাকাবো। ইসলামী বীমার মৌলিক ভিত্তি হলো সহযোগিতা (তা'য়ুন) এবং দানের ভিত্তিতে তহবিল সৃষ্টি করা হয় পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য। তাই, দান হয়ে পড়ে সীমিত দান (কোয়ালিফাইড ডোনেশন) অর্থাৎ চাঁদার পুরো পরিমাণই কোম্পানীর দাবি পূরণ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য খরচ নির্বাহের জন্য ব্যয় হয়ে থাকে। কোম্পানীর সকল পরিচালনা ব্যয়ভার পূরণ এবং সকল দাবি নিষ্পত্তির পরও যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তা আর দান এর জন্য থাকে না। শরিয়াহ দানকে শর্তের অধীনে কিংবা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কিংবা নির্দিষ্ট ঘটনায় সীমিত রাখার বিষয়টি অনুমোদন করে। বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সাঃ) রাজা নাজ্জাসির কাছে তার জীবিত থাকার শর্তে উপহার পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল তিনি মারা গেছেন এবং উপহার নবীজির কাছে ফেরত আসলো এবং তিনি তা তার স্ত্রীদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

ইসলামী জীবন বীমায় অংশগ্রহণকারীদের দানের আশু সুবিধা পায় উত্তরাধিকারীগণ তথা একে অপরকে সাহায্য করার জন্য তারা যাদের মনোনীত করেন। অবশ্য, সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন বিনিয়োগ মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যকার সম্পর্ক হলো অংশীদারিত্বের, যেখানে চাঁদার অনুপাতে উদ্বৃত্ত বণ্টিত হবে। সুতরাং, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যকার সম্পর্ক হলো শর্তযুক্ত অনুদানে চুক্তি এবং মুদারাবা চুক্তির সমন্বয়।

আমরা যখন বলি, ইসলামী বীমা দান ভিত্তিক এবং তা লাভ অর্জনের জন্য নয়, তার মানে এই নয় যে, বীমা প্রতিষ্ঠানের লাভ করার কোন লক্ষ্য থাকে না। ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতেই আন্ডাররাইটিং এবং বিনিয়োগ তৎপরতা চালিয়ে থাকে, তবে অবশ্যই তা শারিয়াহ আইনের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে, বীমা প্রতিষ্ঠান এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যকার সম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করছি, ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ ওয়াকালা ব্যবস্থায় কিংবা মুদারাবা ভিত্তিতে অথবা উভয়টির বিভিন্ন সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ওয়াকালা (এজেন্সি) ভিত্তিতে যখন কার্যক্রম চলে, তখন ধরা হয়ে থাকে অংশগ্রহণকারীরা তাদের পক্ষ থেকে বীমা স্কিমগুলো পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেছে বীমা কোম্পানীকে। কোম্পানি তখন বাজার মান এবং বীমা শিল্পের বিধিবদ্ধ নির্দেশিকার আলোকে বিচক্ষণতার সাথে তা পরিচালনা করে থাকে। এই ধরনের চুক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠানটি স্কিমের আওতায় সৃষ্ট তহবিল থেকে সার্ভিস ফি গ্রহণ করতে পারে। চুক্তি অনুযায়ী তারা নির্দিষ্ট কমিশনও গ্রহণ করতে পারে। ওয়াকালা ভিত্তিতে পুরো লাভ বা উদ্বৃত্তের অধিকারী হয় অংশগ্রহণকারী। অন্যদিকে মুদারাবা ভিত্তিতে যখন কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে সমুদয় সঞ্চয় তুলে দেয়া হয়, তখন বীমা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণকারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে বা দেশের আইন অনুযায়ী লভ্যাংশ পেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

ইসলামী বীমার ক্রমযাত্রা

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বিগত শতাব্দী সমূহে মুসলমানরা তাদের ঐতিহ্য, আইনকানুন, আর্থ-সামাজিক পদ্ধতিগুলো ভুলে যেতে থাকেন। তারা ইসলামকে তাদের নিজেদের আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোর উন্নতির জন্য ব্যবহার করেনি। গত শতকে অনেকগুলো মুসলমান প্রধান দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। অবশ্য, অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে না পারায় এটা কম অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ঊনবিংশ শতকে প্রখ্যাত হানাফি আইনবিশেষজ্ঞ ইবনে আবেদিন (১৭৮৪-১৮৩৬) প্রথম বীমার ধারণা এবং তার আইনগত যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। এটা অনেক আলেমের চক্ষু খুলে দেয়। বিশ শতকে, আরেকজন সুপরিচিত ইসলামী আইনজ্ঞ মোহাম্মদ আবদুহ ফতোয়া জারি করেন যে, বীমা হলো আল-মুদারাবা আর্থিক লেনদেনের অনুরূপ। গত শতাব্দীতে, মুসলমান বিশেষজ্ঞগণ আরো অনেক অনেক গবেষণা করেন। এদের মধ্যে ড. নেজাতুল্লাহ, ড. মোসলেহউদ্দিন, ড. মাসুম বিল্লাহ এবং অন্যরা সারা বিশ্বে ইসলামী বীমার কর্মপদ্ধতির প্রয়োগিক দিক নিয়ে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সমসাময়িক ইসলামী বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, তাকাফুল (ইসলামী বীমা) শরিয়াহ আইনের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি অসংখ্য সভা, সম্মেলন এবং ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়, যেমন ঃ

ক) ইসলামী ফিকহ কনফারেন্স দামেস্ক, ১৯৬১
খ) সেকেন্ড কনফারেন্স অব মুসলিম স্কলার্স, কায়রো ১৯৬৫
গ) সিম্পোজিয়াম অব ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স লিবিয়া- ১৯৭২
ঘ) ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ইসলামিক ইকোনমিক্স, মক্কা ১৯৭৬
ঙ) কাউন্সিল অব সৌদি উলামা রেজুলিউশন, ১৯৭৭
চ) ফিকহ কাউন্সিল অব মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ রেজুলিউশন- ১৯৭৮।

ফলশ্রুতিতে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক সুদানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে সুদানে প্রথম ইসলামী বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। গত পঁচিশ বছরে আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় ইসলামী বীমা বিকশিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের মতো ইসলামী বীমাও প্রায় সকল মুসলিম দেশে বিশেষ করে বাহরাইন, বাংলাদেশ, ব্রুনেই, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর সৌদি আরব ইত্যাদি অনেক মুসলিম দেশে তার কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে এবং জোরকদমে তার সম্প্রসারণ করেছে।

বর্তমান দৃশ্যপট

সুদানে প্রথম ইসলামী বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠার (১৯৭৯) পর থেকে গত পচিশ বছরে (১৯৭৯-২০০৪) সারা বিশ্বে প্রায় সত্তরটি তাকাফুল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই

www.pathagar.com

বিকাশ সত্ত্বেও তাকাফুল আন্দোলন ব্যাপকরূপ ধারণ করেনি। আজকে পর্যন্ত তাকাফুল প্রিমিয়াম বিশ্বের মোট বীমা প্রিমিয়ামের মাত্র প্রায় ০.০৫% এর কম। এর প্রধান কারণ হলো উন্নয়নশীল মুসলিম দেশগুলোতে বীমা বিস্তৃত হয়নি। অনেক দেশে কার্যত এটা অস্তিত্বহীন। অধিকন্তু মুসলিম ও অমুসলিম দেশগুলোতে তাকাফুল সম্প্রসারণে আরো কিছু বাধাসৃষ্টিকারী বিষয় রয়েছে। এসব বাধা দূর করার জন্য প্রয়োজন আন্তরিক ও পরিকল্পিত উপায়।

প্রথমত, তাকাফুলের মূলনীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পেশাজীবী, উলেমা এবং রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, মুসলিম সমাজে বীমা সম্পর্কে নেতিবাচক ভাবমূর্তি বিরাজ করছে। অনেক ইসলামী দেশে বীমা সম্পর্কে সচেতনতা অত্যন্ত নীচু পর্যায়ে। তৃতীয়ত, ইসলামী দেশগুলোতে সুপ্রশিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন বীমা ব্যক্তিত্বের অভাব আছে। চতুর্থত, সনাতন বীমার একটি বিকল্প হিসেবে তাকাফুল ব্যবস্থা সম্প্রসারণে সহায়তার জন্য নতুন আইন ও বিধি প্রণয়নে বীমা নিয়ন্ত্রক ও আমলাদের মধ্যে আগ্রহ বা সহায়ক মনোবৃত্তির অভাব রয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, তাকাফুল প্রতিষ্ঠানগুলোকে দূষিত বাজার কাঠামোতে কাজ করতে হয়, যেখানে অনৈতিক অনুশীলন এতো বেশি এবং প্রাধান্যপূর্ণ যে, সামান্য মূলধন নিয়ে গুটিকতেক তাকাফুল প্রতিষ্ঠান নতুন বাজার ব্যবস্থা এবং সুশাসন ব্যবস্থা চালু করতে পারে না। এসব সমস্যার অবসানের জন্য, এটা খুবই জরুরি যে, সারা বিশ্বের উলেমা এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণ এসব বিষয় নিয়ে ব্যাপক চিন্তাভাবনা করা এবং ইসলামী বীমার মৌলিক নীতিমালা সহজভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যেন তা সর্বজনবোধগম্য হতে পারে।

ইসলামী বীমা সহযোগিতার নীতিমালা এবং পারস্পরিক সহমর্মিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এতে যৌথ দায়দায়িত্ব, যৌথ সহায়তা এবং সংহতির উপাদান আছে। পলিসিহোল্ডারগণ তাদের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করে থাকে। প্রতিটি পলিসিহোল্ডারই অভাবীদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করে। এটা অন্যের মূল্যে নিজের স্বার্থ হাসিল নয় তবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা এতে রয়েছে। এই ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো লাভ নয়, বরং "অন্যের বোঝা বহন" করার নীতি সমুন্নত রাখা। এই ব্যবস্থায় এটি স্পষ্ট যে, তাকাফুল প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবে পলিসিহোল্ডারদের তহবিলের ব্যবস্থাপক ও জিম্মাদার।

বর্তমানে তাকাফুল ব্যবস্থার পুরোপুরি সহযোগিতার ধারণা ছাড়াও বিভিন্ন বাণিজ্যিক মডেল বিকশিত হচ্ছে এবং তা প্রয়োগও হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে মুদারাবা মডেলটি বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মডেলের আওতায় উদ্বৃত্ত অর্থ পলিসিহোল্ডার এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠান ভাগাভাগি করে নেয়। এই মডেলের আওতায়, তাকাফুল পরিচালকরা বিনিয়োগকৃত প্রিমিয়ামের লাভ ছাড়াও আন্ডাররাইটিং এর উদ্বৃত্ত অংশও পেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে ওয়াকালা পদ্ধতিতে, তাকাফুল প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সার্ভিসের ফি গ্রহণ করে থাকে, লভ্যাংশ নয়। কার্যক্রমের যে মডেলটিই গ্রহণ করা হোক না কেন, তাকাফুল ব্যবস্থা জনগণের কল্যাণের জন্য এবং উম্মাহ'র উন্নতির জন্য তাকাফুলকে একটি সহযোগিতামূলক ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

তাকাফুলে, অংশগ্রহণকারীরা একইসাথে বীমাগ্রহীতা এবং বীমাকারক। অংশগ্রহণকারীরা তাদের চাঁদা থেকে যৌথভাবে তাদের একজনের সমস্যা হতে তাকে রক্ষায় ক্ষতিপূরণ নিয়ে এগিয়ে আসে। তাকাফুলে সহযোগিতার উপাদান অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। কোম্পানি এবং অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সম্পর্ক ব্যবসায়ের নীতিমালা কিংবা চুক্তির বিনিময়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাকাফুল ব্যবস্থায় মুদারাবা প্রাসঙ্গিক, কারণ এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ মুলধনের যোগানদাতা এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তা হিসেবে চুক্তিবদ্ধ। অংশগ্রহণকারীর প্রধান লক্ষ্য মুদারাবা নয়, এটা চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্য। তাই, পারিবারিক তাকাফুল কোম্পানি চাঁদা প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করে- একটি অংশগ্রহণকারীর বিশেষ হিসাব (তাবাররু) এবং অংশগ্রহণকারীর নিজস্ব হিসাব (মুদারাবা)।

মুদারাবা ব্যবস্থার একটি বিকল্প হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ওয়াকালা ব্যবস্থা প্রচলিত। এই ব্যবস্থার মৌলিক ধারণা হলো, তাকাফুল প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণকারীর ওয়াকিল হিসেবে কাজ করবে। অংশ গ্রহণকারীর প্রদত্ত অর্থ হতে ওয়াকালা ফি (২০% থেকে ৩০%) শেয়ারহোল্ডারের হিসেবে হস্তান্তরিত হয়। এই মডেলে পরিচালনাগত উদ্বৃত্তের ১০০% অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টিত হয়। লোকসানের ক্ষেত্রে, ঘাটতি পূরণের জন্য শেয়ারহোল্ডারদেরকে কর্জে হাসানা হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের তহবিলে অর্থ প্রদান করতে হবে যা ভবিষ্যতে উদ্বৃত্তের সময়ে ফেরত দেয়া হবে। দাবি পূরণের জন্য তাবাররু শর্তাধীনে দেয়া হয়। যদি তাবাররু তহবিলে উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তা অংশগ্রহণকারীদের ফিরিয়ে দেয়া হয়।

অনেক শরিয়াহ বিশেষজ্ঞ ওয়াকালা ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন এবং ওয়াকালা মডেলে ওয়াকফের ধারণা অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। এই পরিবর্তিত ব্যবস্থায়, বীমা কোম্পানি ওয়াকফ তহবিল নামে একটি কল্যাণমূলক তহবিল গঠনের জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু দান করবে। এই ওয়াকফ যখন গঠিত হবে, তখন শেয়ারহোল্ডারগণ ওয়াকফে তাদের মালিকানা অধিকার হারাবে। অবশ্য, কোম্পানি এই তহবিল পরিচালনা করবে। তাকাফুল নিরাপত্তার জন্য অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত দানও এই তহবিলে জমা হবে এবং সম্মিলিত সব অর্থ বিনিয়োগে ব্যবহৃত হবে। অর্জিত লাভও একই তহবিলে জমা হবে। অংশগ্রহণকারীগণ এই ওয়াকফ তহবিল থেকে সুবিধা পাবে। ওয়াকফ তহবিল সাধারণ টেকনিক্যাল রিজার্ভের অতিরিক্ত বিশেষ রিজার্ভ তহবিল গঠন অনুমোদন করে। ওয়াকফ তহবিল পরিচালনার বিধিবিধানে ক্ষতিপূরণ ও অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

সহায়তা ভিত্তি, অংশগ্রহণকারী ও পরিচালকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত বণ্টনের হার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণিত হবে।

বিভিন্ন মডেল ও অনুশীলন

কোন কোন ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে সহযোগিতা কিংবা পারস্পরিক সহায়তা হতে হবে ইসলামী বীমার একমাত্র ভিত্তি। সুদানে যখন প্রথম ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন তা ছিল পুরোপুরি সহযোগিতা ভিত্তিক, সেখানে ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সদস্যদের হাতে এবং তারা ছিলেন পলিসিহোল্ডারও। বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারক ছিলেন একই গোষ্ঠী। এধরনের মডেলের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় পারস্পরিক নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ। এতে লাভের কোন উপাদান নেই। উদ্বৃত্ত যদি কিছু হয় তবে তা বীমা তহবিলে ফিরিয়ে দেয়া হয়। স্কিম পরিচালনার অভিজ্ঞতার আলোকে অংশগ্রহণকারীদের চাঁদা বাড়ানো বা কমানো হয়। অবশ্য, মালয়েশিয়া ও আসিয়ানভুক্ত অন্যান্য দেশে ইসলামী বীমা তেজারি মডেল তথা বাণিজ্যিক মডেলের অনুশীলন করা হয়। তেজারি মডেলে পরিচালনা প্রতিষ্ঠান লাভ করবে বলেই ধরা হয়ে থাকে। তেজারি মডেলে বীমা প্রতিষ্ঠান ও অংশগ্রহণকারীর মধ্যকার চুক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তি হলো মুদারাবা পদ্ধতি।

সমবায় ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক বীমা মডেল সেই সমাজে কাজ করতে পারে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা সচেতন এবং বীমা কার্যক্রম পরিচালনার মতো টেকনিক্যাল বিষয় সম্পর্কে অবহিত। অধিকন্তু, উদ্যোগ গ্রহণের মতো তহবিলও থাকতে হবে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক মডেলই বেশি জনপ্রিয় এবং উদ্বৃত্ত বণ্টনের ক্ষেত্রে মুদারাবা ব্যবস্থা অনুকরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে, মুদারাবা পদ্ধতির তিনটি ধরণ দেখা যাচ্ছে। কোন কোন কোম্পানি বিশুদ্ধ মুদারাবা পদ্ধতি অনুসরণ করছে, সেখানে অংশগ্রহণকারীগণ ও বীমা প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ আয় ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। আর আন্ডাররাইটিং উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে, তা পুরোপুরি শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারীরাই পাচ্ছে। এটা প্রধানত ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীগুলোতে অনুসরণ করা হচ্ছে। কোন কোন কোম্পানি তহবিলের উদ্বৃত্ত ভাগাভাগি করে নিচ্ছে এবং বিনিয়োগের লাভ তহবিলে ফিরিয়ে দেয়ার নীতি অনুসরণ করছে। তৃতীয় ব্যবস্থায় তহবিলের উদ্বৃত্ত এবং বিনিয়োগ আয় উভয়টাই প্রতিষ্ঠান ও অংশগ্রহণকারীগণ ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। প্রতিটি ব্যবস্থাই শরিয়াহ অনুমোদিত।

উদ্বৃত্তের অংশে অংশগ্রহণকারীকে ন্যায্যতা প্রশ্নে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন যে, অংশগ্রহণকারীরা তখনই বিতরণযোগ্য উদ্বৃত্ত পাওয়ার যোগ্য হবে, যখন তারা কোম্পানির তাকাফুল সুবিধাবলী থেকে কোন সুবিধা নেবে না বা দাবি করবে না কিংবা যদি তারা তাদের পলিসি সমর্পণ করে। অন্যরা মনে করেন, অংশগ্রহণকারীগণ যদি তাদের চাঁদার কম পরিমাণে দাবি করেন তবে উদ্বৃত্তের অংশ পাবে। উভয় মতটিই শরীয়াহ অনুমোদিত বলে বিবেচিত হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশেই ওয়াকালা ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। এই ব্যবস্থার মৌলিক ধারণা হলো, তাকাফুল প্রতিষ্ঠানগুলো অংশগ্রহণকারীদের ওয়াকিল (এজেন্ট)

www.pathagar.com

হিসেবে কাজ করে। এই ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত চাঁদা থেকে ফি পাবে। অবশ্য আমরা প্রতিষ্ঠানের সম্মানী প্রাপ্তির বিভিন্ন ব্যবস্থা দেখে থাকি। বিশুদ্ধ ওয়াকালা ব্যবস্থায়, প্রদত্ত সেবার জন্য প্রতিষ্ঠানটি ফি হিসেবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেয়ে থাকে। কেউ কেউ একটু সংশোধিত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্স পুরস্কার হিসেবে আন্ডাররাইটিং উদ্বৃত্তের একটি আনুপাতিক অংশ প্রদান করে থাকে। ওয়াকালা ব্যবস্থায় আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ওয়াকালা এবং একইসাথে ওয়াকফ ব্যবস্থার সমন্বয়মূলক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায়, ওয়াকফ তহবিল গঠনের জন্য কোম্পানি নিজেই প্রথমে কিছু দান করে। ওয়াকালা পদ্ধতির এই সংশোধিত ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও কোম্পানির মধ্যকার সম্পর্ক সরাসরি ওয়াকফের সাথে সম্পর্কিত হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা নিঃশর্তে তহবিলে দান করে এবং একজন সদস্য হয়। আন্ডাররাইটিং নীতিমালা অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী/সম্পদের ঝুঁকির সাথে সংগতিপূর্ণ হবে দানের হার। ওয়াকফ তহবিল নিয়মাবলী হবে তার সদস্যদের ক্ষতিপূরণের ভিত্তি। সকল কার্যক্রমগত খরচ ওয়াকফ ফান্ড হতে দেয়া হবে। সেবাদানের জন্য বীমা প্রতিষ্ঠানকে ওয়াকফ তহবিল থেকে নির্দিষ্ট সম্মানী দেয়া হবে। এছাড়াও বীমা প্রতিষ্ঠান ওয়াকিল বা মুদারিব হিসেবে উদ্বৃত্তের অংশ পাবে। প্রতিষ্ঠান ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যকার সম্পর্ক ওয়াকালা, ওয়াকফ ও মুদারাবা এই তিনটি ধারণার উপর ভিত্তি করে হবে। এই ব্যবস্থা অনেক বেশি সুবিধাজনক এবং সনাতন বীমার বিপরীতে ইসলামী বীমা বিকাশে অনেক বেশি সহায়ক বলে মনে হয়।

ইজতিহাদের গুরুত্ব

বীমা একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজন। কিন্তু তাকাফুলের শরিয়াহ্ সম্মত ধারণা সনাতন বীমা পদ্ধতিতে অনুপস্থিত। তাই, শরিয়াহ ভিত্তিক নীতিমালা ও পদ্ধতির প্রবর্তন জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন। এ কারণেই বর্তমানকালে শরিয়াহ বিশেষজ্ঞগণ বীমাপদ্ধতি অধ্যয়ন করছেন যাতে সমগ্র বিশ্বে মুসলমানরা তাদের নিজেদের স্বার্থে বীমার সেবা প্রাপ্তিতে উৎসাহিত হওয়ার ক্ষেত্রেও শরিয়াহ'র বিধান মেনে চলতে পারে।

বীমার লক্ষ্য হলো ব্যক্তিবিশেষকে জীবন, স্বাস্থ্য ও সম্পদের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা। বীমার ধারণা ইসলামী মূলনীতির কাঠামোর মধ্যে গ্রহণযোগ্য। মুসলমান সমাজের অধিকাংশ সদস্য যেখানে অর্থনৈতিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত, সেখানে তাকাফুলের কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি। শরিয়াহ'র প্রয়োজন হলো এমন একটি তাকাফুল পদ্ধতি যা চুক্তিবদ্ধ সকল পক্ষের জন্য লাভজনক। ইসলামী বিধানে যে কোন চুক্তি উভয়পক্ষের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষা করে থাকে। তাই ইসলামী বীমা কোম্পানি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংহতির লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগ গ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত চাঁদা তাদেরই থাকে এবং তা সনাতন বীমা কোম্পানীগুলোর মতো বীমা প্রতিষ্ঠানের নিজের সম্পদে পরিণত হয় না। সনাতন বীমা চুক্তির ভিত্তি হলো স্বার্থের বিনিময়। এই সম্পর্ক এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যে, বীমাকারী প্রিমিয়াম প্রদানের ক্রয় ও বিক্রয়ের চুক্তির

www.pathagar.com

মাধ্যমে হতে পারে না। তাকাফুল পদ্ধতি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য হবে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং তা প্রধানত দান (তাবারু) চুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী। অন্য যেকোন পণ্য বা সেবার মতো, প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেই আবিষ্কার সম্পন্ন হয়। জীবন, সম্পদ এবং দায়দায়িত্বের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য শারিয়াহ'র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই, সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ'র প্রয়োজন পূরণের জন্য তাকাফুল কোম্পানি গড়ে উঠছে। অবশ্য তাকাফুল ব্যবস্থা এখনো বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আছে। প্রয়োজনের নিরিখে বর্তমান বিকাশ অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক। মুসলিম ও অমুসলিম উভয় দেশেই এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। পেশাজীবী এবং শরিয়াহ বিশেষজ্ঞগণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো শরিয়াহ'র নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি আদর্শ পদ্ধতির বিকাশ যা ভোক্তাদের বৃহত্তর আস্থা অর্জন করবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সনাতন সামাজিক বীমার বিকল্প হিসেবে সহযোগিতা বা পারস্পরিক বীমা একটি আদর্শ পদ্ধতি। মুসলিম বিশ্বে সামাজিক বীমার অনুপস্থিতি রয়েছে। তাই, এনজিও এবং ক্ষুদ্র বীমা পরিচালনা প্রতিষ্ঠানগুলো সুদানের সমবায় বা পারস্পরিক সহযোগিতা বীমার মডেল নিয়ে চেষ্টা করতে পারে যাতে লাভ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান লক্ষ্য হবে না। অবশ্য, ইসলামী বীমা সনাতন বাণিজ্যিক বীমার বিকল্প হিসেবে অগ্রসর হচ্ছে, মালয়েশিয়ার 'তেজারি' মডেল অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাবার কারণে।

অধিকন্তু-সঞ্চয়ের কোন উপাদান না থাকায় সাধারণ বীমার জন্য তেজারি মডেলের ওয়াকালা ব্যবস্থা আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অন্যদিকে ইসলামী জীবনবীমা হয় ওয়াকালা, ওয়াকফ বা সংশোধিত মুদারাবা ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতে পারে। পরিচালনা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করবে, তারা কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবে। অবশ্য কার্যক্রম পরিচালনায় পেশাজীবীগণ যে ব্যবস্থাকে উপযোগী মনে করবেন, সেটাই গ্রহণ করবেন। আমাদের কাছে যা স্পষ্ট তা হলো এই যে দুটি পদ্ধতির উভয়টিই শারিয়াহ'র নীতিমালা অনুযায়ী এবং বিভিন্ন ব্যবস্থার একটি সমন্বয়ও শারিয়াহ'র নীতিমালা অনুসরণে চলতে পারে। আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই যে, আমাদের বুঝতে হবে, বর্তমানে প্রচলিত ধরনের বীমা মহানবীর (সাঃ) সময়ে বিদ্যমান ছিল না। তাই আইনগত অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য ইজতিহাদের প্রয়োজন। এখানেই আমাদের শারিয়াহ বিশেষজ্ঞদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইজতিহাদ অবশ্যই কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক হতে হবে। সর্বপ্রথম আমাদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ কুরআন অনুসরণ করতে হবে। সেখানে আমরা যদি কোন স্পষ্ট নির্দেশনা না পাই, তবে আমাদেরকে আল্লাহর নবীর (সাঃ) সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। আমরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ'র সুস্পষ্ট নির্দেশনা না পাই, তবে আমাদেরকে নিজের বিচারবুদ্ধিতে পরিচালিত হতে হবে।

www.pathagar.com

ছয়.

ইসলামী বীমার প্রকৃতি ও সুফল

বীমা শব্দটি আমাদের নিকট অতি পরিচিত। কিন্তু "ইসলামী বীমা" সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমাদের অনেকের বাস্তব ধারণা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামী বীমার কার্যক্রম শুরু হয়েছে অতি সম্প্রতি। অতএব ইসলামী বীমা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। "ইসলামী বীমা" প্রচলিত বীমা ব্যবসার সাথে পুরোপুরি সাযুয্যপূর্ণ নয় যদিও পদ্ধতিগত ও তত্ত্বগত যথেষ্ট মিল উভয়ের মধ্যে রয়েছে। সনাতন বীমা ব্যবসা পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটি প্রধান ভিত। সঞ্চয় ও ঝুঁকির সমন্বিত ব্যবহার ও প্রয়োগের ফলে আধুনিক বীমা ব্যবস্থা আধুনিক জীবনযাত্রার এক অপরিহার্য অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছে। শিল্প, ব্যবসা- বাণিজ্য, তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে বীমা ব্যবসার প্রসার স্বাভাবিক গতিতে হয়ে থাকে। জনপ্রতি গড় বীমা প্রিমিয়ামের অংক একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি সচেতনতার পরিচায়ক।

জীবন ও সম্পদের যে সব ঝুঁকি আমরা প্রত্যক্ষ করি, সে সব ঝুঁকি কিভাবে সবচাইতে উত্তম পদ্ধতিতে মোকাবেলা করা যায় সেই চিন্তা থেকে বীমা ব্যবসার উৎপত্তি। জীবন মানেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার নিশ্চয়তা। অনিশ্চয়তা আমাদের নিত্যদিনের সাথী। আমরা চাই জীবনকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে। কিন্তু জীবনকে ঝুঁকিমুক্ত রাখা বাস্তবে সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবে তাই আমরা ঝুঁকি মোকাবেলার পথকে বেছে নিয়েছি। ব্যবসায়ীদের জন্য ঝুঁকি এক রোমাঞ্চকর খেলার অংশ বিশেষ। ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন ঝুঁকি আছে, তেমনি আছে মুনাফার সম্ভাবনা। ব্যবসায় মুনাফার হারকে নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের নিখাদ ঝুঁকির বৈজ্ঞানিক ও নিয়মতান্ত্রিক মোকাবেলার প্রচলিত নাম হচ্ছে বীমা।

অনেক ক্ষেত্রেই বীমা বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়। দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে একজন মোটর গাড়ী মালিককে বাধ্যতামূলকভাবে তৃতীয় পক্ষের দায় (Third party liability) মেটাবার জন্য বীমা পত্র সংগ্রহ করতে হয়। ব্যবসায়ী মাত্রই জানেন যে, আন্তর্জাতিক আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে পণ্যের বীমা গ্রহণের শর্ত ব্যতিরেকে ঋণপত্র খোলার জন্য ব্যাংক অনুমোদন দেয় না। এছাড়া ব্যাংক লীজ বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যে সব বিনিয়োগ করে সে সব প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কিংবা ব্যাংক তার নিজস্ব সম্পদসমূহকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রাখাকে যুক্তিযুক্ত মনে করে না। কারণ ব্যাংক তার গ্রাহকদের

www.pathagar.com

আমানতকে লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকে। বিনিয়োগকৃত সম্পদ যদি কোন দুর্যোগের বা দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হয় তবে ব্যাংক আমানতকারীদের অর্থের হেফাযত করতে ব্যর্থ হবে।

বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ দেবার জন্যও বন্ধককৃত সম্পত্তির বীমা করা প্রয়োজন। নতুবা ব্যাংক নিরাপত্তাহীনতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা যারা গড়ে তুলেছেন, তাদের জন্যও বীমা জরুরী। বিভিন্ন ধরনের বীমার মাধ্যমে সম্পদের সংরক্ষণ ব্যাংকের নৈতিক, সামাজিক ও আইনগত দায়িত্ব। সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে শরীয়ত ভিত্তিক পরিচালনার জন্য ইসলামী বীমা ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন। যেহেতু ফকিহগণ মনে করেন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত আধুনিক বীমা ব্যবসা ইসলাম সম্মত নয়, সেহেতু ইসলামী ব্যাংক এবং সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মানুষের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এসব বিবেচনায় বলা যায় যে, শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও পরিচালনা এখন সময়ের এক জরুরী দাবি।

ইসলামী পদ্ধতিতে বীমা গ্রহীতাগণকে একটি সমিতির সদস্যের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যেখানে সদস্যগণ একটি সাধারণ তহবিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা প্রদান করবে। এই চাঁদার অর্থ শরীয়ত অনুমোদিত পথে (সুদমুক্তভাবে) বিনিয়োগ করা হবে। সমিতির সকল সদস্য এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন যে, কোন সম্পদ নির্ধারিত কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হলে তা সংগৃহীত তহবিল হতে ক্ষতিপূরণ করা হবে। এইভাবে সমিতির সদস্যবৃন্দ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের সম্পদকে অনিশ্চিত ঝুঁকির হাত থেকে মুক্ত রাখতে পারেন। সদস্যগণ প্রত্যেককে নিজেদের সম্পদ বা দায়ের ঝুঁকি পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ঝুঁকি মোকাবেলা করেন। ইসলাম প্রবর্তিত বীমা ব্যবস্থা মূলতঃ একটি সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান যেখানে পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি থেকে ব্যক্তি ও সমাজ উপকৃত হয়ে থাকে।

সুষম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার আমাদের শাসনতন্ত্রের মৌল নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। অতএব সামাজিক সুবিচার ভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হলে তা শুধুমাত্র শাসনতান্ত্রিক অঙ্গীকার পূরণেরই সহায়ক হবে না বরং হবে আদর্শ ভিত্তিক জীবন যাপনের মহত্তম উদ্যোগ। ইসলামের বীমা ব্যবস্থা ন্যায়-নীতি ভিত্তিক একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য একটি গণমুখী ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী বীমা প্রভূত অবদান রাখতে সক্ষম।

আমরা জানি যে, বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসাবে পেশ করা হচ্ছে এবং অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের যাবতীয় অংগনে ইসলামের বিজ্ঞানভিত্তিক নীতিমালা প্রয়োগের ব্যাপারে যথেষ্ট অনুকূল সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে মুসলিম-অমুসলিম

www.pathagar.com

রাষ্ট্র নির্বিশেষে গড়ে উঠেছে ইসলামী শরীয়ত ভিত্তিক ব্যাংক, বীমা ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান। অত্যন্ত আশা ও গর্বের ব্যাপার এই যে, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক সুদবিহীন ও বীমা ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। জনগণ এই প্রচেষ্টাকে শুধু সমর্থনই করেনি এবং সক্রিয় সহযোগিতা দান করেছে। ইসলামী বীমা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সর্বাধিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

আমরা জানি যে, সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে এদেশের ধর্মপ্রাণ উদ্যোক্তাগণ ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বীমা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অধিকতর উপলব্ধি করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুদান, তিউনিসিয়া, সংযুক্ত আরব আমীরাত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে শরীয়ত ভিত্তিক বীমা প্রতিষ্ঠান বিগত কয়েক দশক হতে দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়াও সুইজারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ এবং বাহামা দ্বীপপুঞ্জেও ইসলামী বীমা (তাকাফুল) প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং সফলতার দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ সচেতন ও ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশী চিন্তাবিদগণ জনগণের চাহিদা মোতাবেক ইসলামী বীমা ব্যবস্থা প্রচলনের তাগিদ অনুভব করেছেন এবং সুখের বিষয় এই যে, বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তাগণও এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছেন। বাংলাদেশে সনাতন বীমা কোম্পানী সমূহ যেমন ইসলামী বীমা চালু করেছে তেমনি ইসলামী বীমা কোম্পানী হিসেবে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের পর সফলভাবে ব্যবসা করে যাচ্ছে।

ইসলামী বীমা কিভাবে পরিচালিত হবে?

ইসলাম "ফিতরত" বা প্রকৃতির ধর্ম। অতএব মানব প্রকৃতির প্রতিটি প্রয়োজনকে ইসলাম স্বীকার করে এবং গুরুত্ব দেয়। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই ইসলাম একটি সীমারেখা টেনে দেয়। মানব জীবনের জন্য ক্ষতিকর বিষয় যেমন- জুয়া, সুদ, ফটকাবাজারী ইত্যাদি ইসলাম অনুমোদন করে না। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী ব্যবস্থার অধীনে এমন কোন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান চালু করা সম্ভব নয় যেখানে জুয়া, সুদ, বা ফটকাবাজারীর অবকাশ আছে। ফলে ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বীমা ব্যবসা যে পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হয়ে থাকে তা আদৌ ইসলাম সম্মত নয়। কারণ প্রথমতঃ পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থার মত পুঁজিবাদী সমাজে বীমা ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে পুঁজিপতির পুঁজি সৃষ্টির মাধ্যম বা হাতিয়ার হিসেবে। ইসলামী সমাজ ঠিক এর বিপরীতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে চায় যা সমাজের সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। অপরের পুঁজিকে ভিত্তি করে একটি বিশেষ গোষ্ঠী লাগামহীন মুনাফা ভোগ করবে ইসলাম তা অনুমোদন করে না। অতএব, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে বীমা ব্যবসা পরিচালনা করা হয় তার পরিবর্তে "সকলের তরে সকলে আমরা" নীতির উপর ভিত্তি করে বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে ইসলামী নীতিমালার আলোকে।

www.pathagar.com

এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতি যদিও অনেকটা সমবায়ী প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ হবে কিন্তু বাস্তবে সংগঠনটির অবয়ব ও গঠন প্রকৃতিতে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী কিংবা নিবন্ধনকৃত সমবায় সমিতি হিসেবে গড়ে উঠবে। দেশের কোম্পানী/সমবায় আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠানটি রেজিস্ট্রি করা প্রয়োজন হবে এবং কোম্পানীর উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারীগণ জনগণের মাঝে খোলা বাজারে শেয়ার ছাড়তে পারবে। তবে অন্যান্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর তুলনায় এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব হবে এই যে, কোম্পানীর শেয়ারমালিকদের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি পলিসি গ্রাহকদের মধ্য থেকেও পরিচালনা বোর্ডে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া শেয়ার মালিকদের মূলধন এবং পলিসি গ্রাহকদের উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ করা হবে সম্পূর্ণ আলাদা হিসাবের মাধ্যমে। অর্থাৎ শেয়ার মালিকদের বিনিয়োগ থেকে যে মুনাফা আসবে তা কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের উদ্বৃত্ত তহবিল বা এর মুনাফার সাথে একীভূত করা হবে না। পলিসি গ্রাহকদের উদ্বৃত্ত তহবিল হতে বিনিয়োগকৃত মুনাফা নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে কোম্পানীর "রিজার্ভ ফান্ডে" জমা থাকবে এবং একটি অংশ পলিসি গ্রাহকদের উদ্বৃত্ত হিসেবে ফেরত দেয়া যাবে। মুনাফার বণ্টন অনুপাত বা প্রিমিয়াম ফেরতের হার কত হবে তা বাস্তব অবস্থা বিনিয়োগের ভিত্তিতে মুনাফা নির্ধারণ করা হবে। এই পদ্ধতির ফলে পলিসি গ্রাহকগণও বীমা প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারবে এবং লাভের অংশীদার হবেন। একটি আদর্শ ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কার্যপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ক) কোম্পানী আইনের অধীনে কিংবা সমবায়/সমিতি-নিবন্ধন আইনের আওতায় এই প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রীভুক্ত করা যাবে।

খ) শুধুমাত্র শরীয়ত অনুমোদিত খাতসমূহে এবং পদ্ধতির মাধ্যমে কোম্পানীর মূলধন ও উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ করতে হবে।

গ) একটি "শরীয়ত তত্ত্বাবধায়ক কমিটি" কোম্পানীর কার্যবিধি পরিচালনা করবে এবং শরীয়তের অনুমোদন/অননুমোদন বিষয়ে মতামত প্রদান করবে।

ঘ) কোম্পানীর শেয়ার মালিকদের মূলধন, বীমা গ্রহণকারীদের তহবিল হতে আলাদাভাবে সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ করা হবে।

ঙ) বীমা গ্রহীতাগণের প্রদত্ত চাঁদা (প্রিমিয়াম) হতে গঠিত তহবিল/সংরক্ষিত তহবিলের বিনিয়োগজনিত লাভের অংশ, চুক্তির শর্ত ও পরিচালকবৃন্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীমাকারীদের মধ্যে বণ্টন করার সুযোগ থাকবে।

চ) পরিচালনা পরিষদে (বোর্ড অব ডিরেক্টরস) বীমা গ্রহীতাগণের মধ্য হতে সদস্য নির্বাচিত করার বিধি থাকতে হবে।

ছ) শতকরা ২.৫ হারে যাকাত আদায় করা হবে এবং শারীয়া অনুমোদিত খাতে তা ব্যয় করা হবে।

www.pathagar.com

জ) প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক কোম্পানীর নিকট ন্যূনতম অংশ শারীয়াহ বিধি অনুসরণ করে পুনঃবীমা করা যেতে পারে অন্যথায় ইসলামী পুনঃবীমা কোম্পানীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ পুনঃবীমার কাজ করতে হবে।

ঝ) দেশের আইনের অধীনে প্রচলিত সকল প্রকার ঝুঁকির জন্য স্বীকৃত বীমাপত্রের অনুরূপ বীমাপত্র প্রদান করা হবে।

ইসলামী বীমার সুফল

বীমা ব্যবসা ইসলাম সম্মত কি না এ বিষয়ে প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ ফিকাহ ও শরীয়তের আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা করার পর দেখেছেন যে সমবায় পদ্ধতিতে সুদমুক্তভাবে বীমা ব্যবসা পরিচালনা করা হলে তা ইসলাম বিরোধী হবে না। এই প্রসংগে বলা যায় যে, সাধারণ বীমার আওতাধীনে যে সব ঝুঁকির জন্য বীমা করা হয় তা আধুনিক সমাজের জন্য অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য বা বাণিজ্যিক কারণে বাধ্যতামূলক। অগ্নি, নৌ, মোটর ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বীমার মাধ্যমে বীমা গ্রহীতার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। ইসলামী বীমায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ অঙ্গীকারের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। সনাতন বীমা ব্যবসায় পুঁজিপতিদের পুঁজি গড়বার মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু ইসলামী বীমা গড়ে তুলতে হবে একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

অবশ্য বাণিজ্যিকভাবে মুদারাবা নীতি অনুসরণ করে ইসলামী বীমা ব্যবসা কাজ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে ইসলামী বীমার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের গৌণ উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। যেহেতু গ্রাহক সাধারণের সঞ্চয় ও অনুদানের মাধ্যমে ইসলামী বীমার প্রধান কার্যক্রম চালানো হয় সেহেতু উদ্যোক্তাগণ মূলতঃ আমানতদার ও তহবিল ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের কারণে বিনিয়োগ হতে উদ্বৃত্তের অংশের ভাগীদার হবেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী বীমার মৌলিক উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সনাতন বীমার লক্ষ্য হতে সম্পূর্ণ পৃথক।

ইসলামী বীমা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করে আসছি। এ আলোচনার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক) আমরা সুনিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছি যে, বর্তমান যুগে বীমায় অনেকগুলো অত্যাবশ্যক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপযোগিতা রয়েছে।

খ) আমরা জানি, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অনুসৃত বীমা পদ্ধতির বিভিন্ন ত্রুটি রয়েছে এবং এ পদ্ধতি ইসলামী শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

গ) আমরা অনুভব করি যে, ইসলামী শরীয়ার আওতাধীনে একটি নতুন বীমা পদ্ধতি চালু করা যায় যার ভিত্তি হবে আল-তাকাফুল বা যৌথ নিশ্চয়তা।

www.pathagar.com

ঘ) আমরা লক্ষ্য করেছি, বীমা ও জুয়া মূলতঃ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার এবং ইসলামী বিধি বিধানে ধারণাযোগ্য ঝুঁকি মোকাবেলার নীতি অনুমোদন করে।

ঙ) আমরা অত্যন্ত জোরের সাথে বলতে পারি, বীমার নতুন পদ্ধতি (তাকাফুল) অনুসরণ করলে তা বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারীদের এবং সাধারণভাবে সমাজের জন্য অধিকতর সুফল বয়ে আনবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে আমরা এখন বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেষ্টা করবো কিভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত ইসলামী বীমা ব্যবস্থা সুফলদায়ক হতে পারে।

ড: মার্ক আর গ্রীণ তার "ঝুঁকি ও বীমা" শীর্ষক গ্রন্থে বীমার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপযোগিতাগুলো বর্ণনা করেছেন। ইসলামী বীমা ব্যবস্থাও সেই সব সুবিধা নিশ্চিত করে থাকে।

১. সম্ভাব্য লোকসান মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ইসলামী বীমা কমিয়ে আনে। যেমন- প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য পৃথকভাবে তহবিল রাখতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বীমা কোম্পানীর চাইতে অনেক অধিক পরিমাণ অর্থ জমা করতে হবে। কারণ তিনি জানেন না ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হতে পারে।

২. ইসলামী বীমা নতুন বিনিয়োগ উৎসাহিত করে। কারণ বীমাকারীগণ যে পরিমাণ অর্থ পুঁজিবাজারে সরবরাহ করে থাকে, অন্যভাবে এ পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের জন্য পাওয়া যেতো না। এভাবে বীমা অর্থনৈতিক সম্পদের অধিকতর উপযোগী বণ্টন নিশ্চিত ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।

৩. বিনিয়োগযোগ্য অর্থের পরিমাণ বেশী হওয়ায় কম মুনাফার বিনিময়ে পুঁজি প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। অন্যভাবে এটা সম্ভব হতো না। অধিক পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগের কারণে নতুন উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে ওঠে।

৪. ঝুঁকি হ্রাসে বীমা একটি উপযুক্ত পদ্ধতি হওয়ায় বিনিয়োগকারীরা সে সব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে থাকেন, যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণে বিনিয়োগ মোটেও করতে তারা উৎসাহী ছিলেন না। সুতরাং এর ফলে বর্ধিত শ্রম ও উৎপাদনের দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়, জীবনযাত্রার মান হয় অধিকতর উন্নত। ইসলামী বীমা ব্যবস্থা শারীয়াহ সম্মত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে থাকে।

৫. ইসলামী বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে ঝুঁকি পর্যাপ্ত পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় বিনিয়োগকারী বা শিল্পোদ্যোক্তারা অধিক ঝুঁকি নিতে পারে। বস্তুত: বীমার মাধ্যমে ঝুঁকি মোকাবেলার ব্যবস্থা করতে না পারলে ব্যাংক ও অন্যান্য লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ ঋণ পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে। সুদমুক্ত বিনিয়োগকারীগণ ইসলামী বীমার সেবা পাবেন ফলে সমাজ ও অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

www.pathagar.com

৬. ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো লোকসান প্রতিরোধ কাজে নিয়োজিত থাকে। কারণ বীমা কর্তৃপক্ষ ভালো করেই জানে যে, এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা না চালালে লোকসানের পরিমাণ বাড়ার প্রবণতা দেখা দেবে। সতর্কতা সম্পর্কে উদাসীন থাকা মানুষের একটা স্বভাব। বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট লোকেরা যদি বুঝতে পারে যে, বীমা কর্তৃপক্ষই লোকসান বহন করবে তাহলে অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয়ে পড়ে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশীদার হিসেবে ইসলামী বীমা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। যেমন, উদ্যোক্তাগণ বীমা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতার অংশীদার হিসেবে কাজ করেন।

৭. ইসলামী বীমা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় অবদান রাখে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও পরিবারের ভরণপোষণকারীদের স্বার্থ রক্ষা করেই এটা করা সম্ভব হয়। যথাযথভাবে রক্ষা করা হলে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর্থিক অস্বচ্ছলতায় নিপতিত হওয়ার প্রয়োজন হয়না। পরিবারের কর্তার মৃত্যু বা তিনি স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে সংশ্লিষ্ট পরিবারের বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার আশংকা থাকে না। পারস্পরিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী জীবন বীমা এক অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। পরিবারের নির্ভরশীলদের আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী জীবন বীমার অবদান অনস্বীকার্য।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এতোগুলো উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও বীমা ব্যবস্থার কতকগুলো সহজাত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু কিছু সামাজিক মূল্যের বিনিময়েই বীমা ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং এসব বিষয় আমাদের পর্যালোচনা করে দেখা উচিত যাতে করে আমরা বুঝতে পারি ইসলামী বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ত্রুটিগুলো সম্পূর্ণভাবে না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূর করা যায় কি না।

হিসাব করে দেখা গেছে যে, সম্পদ বীমাকারীদের বার্ষিক ওভারহেড ব্যয় সংগৃহীত প্রিমিয়ামের প্রায় শতকরা ত্রিশ ভাগ থেকে পঞ্চাশ ভাগ। এতে বোঝা যায় যে, পলিসিহোল্ডারদের প্রদত্ত প্রিমিয়ামের সিংহভাগ ব্যবস্থাপনা খরচ ও শেয়ারহোল্ডারদের জন্য মুনাফা অর্জনের কাজে ব্যবহৃত হবে। সুতরাং এ বিষয়টা স্পষ্ট যে, বীমাকৃত জনগণ ও সমাজ কিছু সামাজিক ব্যয়ের বিনিময়েই বীমা থেকে উপকার লাভ করে। অবশ্য এটা আশা করা যায় যে, বীমা ব্যবসা পরিচালনা খরচ ইসলামী বীমা ব্যবস্থার আওতায় তুলনামূলকভাবে অনেক কমে যাবে। কিভাবে এবং কি কারণে সেটা কম হবে তা বর্ণনা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ এটা সহজবোধ্য উদ্বৃত্ত (মুনাফা) যখন শেয়ারহোল্ডারগণ ও পলিসি গ্রাহকগণ ভাগ করে নিবে তখন সেবা পাওয়ার খরচ ইসলামী ব্যবস্থায় (তাকাফুল) কমে যাবে। সনাতন বীমা ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত বণ্টনের বিষয়টি মুখ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ কনভেনশনাল কোম্পানীগুলোকে বীমাকৃতদের ইচ্ছাকৃত লোকসানের অংশ বহন করতে হয়। অনেকক্ষেত্রে লোকসান বা ক্ষতি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় কিংবা ক্ষতির

www.pathagar.com

পরিমাণ বাড়িয়ে দেখানো হয়ে থাকে। ইচ্ছাকৃতভাবে প্রদত্ত লোকসানের পরিমাণের কোনো নির্ভরযোগ্য হিসাব না থাকলেও এটা স্পষ্ট যে, অনেক বীমাকৃত ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতির টাকা বীমাকারী কোম্পানী দিয়ে দিচ্ছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এটা প্রমাণ করা দুরূহ।

তৃতীয়তঃ সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার পরিমাণ বাড়িয়ে দেখানোর প্রবণতাও আছে। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। কোনো বীমা কোম্পানী জড়িত আছে জানলে সার্ভেয়ার, মেরামতকারী, চিকিৎসক, আইনজীবীগণ সুনিশ্চিতভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে বলে থাকেন। অসৎ বীমাকৃত লোকদের যোগসাজসে এসব করা হয়ে থাকে। আশা করা যায় যে, ইসলামী বীমা ব্যবস্থার আওতায় অতিরঞ্জিত ও ইচ্ছাকৃতভাবে লোকসান প্রদান বাবদ খরচ অনেক কমে যাবে। এর প্রধান কারণ এই যে, এ ব্যবস্থার আওতায় বা অধীনে বীমাকৃতরা স্বভাবতই খোদাভীরু। সুতরাং পার্থিব ক্ষণস্থায়ী লাভের আশায় তারা অবশ্যই কোনো অসৎ পদ্ধতির অনুসরণ করবেন না। বীমার উদ্যোক্তা ব্যবস্থাপনা এবং গ্রাহক সাধারণ সৎ ও নীতিবান হবেন বিধায় এ পদ্ধতি শ্রেষ্ঠতর হবে।

এটা দেখা গেছে যে, পাশ্চাত্যের স্টক কোম্পানীগুলোর তুলনায় মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলো অধিক ভাল করে থাকে। কারণ এগুলোর ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত লোকসানের হার কম। ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো প্রধানতঃ মিউচুয়েলিটি (পারস্পরিক সম্পর্ক) এর ভিত্তিতেই কাজ করবে বিধায় আশা করা যায় যে, এদের সাফল্য কনভেনশনাল বীমা কোম্পানীগুলোর তুলনায় অনেক ভালো হবে।

উদাহরণ হিসেবে একটি সনাতন সাধারণ বীমা কোম্পানী ও ইসলামী বীমা কোম্পানীর আনুমানিক দাবি ও খরচের হার বিবেচনা করে আমরা নিম্নোক্ত চার্ট তৈরি করেছি।

নিট আন্ডাররাইটিং লাভ-এর ভিত্তিতে কনভেনশনাল ও তাকাফুল কোম্পানীর তুলনামূলক বিবরণী :

বীমার ধরন	দাবির অনুপাত		খরচের অনুপাত		আন্ডাররাইটিং লাভ	
	কনভেনশনাল	তাকাফুল	কনভেনশনাল	তাকাফুল	কনভেনশনাল	তাকাফুল
ফায়ার	৫০	৪৫	৪৫	৩০	৫%	২৫%
এ্যাকসিডেন্ট	৮০	৭৫	১৫	১০	৫%	১৫%
মোটর	৪৫	৪০	৪৫	৩০	১০%	৩০%
লায়াবিলিটি	৬৫	৪০	৩৫	৩০	০%	১০%
গড়	৬০%	৫৫%	৩৫%	২৫%	৫%	২০%

www.pathagar.com

উপরের চার্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ইসলামিক তাকাফুল কোম্পানীর শতকরা ৫৫ ভাগ-এর বিপরীতে কনভেনশনাল কোম্পানীগুলোর দাবির হার শতকরা ৬০ ভাগ। একইভাবে কনভেনশনাল কোম্পানীগুলোতে গড় ব্যবস্থাপনা ব্যয় (ওভারহেড) ৩৫%, পক্ষান্তরে তাকাফুল কোম্পানীর এর পরিমাণ ২৫%। এর ফলে তাকাফুল কোম্পানীর আন্ডাররাইটিং লাভের পরিমাণ সংগৃহীত প্রিমিয়ামের ২০% হওয়া উচিত। কিন্তু কনভেনশনাল কোম্পানীগুলোতে এর পরিমাণ আনুমানিক ৫% মাত্র।

আমরা যদি এটাকে একটি ইসলামী (সাধারণ) তাকাফুল কোম্পানীর একটি আদর্শ (মডেল) হিসাবে ধরে নিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, এ পদ্ধতিতে কেবল কম খরচে বীমা কাভারই পাওয়া যাবে না বরং একই সাথে কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্থায়িত্বও নিশ্চিত হবে। অবশ্যই স্মরণ করা প্রয়োজন যে, বীমাকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হলো ঝুঁকির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। অব্যাহত আন্ডাররাইটিং বিপর্যয় কোম্পানীকে অস্থিতিশীল ও অস্বচ্ছল করে তুলবে। বলা বাহুল্য, আর্থিক স্বচ্ছলতা বীমাকারী ও বীমাকৃত উভয় পক্ষের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

উপরের উদাহরণ মোতাবেক উভয় প্রকার কোম্পানীর (কনভেনশনাল ও তাকাফুল) সকলপ্রকার বীমার জন্য বার্ষিক বিশ কোটি টাকা প্রিমিয়াম আদায় হলে কনভেনশনাল কোম্পানীর ক্ষেত্রে আন্ডাররাইটিং গেইন হবে এক কোটি টাকা কিন্তু তাকাফুল কোম্পানীতে তা আনুমানিক চার কোটি টাকা। কনভেনশনাল বীমা কোম্পানী অস্বাভাবিক লোকসান মোকাবেলায় উপরোক্ত উদ্বৃত্তের ৭০% পৃথক করে রাখলে রিজার্ভ হিসাবে এর জমা থাকে সত্তর লাখ টাকা মাত্র। কিন্তু তাকাফুল কোম্পানীর ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত রিজার্ভের পরিমাণ হবে ২ কোটি ৮০ লাখ টাকা অবশ্য যদি রিজার্ভের হার একই রাখা হয়। অবশিষ্ট ১ কোটি ২০ লাখ টাকা পলিসি হোল্ডার, শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা যাবে। উপযোগী আন্ডাররাইটিং রেজাল্ট-এর উপর ভিত্তি করে এখানে ইসলামিক তাকাফুল কোম্পানীর একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরা হলেও অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোম্পানীর আর্থিক সাফল্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল :

ক) কোম্পানীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও আদর্শের দৃঢ়তা
খ) দায় পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের স্থিতি।
গ) সম্পদের সুষ্ঠু বিনিয়োগ ও পর্যাপ্ত লাভের নিশ্চয়তা।
ঘ) কোম্পানীর জনবলের নৈতিকমান ও দক্ষতা।

এর সরল অর্থ এই যে, ইসলামিক তাকাফুল কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় শিক্ষিত দক্ষ ও পেশাদার লোক থাকতে হবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বের কোনো বিকল্প নেই। তাকাফুল কোম্পানীর ক্ষেত্রে নির্বাহী ও ব্যবস্থাপকদের অবশ্যই ইসলামী বীমা ব্যবস্থার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। আদর্শের সাথে পেশাদারী যোগ্যতার সমন্বয় হলে সর্বোত্তম ফল

www.pathagar.com

পাওয়া যাবে। বস্তুত: সনাতন বীমা ব্যবস্থার উপর তাকাফুল বীমা পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মীগণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন।

ইসলামী বীমা ব্যবস্থার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। জনগণের অর্থ কিভাবে লগ্নি করা হবে, কিভাবে মুনাফা বণ্টিত হবে, কোন ধরনের বীমার জন্য কত অর্থ "অনুদান" তহবিলে (তাবাররু) সঞ্চিত হবে। অনুদানের অর্থ হতে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করা হবে এর সব কিছুই স্পষ্ট করে গ্রাহকদেরকে বলে দেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় অস্পষ্টতার দায়ে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা কলুষিত হবে। ইসলাম মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা বা পদ্ধতি। এই বিশ্বাসকে সঠিকভাবে মানুষের মাঝে তুলে ধরবার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী বীমার মাধ্যমে। অতএব, ইসলামী বীমার সুফল সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা এবং এই সুফলকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার জন্য প্রয়োজন আন্তরিক উদ্যোগ, প্রচেষ্টা এবং নি:স্বার্থ সেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োগ পদ্ধতির উৎকর্ষতার কারণে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা মানব কল্যাণের একটি আদর্শ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যয়ী। ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় প্রকৃত সুফল পেতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত ও নিবেদিত জনবল। সেই সাথে সৎ ও সুন্দর সমাজ। যাদের জন্য বীমা সেবা প্রদান করা হবে, সেই সব সম্ভাব্য গ্রাহকদের মধ্যে সততা না থাকলে ইসলামী বীমার সুফল শতভাগ অর্জন হবে না। সর্বোপরি ইসলামী বীমা পরিচালনার জন্য উপযোগী আইন প্রণয়ন জরুরি।

---

www.pathagar.com

সাত.

জীবনবীমা ও ইসলাম

জীবনবীমা এমন একটি চুক্তি যার আওতায় বীমাকারী প্রতিষ্ঠান চুক্তির মেয়াদকালীন সময়ে বীমাগ্রহীতার মৃত্যুতে কিংবা নির্দিষ্ট সময় পরে তাকে বা তার নমিনিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। জীবনবীমার সার্বিক কার্যাবলী বোঝার জন্য এ বক্তব্য যথেষ্ট নয়। আমাদের জানা প্রয়োজন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বীমা কোম্পানীসমূহ ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। এই ব্যবস্থায় সার্বিক ক্ষতি অনুমান করার জন্য একই ধরনের উপাদান সম্বলিত একটি বিশাল গ্রুপকে একটি ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়। বীমার ক্ষেত্রে গড় হিসাব এবং বিশাল সংখ্যা (Law of large number) একটি নির্দেশিকাপূর্ণ বিষয়। বীমা বোঝার জন্য এই বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রিমিয়াম নির্ধারিত হয় সম্ভাব্য খরচের ও বিনিয়োগ আয়ের হিসাবের মাধ্যমে। ঝুঁকির পরিসংখ্যানগত অভিজ্ঞতার হিসাব থেকে বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারিত হয় বিশেষজ্ঞের দ্বারা। ফলে জীবনবীমা ব্যবস্থায় গ্রাহকের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

বীমার প্রধান কাজ হলো অনেকের মধ্য থেকে কয়েকজনের আর্থিক ক্ষতির সুষম বণ্টন। প্রতিটি পলিসিহোল্ডার বা বীমা গ্রাহক তার ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ একটি তহবিলে প্রদান করে। বীমাকারক (বীমা প্রতিষ্ঠান) এই তহবিল পরিচালনা করে এবং তা থেকে বীমাগ্রহীতাদের ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। বীমা কোম্পানীর মূল কাজ হচ্ছে ঝুঁকি নিরূপণ, তহবিলের ব্যবস্থাপনা, পলিসিহোল্ডারের ন্যায্য চাঁদা নিরূপণ ও দাবি পরিশোধের ব্যবস্থা করা।

সুস্থ ও স্বাভাবিক সুন্দর জীবন যাপনের জন্য জীবনবীমা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। জীবনবীমা গ্রাহকের উদ্বিগ্নতা দূর করে তার কার্যক্রম বাড়াতে সহায়তা করে। জীবনবীমা মানুষের অস্থিতিশীলতা রোধে সহায়তা করার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে ব্যবসায়িক ও পেশাগত উন্নতি ঘটাতেও সাহায্য করে। মানুষ তার কর্মক্ষমতাকে অধিকতর কল্যাণময়ী কাজে ব্যয় করুক এটাই জীবনবীমার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। যেহেতু জীবনবীমা ছাড়া জীবনের ঝুঁকিসমূহ নিরাপত্তাহীনতায় থাকে সেহেতু আধুনিক জীবনযাত্রায় যেসব ঝুঁকি বিদ্যমান তা থেকে উত্তরণের জন্য জীবনবীমা একটি সামাজিক প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

বীমা চুক্তির মূলনীতি

আইনগত চুক্তির মাধ্যমে বীমা কার্যকর হয় এবং চুক্তির সাধারণ নিয়মাবলী এতে পূরণ করতে হয়। তাই বীমা চুক্তি কোনমতেই সার্বজনীন নীতি বিরোধী হতে পারবে না। বীমা চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর চুক্তি সম্পাদনের আইনগত সামর্থ্য থাকতে হবে, পক্ষগুলোর উদ্দেশ্য পূরণ হতে হবে এবং আর্থিক সুবিধা সম্বলিত হতে হবে। বীমা চুক্তি বোঝার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনগত মৌলিক বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন বাণিজ্যিক চুক্তির অপরিহার্য শর্তাবলীর অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নের বিষয়গুলো বীমা চুক্তিতে বিবেচনা করতে হয়।

বীমাযোগ্য স্বার্থ

সকল বীমা চুক্তির একটি মৌলিক মূলনীতি হলো বীমাযোগ্য স্বার্থের নীতি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা সম্পদের ক্ষেত্রে তা বীমাগ্রহীতার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হলেই কেবল চুক্তি কার্যকর হবে। তার মানে ভবন তৈরিতে ব্যবহৃত ইট ও অন্যান্য সামগ্রী অগ্নি বীমার মূল বিষয় নয়। বীমার বিষয়বস্তু হলো ভবনটির সাথে মালিকের আইনগত স্বীকৃত সম্পর্ক, যেখানে ভবনটি আগুনে পুড়লে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। জীবনের ও সম্পদের বীমা চুক্তিতে এটি অপরিহার্য, অন্যথায় কেউ কোন ধরনের ক্ষতির মুখে না পড়েও ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। জীবনবীমার ক্ষেত্রে, বীমাযোগ্য স্বার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হলো যে কোন ব্যক্তির জীবনের উপর যে কেউ বীমা করতে পারে না। বীমাকে জুয়ায় পরিণত হওয়া থেকে রক্ষার জন্যও বীমাযোগ্য স্বার্থ নীতি প্রয়োজনীয়। আইন সুস্পষ্টভাবে বলে দেয় একজন গ্রাহক যে কোন মানুষের জীবনের ওপর বীমা করতে পারে না। বীমাযোগ্য স্বার্থ প্রমাণিত না হলে বীমা চুক্তি কার্যকর করা সম্ভব নয়। যে কোন মানুষের জীবনের উপর বীমা করা সম্ভব হলে বীমার টাকা পাওয়ার জন্য মানুষকে খুন করার প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। এমন এক সময় ছিল যখন যে কোন মানুষের জীবনের উপর যে কেউ বীমা করতে পারতো। বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে এখন বীমা চুক্তি বৈধ বলে গণ্য হয় না।

ক্ষতিপূরণের নীতি

ক্ষতিপূরণের নীতি হলো বীমাগ্রাহক কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, সেক্ষেত্রে সে তার প্রকৃত ক্ষতির চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করবে না। তবে এই নীতির প্রয়োগ শুধুমাত্র সম্পত্তি এবং দায় বীমা চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। জীবনবীমা, স্বাস্থ্যবীমা এবং ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা পলিসির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নীতি সম্পর্কিত নয়। (কারণ বীমাগ্রহীতার জীবনহানি কিংবা তার শারীরিক জখমের প্রকৃত ক্ষতিপূরণ অর্থ দিয়ে মেটানো সম্ভব নয়)। জীবনবীমার ক্ষেত্রে বীমা গ্রাহকের নমিনি বা উত্তরাধিকারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। জীবনবীমা মূলত একটি দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় পরিকল্পনা। মৃত্যু, অসুস্থতা

www.pathagar.com

কিংবা পঙ্গুত্বের কারণে যাদের মেয়াদ পর্যন্ত অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না জীবনবীমা চুক্তির আওতায় তাদের উত্তরাধিকারীদের আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়, ক্ষতিপূরণ নয়।

সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততার নীতি

এই নীতি বীমা চুক্তিতে সম্পৃক্ত পক্ষগুলোর মধ্যে উচ্চতর সততার মানদণ্ড আরোপ করে। প্রস্তাবকারী চুক্তি সম্পাদনের আগে প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে সে যা জানে বা যা তার জানা উচিত, তার সবই প্রকাশ করতে বাধ্য। এ ধরনের তথ্য প্রকাশে ব্যর্থতার কারণে চুক্তিটি বাতিল করা বা না করা বীমাকারকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, অসত্য বিবরণ ঝুঁকি সম্পর্কিত না হলে চুক্তি থেকে সরে যাওয়া হয় না। সাধারণভাবে এটাও ধরে নিতে হবে, যদি বীমাকারক চুক্তি এড়িয়ে যেতে চায় তবে অসত্য বিবরণ বীমাগ্রহীতাকে রক্ষা করতে পারে না। তবে চুক্তির শর্ত পূরণ না হলেও বীমাকারক স্বেচ্ছায় দাবি পূরণ করতে পারে। বীমাযোগ্য স্বার্থ বীমাকে জুয়া চুক্তিতে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য প্রয়োজন। যেহেতু বীমা একটি সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততার চুক্তি, বীমাকারক কিংবা বীমাগ্রহীতার পক্ষ থেকে অসত্য বিবরণ প্রদানের ফলে চুক্তিটি অবৈধ হয়ে পড়ে। তথ্যের গোপনীয়তাও একই ধরনের পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে। বীমাকারী যেহেতু ঝুঁকি গ্রহণ করেন সেহেতু বীমাকৃত জীবন বা সম্পদ যাই হোক না কেন সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য জানা না থাকলে চুক্তির শর্ত (প্রিমিয়াম নির্ধারণ) সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। এ কারণে সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততার নীতি পালন করা জরুরী।

বীমা ও জুয়া

সাধারণভাবে বীমাকে জুয়ার সাথে তুলনা করার প্রবণতা দেখা যায়, কিন্তু অর্থনৈতিক এবং আইনগত দৃষ্টিভঙ্গিতে জুয়া ও বীমা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়। এটা সত্য যে, বীমা কোম্পানী প্রিমিয়াম হিসেবে যা গ্রহণ করে বীমাগ্রহীতাকে তার চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক বেশি অর্থ প্রদান করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এটা একটা জুয়ার চুক্তি। বীমার প্রধানতম উদ্দেশ্য ঝুঁকি দূর করা, অন্যদিকে জুয়া নতুন ঝুঁকির সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'ক' ও 'খ' সম্মত হলো যে 'গ' এর সম্পত্তিতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে, 'ক' ১০০০.০০ টাকা দেবে 'খ'কে এবং যদি আগুন না লাগে তবে 'খ' ১০০.০০ টাকা দেবে 'ক'কে। এই চুক্তির আগে কোন পক্ষই এই সূত্র থেকে অর্থ প্রাপ্তি বা হারানোর মতো অবস্থায় ছিল না। যখন 'ক' ও 'খ' উপরিউক্ত সমঝোতায় আসলো, তখন প্রতিটি পক্ষই টাকা হারানোর ঝুঁকির মধ্যে এসে গেল। অধিকন্তু 'ক' বা 'খ' কোন পক্ষেরই 'গ'-এর সম্পত্তির উপর কোন বীমাযোগ্য স্বার্থ নেই। এর বিপরীতে যদি বীমা চুক্তি করা হয়, তবে শুধুমাত্র 'গ' ই তার সম্পদের ক্ষেত্রে অগ্নিবীমার সুবিধা গ্রহণ করতে পারে এবং নির্ধারিত প্রিমিয়ামের বিপরীতে ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে (সম্মত মূল্য পর্যন্ত) কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দেবে। এক্ষেত্রে 'গ' প্রিমিয়ামের আকারে সামান্য কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যয়ের

www.pathagar.com

বিনিময়ে বিরাট ক্ষতির অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা পাবে। 'গ' এর ক্ষেত্রে বীমা চুক্তি সম্পাদনের ফলে নতুন কোন ঝুঁকি সৃষ্টি হয়নি বরং বিদ্যমান ঝুঁকি নিরূপণের চেষ্টা নেয়া হয়েছে মাত্র। বীমার নীতিমালা অনুসরণ করে বাস্তবে 'ক', 'খ' কেউ 'গ' এর সম্পত্তির উপর বীমা করতে পারে না। অতএব লক্ষণীয় যে, বীমা জুয়া নয় বরং এটা নিখাদ ঝুঁকি দূর করার একটা পন্থা। নিখাদ ঝুঁকি ফটকামূলক ঝুঁকি থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। নিখাদ ঝুঁকি সেগুলোই, যেখানে শুধু ক্ষতির আশংকা থাকতে পারে লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ফটকামূলক ঝুঁকিতে ক্ষতির ভয় এবং লাভের আশা উভয়টাই থাকে। দৈনন্দিন ব্যবসার ঝুঁকি একটি ফটকামূলক ঝুঁকি। কিন্তু আগুনের ঝুঁকি একটি নিখাদ ঝুঁকি। বীমা শুধুমাত্র নিখাদ ঝুঁকি নিয়েই কাজ করে। ব্যবসায়িক ঝুঁকি নিরসনের জন্য অন্যান্য পদ্ধতি আছে।

যে কোন ব্যক্তির ঝুঁকি এককভাবে সবসময়েই অনিশ্চিত এবং সঠিকভাবে নিরূপণযোগ্য নয়। কিন্তু একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণীর ঝুঁকি বিপুল সংখ্যার নিয়ম (Low of large member) অনুসরণ করে ও অতীত ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে প্রায় সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়। অনিশ্চিত ঘটনাবলী থেকে সৃষ্ট ক্ষতি মোকাবেলার একটি মাধ্যম হলো বীমা। অবশ্য, সাধারণবীমার ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম বা বীমার মূল্য নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত ক্ষতিপূরণও বীমাকারী ও বীমাকারক উভয়ের কাছে জানা থাকে। তাই, সাধারণবীমার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার উপাদান বীমাযোগ্য ঝুঁকির ক্ষেত্রে ঘটনাটি ঘটা বা না ঘটার মধ্যেই শুধুমাত্র সম্পৃক্ত থাকে। কিন্তু জীবনবীমার ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণের ভিত্তিতে নয় বরং নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় নির্দিষ্ট সময়ের পরে কিংবা মৃত্যু বা দুর্ঘটনা জনিত আর্থিক ক্ষতির ক্ষেত্রে।

জীবনবীমার উদ্দেশ্য

অনেক কারণে মানবজীবনের অনেক মূল্য রয়েছে। আমরা এখানে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করবো। আমাদের জীবনে প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় পরিবারের কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির উপার্জন থেকে নির্ভরশীলরা যখন বঞ্চিত হন। কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা মারা গেলে প্রতিষ্ঠানটি তার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল গুরুত্বপূর্ণ খরিদ্দার হারানোর ফলেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৃত্যু ছাড়াও মানবজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন, স্বাস্থ্যহানির ফলে অসামর্থ্যের কারণে উপার্জন করতে না পারায় ও চিকিৎসা খাতে ব্যয়ের জন্য। বৃদ্ধ বয়সেও আরেকটি দুর্যোগপূর্ণ সময় যা মৃত্যু বা স্বাস্থ্যহানির মতো উপার্জনের সামর্থ্য নষ্ট করে। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের আয় করবার ক্ষমতা থাকে না কিন্তু মানুষ যতদিন বাঁচবে তার জীবন ধারণের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। যেহেতু মানবজীবনের বিশাল অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে, তাই জাতীয় অর্থনীতিতে জীবন বীমা ও স্বাস্থ্যের বীমার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক মাধ্যম হিসেবে জীবনবীমা এমন একটি পদ্ধতি যাতে

www.pathagar.com

একদল লোক সেই দলের সদস্যদের মৃত্যু বা স্বাস্থ্যহানির ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগ থেকে রক্ষার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা করতে পারে। তাই, জীবনবীমার উদ্দেশ্য হলো নির্ভরশীলদের জন্য সম্পদ বা সম্পত্তির ব্যবস্থা করা এবং সদস্যদের মৃত্যুর ক্ষেত্রেও সম্পদের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। জীবনবীমার দুটি লক্ষ্য ভালভাবে জানা দরকার। প্রথম লক্ষ্যকে 'সঞ্চয়ের প্রয়োজন' হিসেবে এবং দ্বিতীয়টিকে 'নিরাপত্তার প্রয়োজন' হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

জীবনবীমার মূল তত্ত্ব হলো যারা জীবনবীমার প্রিমিয়াম প্রদান করবে, তা তারা করবে এই সদিচ্ছা থেকে যে, তহবিলটি কোন সদস্যের যখনই মৃত্যু হোক না কেন, তার সহায়তা করবে। জীবন সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা এতো বেশি যে, কোন মানুষই বলতে পারে না, তার জীবন কতদিন স্থায়ী হবে। তাই প্রতিটি বিচক্ষণ ও বিবেচনাপ্রসূত মানুষ তার মৃত্যুর আগে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু অর্থ বা সম্পদের যোগান রেখে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন। জীবনবীমার মাধ্যমে একজন মানুষ এই মৌলিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণ করার মাধ্যমে তার সম্ভাব্য ঝুঁকি কমিয়ে আনতে পারে। শুধু নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে নয়, বরং নিজের বৃদ্ধ অবস্থায়, যখন আয়ের কোন সামর্থ্য থাকবে না তখন যেন অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে না হয়, সে জন্যও জীবনবীমা প্রয়োজন।

জীবনবীমার গাণিতিক ও আইনগত মূলনীতি

জীবনবীমার গাণিতিক হিসাবের বিষয়টি গণিতবিদদের কাজ। একজন গাণিতিক হিসাব বিশেষজ্ঞ বা গণিতবিদ মৃত্যু-সারণির সাহায্যে মৃত্যুর আশংকা ও জীবিত থাকার সম্ভাবনা হিসাব করতে পারেন। গাণিতিক হিসাব বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যতের লাভের হার অনুমান করে বর্তমান আর্থিক মূল্যায়ন নিরূপণ করেন। এর মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ধরনের জীবনবীমা পলিসির আওতায় ভবিষ্যতের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ণয় করে থাকেন। যদি এক বছরের মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি জানা যায় তবে বীমাকৃত অর্থ দ্বারা তাকে গুণ করে প্রয়োজনীয় নিট প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা যায়। মৃত্যুর প্রবণতা সবসময় জানার জন্য জীবনবীমা কোম্পানীগুলো অব্যাহতভাবে মৃত্যুহার তৈরী করে। ফলে প্রিমিয়াম হিসাবের যথাযথ নির্দেশিকা প্রদান করা সম্ভব হয় এবং প্রয়োজনীয় তহবিল যথাযথভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

যেহেতু, জীবনবীমা চুক্তি কোন ক্ষতিপূরণ চুক্তি নয় সেহেতু কোন ব্যক্তি প্রিমিয়ামের অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হলে যেকোন সর্বোচ্চ পরিমাণে তার জীবনের উপর বীমা করতে পারে। সেই সাথে তিনি অন্যের জীবনের উপরও জীবনবীমা করতে পারেন, তবে চুক্তি বলবৎ করার সময়ে বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে। জীবনবীমার ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতার আকস্মিক মৃত্যুর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি হোক বা না হোক কিংবা ক্ষতির পরিমাণ যাই হোক না কেন একটি চুক্তির শর্ত অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

অধিকন্তু, কোন ব্যক্তি যদি একাধিক পলিসি ক্রয় করেন, তবে প্রতিটি পলিসির অর্থ তাকে প্রদান করা হবে।

জীবনবীমায় বীমাযোগ্য স্বার্থের সাধারণ নীতিমালা হলো পলিসির প্রস্তাবক বা প্রিমিয়াম প্রদানকারী ব্যক্তির বীমাকৃত জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ অবশ্যই থাকবে। বর্তমানকালে বীমাযোগ্য স্বার্থকে আরও অনেক বিস্তৃত অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। স্বামী ও স্ত্রীর একে অন্যের জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে। একইভাবে ঋণদাতার ঋণগ্রহণকারীর জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে। আইনগত অধিকার বা জিম্মার স্বার্থ থাকা সাপেক্ষে জিম্মাদারেরও (যদি জিম্মাদলিল তা অনুমোদন করে) বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে। এ ছাড়া কোন ব্যবসায়িক অংশীদারের অপর সফল অংশীদারের জীবনের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে। কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বা বিশেষজ্ঞ বা তথাকথিত 'প্রধান কর্মচারিবৃন্দ'-এর জীবনের উপর সেই প্রতিষ্ঠানের বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন শুধু তার বীমাযোগ্য স্বার্থ আইন কর্তৃক স্বীকৃত।

সমাজের কল্যাণে ইসলামী নীতিমালা

ইসলামী মূল্যবোধ সুনির্দিষ্টভাবে ভিক্ষাবৃত্তি এবং অন্যের শ্রমে জীবন নির্বাহের বিরোধী। ইসলামে মানুষের অর্থনৈতিক উদ্যোগ প্রশংসিত হয় এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়া নিন্দনীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলাম নারী ও পুরুষের জাগতিক বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শরীয়াহ আমাদের জীবন পরিচালনার জন্য সম্পদ অর্জনের ও বণ্টনের নীতিমালা দিয়েছে। ইসলামে প্রতিটি মুসলমানের উপর বিপদের সময় তার অন্য মুসলমান ভাইকে সহযোগিতা প্রদান করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব সময়েই নৈতিক ও দায়-দায়িত্ববোধের সৃষ্টি করা। ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয় বরং তা মানুষের সামাজিক বন্ধনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে। ইতিহাস থেকে আমরা জানি, মক্কা থেকে হিজরতকারীদেরকে মদিনাবাসীরা ভাই-বোন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তারা স্বেচ্ছায় এবং আনন্দিতভাবে তাদের সমস্ত সম্পত্তি মক্কাবাসীদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিল। এ ধরনের সম্পর্ক কোন ধরনের সুবিধা পাওয়ার জন্য বা লাভের আশায় কিংবা বিনিময়ে কোন প্রতিশ্রুতির কারণে হয়নি। এটা স্রেফ একটি অভিন্ন বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য, প্রতিশ্রুতি এবং আত্মনিয়োগের কারণে হয়েছিল। আদর্শিক বন্ধনের ভিত্তিতে বণ্টনের নতুন নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত হলো। মুসলমানরা চূড়ান্ত সত্য হিসেবে যা বিশ্বাস করে তার জন্য অত্যন্ত সন্তোষের সাথে একে অন্যকে সহযোগিতার জন্য এবং সম্পদ ও জীবনদানের জন্য এগিয়ে আসল। কিন্তু বর্তমানকালে ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত সমাজের অনুপস্থিতির ফলে ইসলামী জীবনব্যবস্থা বিকশিত হচ্ছে না। ফলে আমরা সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠতে দেখি না।

www.pathagar.com

কুরআনে মহানবীর (সাঃ) মিশনকে সকল মানুষের জন্য নেয়ামত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই নেয়ামতের কিছু কিছু বিষয় কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

ক) সমাজে উন্নত জীবন ও কল্যাণকামিতার বিকাশ,
খ) সহমর্মিতার মাধ্যমে পরস্পরের দুর্দশা লাঘব,
গ) বৈধভাবে সম্পদ অর্জন ও সমৃদ্ধির প্রচেষ্টা,
ঘ) ভালবাসা, সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ,
ঙ) ক্ষুধা, ভীতি ও উদ্বেগ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা।

ইসলামী সমাজ যদি উপরে বর্ণিত নীতিমালার বাস্তবায়ন করা হয় তবে রাষ্ট্রের আওতাধীন সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান মানুষের কল্যাণের পৃষ্ঠপোষক হবে। ইসলাম মানবজাতিকে একটি পরিবার মনে করে। এই পরিবারের সকল সদস্য আল্লাহর চোখে সমান। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, উঁচু ও নীচুর মধ্যে বা সাদা ও কালোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। গোত্র, বর্ণ বা অবস্থানের কারণে কোন বৈষম্য হবে না। মানুষের মূল্যায়নের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হবে ইসলাম ও মানবতার প্রতি তার সেবা, দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ়তা। যেহেতু ইসলাম সামাজিক সুব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করে এবং মানুষের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি সুসংগঠিত সমাজের কর্মসূচিপূর্ণ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে তাই এখানে বেকারত্ব ও পেশাগত দুর্ভোগ, বৃদ্ধ বয়সের পেনশন ও বাঁচার সুবিধার জন্য বীমা ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত। ইসলামী সমাজে শারীরিক অক্ষমতা বা মানসিক দুর্বলতা বা বয়োঃবৃদ্ধতার কারণে অসমর্থদের তাদের নিজের প্রয়াসে জীবনযাপনের সম্মানজনক অবস্থায় থাকার প্রতি সমর্থন দেয়া উচিত। মানুষের জাগতিক কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জীবন ধারণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা ইসলামী কাঠামোতে রয়েছে। ব্যক্তির বস্তুগত প্রয়োজন এবং সেগুলো মেটানোর ব্যাপারে কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্যে এতো ব্যাপকভাবে তাগিদ রয়েছে যে, সেগুলোর উল্লেখ্য আলোচনার কলেবর বেড়ে যাবে। ইসলামী ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম জ্ঞান রয়েছে তাদের নিকট নতুন করে বিষয়টি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের কল্যাণে ইসলামের নীতিমালার প্রয়োগ আমাদের জীবনে কত বেশী প্রয়োজন তা বাড়িয়ে বলার অবকাশ নেই।

যদিও একজন ব্যক্তির নিজের উপর নির্ভরশীল থাকা এবং সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো অপরিহার্য দায়িত্ব, কিন্তু নানাবিধ কারণে সবসময় স্বাভাবিকভাবে তা সম্ভব হয় না। ব্যক্তি যদি তার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় সে ক্ষেত্রে সবসময় তার কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়াও সম্ভব হয় না। তাই শরীয়াহ'র উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। অধিকন্তু, রাষ্ট্র বা জনস্বার্থ সম্পর্কিত সংস্থাগুলো আকস্মিক মৃত্যু, স্বাস্থ্যহানি, বৃদ্ধকালীন নির্ভরশীলতা, বেকারত্ব ইত্যাদি সমস্যায় এগিয়ে না আসলে

www.pathagar.com

সমাজের সকল সদস্যের প্রতি সমান আচরণ ও ভ্রাতৃত্ববোধের ইসলামী নীতিমালা অর্থহীন হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এর অতি সাধারণ কারণ, প্রিমিয়াম প্রদানে অসমর্থ্য ব্যক্তির অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান বেসরকারি উদ্যোগে সব সময় করা যায় না। এটা সত্যি যে, যারা প্রিমিয়াম দিতে পারে না, তাদেরই অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা থেকে নিরাপত্তা দেয়ার প্রয়োজন বেশি। বীমার পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে এসব ব্যক্তিবর্গ কোন নিরাপত্তা পায় না। তাই সামাজিক বীমার প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে সামাজিক বীমার প্রচলন থাকলেও মুসলিম দেশসমূহে সামাজিক বীমার অনুপস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক। যদিও ইসলামের প্রথম যুগে "বায়তুল মাল" হতে দুঃস্থদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা চালু ছিল।

সামাজিক বীমা

পৃথিবীর অনেক দেশে বেসরকারী বীমা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগে সামাজিক বীমার প্রচলন করা হয়েছে। সামাজিক বীমার সাথে বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বীমা পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্যের বিষয়টি প্রথমে আলোচনা করা যেতে পারে। সামাজিক বীমায় সকল বীমা গ্রহীতাকে সমান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বেসরকারি বীমার ক্ষেত্রে অবশ্য এটা প্রযোজ্য নয়। বেসরকারি বীমায়, যে কেউ যে কোন পরিমাণের বীমা করতে পারে, কিন্তু সামাজিক বীমার আওতায় নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তি একই ধরনের সুবিধা সূচিতে থাকে। সামাজিক বীমার একটি মৌলিক নীতিমালা হলো, উপার্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে এমন দুর্ভোগের বিপরীতে ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। বেসরকারি বীমাকারকরা অনেক ক্ষেত্রে বীমার সেবা প্রদান করতে পারে না ফলে সেগুলো অবশ্যই কোন না কোন সামাজিক স্কীমের আওতায় সমাধান করার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বীমাযোগ্য ঝুঁকির একটি মৌলিক প্রয়োজন হলো প্রিমিয়ামের হিসাবের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্ভাবনা নিরূপণ। যেখানে এই অবস্থা বিরাজ করে না, সেখানে বেসরকারি বীমাকারকরা মারাত্মক প্রতিবন্ধকতায় থাকে এবং সেক্ষেত্রে সামাজিক বীমাই একমাত্র সমাধান। একারণেই সামাজিক বীমায় পুরো সমাজ বীমা গ্রহণকারী গ্রুপকে ভর্তুকি দেবে বলে আশা করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক বীমার ক্ষেত্রে বীমা গ্রহণকারীকে আংশিক প্রিমিয়াম দিতে হয়, কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় প্রিমিয়াম দিতে হয় না।

সামাজিক বীমার প্রয়োজন এমন যে সর্বোচ্চ ধরনের মুক্ত অর্থনীতিতেও সরকার অনেক ধরনের সামাজিক বীমার স্কীম গ্রহণ করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বয়স্ক বীমা, অক্ষমতা বীমা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। সেখানে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বীমা, বেকারত্ব বীমা ইত্যাদি চালু রয়েছে। ইংল্যান্ডে রাষ্ট্র সামাজিক বীমার একটি পদ্ধতি চালু

www.pathagar.com

রয়েছে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে মৃত্যু সুবিধা, অবসরগ্রহণ সুবিধা, বেকারত্ব সুবিধা ইত্যাদি। তবে এসব স্কীম সার্বজনীন নয়। যারা এইসব স্কীমে চাঁদা দেয়, কেবল তারাই সুবিধা পায়। সামাজিক বীমার প্রয়োজনীয়তা সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোকদের জন্য অনেক বেশি। কিন্তু দরিদ্র দেশের সরকারের পক্ষে তা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না ভর্তুকির ব্যবস্থা না করতে পারার কারণে। সদিচ্ছা ও উদ্যোগের অভাবও এর জন্য দায়ী। সামাজিক বীমার প্রচলনে যেহেতু ভর্তুকির প্রয়োজন, সেহেতু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যতিরেকে তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

জীবনবীমা এবং সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা

জীবনবীমা পদ্ধতি একটি নিয়মিত, ধারাবাহিক সঞ্চয় পরিকল্পনা। বাধ্যতামূলক নিয়মিত সঞ্চয় পরিকল্পনার জন্য অনেক সঞ্চয়কারীর মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন পূরণের সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর ফলে প্রিমিয়াম প্রদানের সময় অন্য যে কোন বিলের মতোই এনুইটি বিবেচনা করতে হয় এবং কমবেশি স্বেচ্ছায় তা প্রদান করতে হয়। এনুইটি (Annuity) চুক্তিও সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লাইফ এনুইটি ব্যবস্থা জীবনবীমার একটি পদ্ধতি। একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, আজীবন বীমা 'খুব দ্রুত মারা যাওয়ার' বিপরীতে একটি বীমা এবং এনুইটি 'খুব বেশিদিন বাঁচার' বিপরীতে একটি বীমা। চাকুরী, পেশা বা জীবিকা হতে অবসরগ্রহণের পর কতদিন একজন মানুষ জীবিত থাকবে তা কেউ জানে না। তাই অনেকের জন্যই এনুইটি ক্রয় অতি প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এনুইটির আওতায় বীমাকারী একটি বড় সঞ্চয়ের বিপরীতে একটি অপেক্ষাকৃত কম অথচ নিশ্চিত আয় নিয়মিতভাবে পেয়ে তাকে। কোন ব্যক্তি যখন এনুইটি ক্রয় করে, সে তখন এ ব্যাপারে সম্মত হয় যে, তার সম্পদের একটি অংশ দীর্ঘদিন জীবিত থাকার জন্য ব্যবহৃত হবে। বিনিময়ে তিনি যদি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন, তবে যারা আগে মারা যাবে, তাদের অংশ থেকে তিনি অর্থ পাবেন। জীবনবীমায় বীমা গ্রাহককে কিস্তিতে টাকা দিতে হয় ভবিষ্যতে থোক মোটা অংকের অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার কারণে। কিন্তু এনুইটির ক্ষেত্রে থোক মোটা অংকের অর্থের বিপরীত বৃদ্ধ বয়সে আমৃত্যু নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা হয়। সঞ্চয়ের পদ্ধতি হিসেবে জীবনবীমা ও এনুইটি চুক্তির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কিছুটা সমালোচনা করা হয়। কারণ এর চেয়েও উন্নত সঞ্চয়ের পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। এর আরেকটি সমালোচনা হলো, অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হলে এটি আরো দ্রুততার সাথে সঞ্চয়ের মূল্য শেষ করে ফেলে। এটা সঠিকভাবেই বলা হয়ে থাকে যে, সময়ের ব্যাপ্তিতে গড় মূল্য বৃদ্ধি, আয়ের গড় থেকে দ্রুততর বাড়ে এবং সঞ্চিত অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়।

www.pathagar.com

এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য অনেক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছেন যে, জীবনবীমা পলিসিতে অভিহিত পরিমাণ (Face Amount) ও নগদ মূল্যে (Cash Value) স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা উচিত যাতে অর্থের ক্রয় ক্ষমতার অবমূল্যায়নের বার্ষিক অনুমিত হারটির প্রতিফলন ঘটে। অবশ্য এ ধরনের বীমা সাধারণভাবে পাওয়া যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো সে ধরনের পলিসি বাজারজাত করতে সক্ষম হয় না। সমস্যাটি মোকাবেলার আরেকটি বিকল্প পদ্ধতি হলো 'ভেরিয়েবল এনুইটি'র সাহায্য নেয়া। এই পদ্ধতিতে অবসর ভাতা প্রদান করা হয় যা হয় পরিবর্তিত পরিমাণে এবং নির্দিষ্ট ক্রয় ক্ষমতায়। এখানে ভেরিয়েবল এনুইটি পদ্ধতির কার্যক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায়। এই পদ্ধতিতে কোন গ্রাহক বীমাকারকের একাউন্টে ইকুইটি ও সিকিউরিটির মাধ্যমে তহবিল সঞ্চিত করতে পারে। এই পদ্ধতির মৌলিকত্ব হলো যদি সঞ্চয়ের মেয়াদে সাধারণ মূল্য বৃদ্ধি পায় তবে সঞ্চয়ের মূল্যও বাড়বে, ফলে ক্রয়ক্ষমতা সুষমভাবে একই পর্যায়ে থাকবে। এটা ধারণা করা হয়, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে স্টকের মূল্য প্রায় নিখুঁতভাবে ভোক্তার মূল্যসূচকের বৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করা সম্ভব। পৃথিবীর অনেক দেশেই তাই এমন বিনিয়োগের সাথে সংযুক্ত করে বীমা পলিসি বিক্রয় করা হচ্ছে।

বীমাকারী সঞ্চিত তহবিল ১০, ১০০ ইত্যাদি যেকোন সমঝোতামূলক পরিমাণসূচক ইউনিটে প্রকাশ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ৪০,০০০ টাকার স্টক মূল্য প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৪০০ ইউনিটে প্রকাশ করা যায়। অবশ্য, সিকিউরিটির বিদ্যমান মূল্যের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি ইউনিটের মূল্য প্রতিবছর পুনঃহিসাব করা হয় এবং এনুইটিকারীকে তাদের মূল্যের ভিত্তিতে পরিশোধ করা হয়। এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হলো এটা ধারণা করে নেয়া হয় যে, স্টক মার্কেট প্রায় নিখুঁতভাবে ভোক্তা মূল্য পরিবর্তনের বিষয়টি প্রতিফলিত করে থাকে। কিন্তু সকল পরিস্থিতিতে তা সত্য নাও হতে পারে। বস্তুত, ক্রয়ক্ষমতা পরিবর্তন পরিমাপে স্টক মার্কেট একটি ত্রুটিপূর্ণ মাধ্যম। অনেক সময়ে এনুইটি'র মূল্য বাজারের প্রকৃত পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। এটাও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে যে, যদি অবসরগ্রহণের সময়ে স্টক মার্কেটে মারাত্মক ধ্বস নামে, তবে অবসরগ্রহণের সময়ে তিনি কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে অর্থ পাবেন না এবং বেশ বড় অংকের ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। অধিকন্তু এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে, ভেরিয়েবল এনুইটির সকল বীমাকারী সন্তোষজনক বিনিয়োগ ফলাফল সংগ্রহে সামর্থ হবে যদি সাধারণ স্টক মার্কেট সূচকে উর্দ্ধগতি থাকে। ভেরিয়েবল এনুইটি বা ইনভেস্টমেন্ট লিংকড পলিসি এখন পর্যন্ত সনাতন জীবনবীমার একটি ব্যবস্থা হিসেবেই পরিচিত। এই প্রেক্ষাপটে অবশ্যই মুদারাবা ভিত্তিক ইসলামী বীমার সঞ্চয় পরিকল্পনাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। তার পূর্বে জীবনবীমা সম্পর্কে ইসলামী শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের মতামত জানা যেতে পারে।

www.pathagar.com

জীবনবীমা সম্পর্কিত পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি

জীবনবীমা সম্পর্কে মুসলিম আইনবেত্তাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কেউ কেউ সনাতন জীবনবীমার ব্যাপারে আপত্তি করেন, আবার অনেকে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে একে ইসলামে অনুমোদনযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

সনাতন বা প্রচলিত জীবনবীমার বিরুদ্ধে যুক্তিগুলো হচ্ছে-

ক) কোন ব্যক্তি মাত্র কিছু টাকা দেয়ার পর সে মারা গেল তার উত্তরাধিকারী বা নমিনীর পক্ষে বীমা অংকের পুরো টাকার মালিক হওয়ার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। এটা জুয়ার মধ্যে শামিল বলে অনেকে মনে করেন।

খ) জীবনবীমা ব্যবস্থায় সুদের সম্পৃক্ততা রয়েছে, কারণ বীমার মাধ্যমে জমাকৃত অর্থ বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহ সুদ ভিত্তিক বিনিয়োগ করতে পারে।

গ) জীবনবীমা এমন কিছুর জন্য অর্থ প্রদান করে যার মূল্য নির্ধারণ করা বা ক্ষতিপূরণ করা যায় না। মানুষের জীবনকে আর্থিক মানদণ্ডে পরিমাপ করা অর্থহীন ও অন্যায়।

ঘ) একজন মুসলমান হিসেবে জীবনবীমায় বিশ্বাসী হওয়া মানানসই নয়, কারণ এর মাধ্যমে তার উত্তরাধিকারীদের পালন করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আল্লাহ একমাত্র পালনকর্তা। মুসলমানদের উচিত আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া।

ঙ) পলিসির অর্থ নমিনীকে প্রদান করা হয়। এটা ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের লংঘন।

জীবনবীমার পক্ষে যুক্তি

ক) সকল ধরনের বীমা একদল লোকের সহযোগিতার উদাহরণ এবং তা সমাজের জন্য সহায়ক। জীবনবীমা ব্যক্তির জন্য উপকারি এবং সাথীদের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। বীমার মূলনীতিমালার সাথে ইসলামী চিন্তা চেতনার কোন বৈপরিত্য নেই।

খ) জীবনবীমা সংস্থা সুদের উপাদান ছাড়াই পরিচালিত ও সংগঠিত হতে পারে। কেননা সুদের বিকল্প হিসেবে অংশীদারিত্বের পদ্ধতি ইসলামে অনুমোদিত।

গ) ইসলামের ইতিহাসে 'রক্ত মূল্য' প্রদানের মাধ্যমে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের নজির আছে তাই মানুষের জীবনের মূল্য সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে পরিমাপ করা যেতে পারে।

ঘ) জীবনবীমা স্কীমের মাধ্যমে বীমাগ্রহীতা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয়ের লক্ষ্যে কোন বীমা কোম্পানীতে অর্থ জমা রাখে। এই স্কীমের মাধ্যমে

www.pathagar.com

কোম্পানী বীমাগ্রাহকের মৃত্যুর কারণে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত না হলেও একটি সাধারণ তহবিল হতে তা পুষিয়ে দেয়। এটা আল্লাহর পরিবর্তে বীমার উপর ভরসা করার কোন ব্যাপার নয় বরং এটি পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা মানুষের দুঃখ-কষ্ট ঘোচানোর একটি ব্যবস্থা।

ঙ) বীমার নমিনি নিয়োগ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং তাকে ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়।

পারস্পরিক সাংঘর্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি বিবেচনা করে, দীর্ঘদিন ধরে এটা অনুভূত হয়েছে যে, আলেমদের মধ্যকার বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদগণ এবং অর্থনীতিবিদগণ সমস্যাটি গভীরভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছবেন। অন্যথায় জনগণ বিভক্ত ও সিদ্ধান্তহীনতায় থাকবে। যদিও এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি, তারপরও অধুনা বিশ্বের অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ প্রচলিত বীমার বিপরীতে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক বিকল্প জীবনবীমার পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের মতে, বীমা পলিসির যে প্রিমিয়াম প্রদান করা হয় তা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য মুদারাবা নীতিমালা অনুযায়ী বিনিয়োগ করতে হবে এবং বীমা সংস্থাকে পারস্পরিক বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অতএব পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে মুদারাবার ভিত্তিতে জীবনবীমার স্কীম চালু করা হয়েছে। শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলোও পরিহার করা হয়েছে তাকাফুল বা ইসলামী বীমা ব্যবস্থায়।

ইসলামী জীবনবীমা পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা (বীমাগ্রাহক) স্বেচ্ছায় মুদারাবা ভিত্তিতে কোন সঞ্চয় পরিকল্পনা স্কীমে যোগ দিতে পারেন। এই পরিকল্পনায় প্রতিটি সদস্য একটি সাধারণ তহবিলে চাঁদা দেবেন। সংগৃহীত তহবিল ও অনুদান তহবিল ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিনিয়োগ করা হবে। এই বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভ প্রদেয় চাঁদা অনুযায়ী ব্যক্তির একাউন্টে যোগ হবে। আর ক্ষতি হলে সেটাও সদস্যরা বহন করবে। সকল সদস্যের অনুদানে একটি অনুদান তহবিল গঠনের ব্যাপারে আগেই সমঝোতা হবে। মৃত্যু ও অক্ষমতার জন্য সদস্যরা সাধারণ অনুদান তহবিল থেকে সহায়তা পাবে। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন বয়স গ্রুপের জন্য (সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সময়ে) আলাদা আলাদাভাবে অনুদান তহবিলে চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। শুধুমাত্র স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিদের অংশগ্রহণকারী সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

যদিও সনাতন জীবনবীমা ব্যবস্থা সম্পদ সংগ্রহের একটি পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে কিন্তু বীমাগ্রহীতা বীমা কোম্পানীর সাথে লাভ ও ক্ষতির অংশীদারিত্বে কোন ধরনের পারস্পরিক চুক্তিতে পৌঁছে না। পশ্চিমা বীমা পদ্ধতিতে পারস্পরিক সহযোগিতার ধারণাটি অনুপস্থিত। পশ্চিমা বীমাব্যবস্থায় একজন বীমাগ্রহীতা কোন লাভ দাবি করতে পারে না। ইসলামী পদ্ধতির আসল লক্ষ্য ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া নয়, বরং সম্পদের

www.pathagar.com

ন্যায়ানুগ বণ্টন। নির্দিষ্ট স্কীমের আওতাধীনে অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ প্রকৃত অর্থে একটি সঞ্চয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগকারী, যেখানে সদস্যরা জীবনের নির্দিষ্ট কতিপয় দুর্যোগের সময়ে পারস্পরিক সহায়তার লক্ষ্যে ও নিরাপত্তার জন্য তাদের সম্পদের বণ্টন করেন। অর্থাৎ যাদের পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা হয় সবার নিকট থেকে সংগৃহীত অনুদান তহবিল থেকে।

সাম্প্রতিক অগ্রগতি

ভারতীয় আইনজ্ঞ ড: মো: মোসলেহউদ্দিন বিগত শতকের ষাট দশকে ইসলামী আইনের আলোকে আধুনিক বীমার একটি সতর্ক এবং বস্তুনিষ্ঠ সমীক্ষা পরিচালনা করেন। তার সমীক্ষা ও গবেষণার ফলাফল তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে থিসিস আকারে উপস্থাপন করেন। থিসিসটি গৃহীত হয় এবং ১৯৬৬ সালে তাকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া হয়। ড: মোসলেহউদ্দিন তার গবেষণার উপসংহার টানেন এই বলে যে, পারস্পরিক সহযোগিতা বীমা ইসলামে অনুমোদনযোগ্য। পাকিস্তানের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড: নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ১৯৭০ দশকের শুরুতে কুরআন ও সুন্নাহ এবং শরীয়াহর বিস্তৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে ইসলামে বীমার বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, বীমা ও জুয়া একটি অন্যটি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন এবং ইসলাম সহজাতভাবেই নির্ভরযোগ্য ঝুঁকি পূরণের ধারণার বিরোধী নয়। তার মতে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা নির্দিষ্ট কিছু দুর্বলতায় ভুগছে। তবে সেগুলো নীতিমালা এবং অনুশীলনের জন্য অপরিহার্য অংশ নয়। তাই ইসলামী শরীয়াহর আলোকে একটি নতুন ধরনের বীমা ব্যবস্থা বিকশিত করা যায়।

গত তিন দশকে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন গ্রুপ ও ব্যক্তি ইসলামী বীমার প্রয়োগিক দিক নিয়ে গবেষণা করেছেন। বিষয়টি নিয়ে মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ইকোনমিক সোসাইটি ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে সেমিনারের আয়োজন করে। ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা এ বিষয়ে ১৯৮৭ সালে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে এই প্রবন্ধের লেখক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। নব্বইয়ের দশকে এবং বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশে ইসলামী জীবন বীমার বিভিন্ন মডেল নিয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও পর্যালোচনা হচ্ছে। মুসলিম আইনবেত্তাগণ সনাতন বীমার কার্যক্রম প্রশ্নে ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা পরিচালনা করেন। এসব সমীক্ষার ফলে সাধারণভাবে মুসলিম আইনবেত্তাগণের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বর্তমান ধারায় প্রচলিত বীমার কার্যক্রম শরীয়াহ্ নিয়ম ও বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই, মুসলিম বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদগণ ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা চালিয়ে ইসলামী বিধিবিধান কঠোরভাবে মেনে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী বীমার নীতিমালা প্রণয়ন করেন। ইসলামী বীমার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে 'আত-

www.pathagar.com

তাকাফুল' যার অর্থ যৌথ নিশ্চয়তা'। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও সহায়তার উপর তাকাফুল ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে উঠেছে। আধুনিক বীমার অভিধানে একে পারস্পরিক ঝুঁকির বীমা হিসেবে অভিহিত করা যায়।

বর্তমানে অনেকগুলো ইসলামী বীমা সংস্থা তাকাফুল স্কীম প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলামী শরীয়াহর বিধান অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে খার্তুমে প্রথম ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিশ্বে অন্তত ষাটটি ইসলামী বীমা কোম্পানী কাজ করছে এবং আরও অনেকগুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে রয়েছে। তাই বলা যায়, বিগত কয়েক দশকে এই ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এজন্য, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে বীমা অনুমোদনযোগ্য কিনা তা তেমন প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। বর্তমানে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ইসলামী বীমা ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়ন। বস্তুত ইসলামী বীমার বিশেষ করে ইসলামী জীবনবীমার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ও ইসলামী অর্থনীতি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কেননা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ ইসলামী বীমা ব্যবস্থার প্রতি অধিক পরিমাণে আগ্রহী হচ্ছেন। জনগণের অংশগ্রহণ ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হচ্ছে।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোকে ইসলামী জীবনবীমা

পশ্চিমা বীমাব্যবস্থা কেন ইসলামী নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা বোঝার জন্য ইসলামী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক দর্শন ও নীতিমালা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা জরুরি। পুঁজিবাদী মুক্তবাজার বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশে বিরাজমান এবং ইসলামী আদর্শ ও নীতির আংশিক প্রয়োগ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধন করে না। ইসলামী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক দর্শন ও নীতিমালার সারমর্ম নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

১. আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা এবং সকল মানুষ সমান। অর্থনীতিতে এর মানে দাঁড়ায় সমতা এবং সহযোগিতা। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের নীতিমালায় 'তৌহিদ' একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ইসলামী দর্শনের ভিত্তিতে তাকাফুল বা ইসলামী বীমা ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পদের ন্যায়ানুগ বণ্টনের ব্যবস্থা ইসলামী জীবনবীমার মাধ্যমে করা সম্ভব।

২. রিবা ইসলামে নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা মৌলিকভাবে আয়ের মালিকানা এবং বণ্টনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। রিবা বিনিয়োগের একটি চুক্তি যা মূলধন ভাড়া বাবদে প্রদেয় হয়। সুদের বিকল্প হিসেবে মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বীমাগ্রাহকদের কিস্তির অর্থ মুদারাবা চুক্তি অনুসারে বিনিয়োগ ও বণ্টন করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

৩. ইসলামী সমাজে আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নয়। ব্যক্তি বা গ্রুপের সকল দাবিই মানবিকতার সীমাবদ্ধতার মধ্যেই করতে হবে। পুঁজি, ভূমি, শ্রম, সংগঠন যা কিছুই উদ্যোগের বিভিন্ন উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা সকলই আল্লাহর সৃষ্ট। তাই, সমাজের সব সদস্যই এগুলোর মাধ্যমে সমানভাবে সুবিধা পাবে। এটি ইসলামের মৌলনীতি। এ নীতিমালার সফল বাস্তবায়নের ভিত্তিতেই ইসলামী বীমা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব।

৪. ইসলামে শেয়ারহোল্ডিং পদ্ধতি স্বীকৃত। শেয়ারহোল্ডিং ব্যক্তি এবং ব্যাপক অর্থে সমাজের কল্যাণে মূলধনের উৎসাহব্যঞ্জক গতিশীলতার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শেয়ারহোল্ডিং-এর মাধ্যমে কাউকে তার ন্যায্য পাওনার বেশি লাভের দাবিকে অনুমোদন করে না। অতএব, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শেয়ার মালিকগণ বীমাকারী হিসেবে মুদারাবা পদ্ধতিতে বীমা ব্যবসা করতে পারেন। ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় উদ্যোক্তাদের পুঁজি ও বীমায় অংশগ্রহণকারীদের সঞ্চয় একীভূত করা হয় না।

৫. ইসলামে আল-গারার অর্থাৎ সন্দেহজনক ও ফটকাবাজির লেনদেন নিষিদ্ধ। সুযোগসন্ধানী ফটকাবাজারির কোন স্থান নেই ইসলামে। পণ্য ও সেবার বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বাজার ব্যবহৃত হওয়া উচিত এবং সুযোগ গ্রহণ ও ঝুঁকি সৃষ্টির জন্য নয়। ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গারার-এর বিলোপ সাধন করা হয়।

৬. সমাজের কেউ বিপদাপন্ন হয়ে পড়লে এবং এর সদস্যদের প্রয়োজন পূরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, পুনঃবণ্টন প্রক্রিয়ায় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত। ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় সাধারণ অনুদান তহবিল সৃষ্টি করে সম্পদের পুনঃবণ্টন করা হয়।

৭. অর্থনীতিতে যাকাত ব্যবস্থার প্রচলন অতীব জরুরি। যার অর্থ ধনী লোকের সম্পদ ও ধনে নিঃস্বদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমাজের অভাবী, বঞ্চিত ও দুর্বল লোকদের কল্যাণের জন্য ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে যাকাত ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান যাকাত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তন করতে পারে। এভাবে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলো তাকাফুল ব্যবস্থায় প্রয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পুঁজিবাদী বীমা ব্যবস্থা ইসলামে অনুমোদনযোগ্য নয়। তবে বীমার মূল নীতিমালা তথা ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া, আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, অনিশ্চয়তা কাটানো ইত্যাদি অনৈসলামিক নয়। বীমার মূল নীতিমালা অনুযায়ী ইসলামী শরীয়ার আলোকে একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের কোন সদস্যের ক্ষতির বিপরীতে একটি যৌথ

www.pathagar.com

নিশ্চয়তার পদ্ধতি হিসেবে ইসলামী বীমাকে বিবেচনা করা হয়। গ্রুপের সদস্যরা যৌথভাবে একমত হয়, তাদের কেউ কোন অনিশ্চয়তায় পতিত হলে, সে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ পাবে। এর অর্থ গ্রুপের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা। এটাই 'তাকাফুলের' ধারণা যা গ্রুপের সদস্যদের দুর্যোগ, দুর্ভোগের সময়ে দায়-দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়ার এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহায়তার নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী বীমার অন্তর্নিহিত বিষয় হচ্ছে মানব কল্যাণ এবং আদর্শিক চিন্তার বাস্তবায়ন।

এই প্রেক্ষাপটে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন।

ইসলামী বীমা কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য

ইসলামী বীমা কোম্পানীর নিম্নলিখিত বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন ঃ

১. উদ্বৃত্ত/লাভে পলিসিহোল্ডারদের অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে।

২. কি হারে লাভের বণ্টন করা হবে তা চুক্তির সময় বলে দিতে হবে।

৩. কোম্পানীর পরিচালনা পরিষদে পলিসিহোল্ডারদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে। তবে মুদারাবা ভিত্তিতে পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক নয়।

৪. কোম্পানী এমন সব খাতে তার তহবিল বিনিয়োগ করবে যা ইসলামে নিষিদ্ধ নয় এবং তাতে ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ ঘোষিত রিবার কোন ধরনের সম্পৃক্ততা থাকতে পারবে না।

৫. ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীর দুটি পৃথক এবং ভিন্ন একাউন্ট থাকবে। একটির পরিচিতি হবে পলিসিহোল্ডারদের একাউন্ট এবং অপরটির শেয়ারহোল্ডারদের একাউন্ট। পলিসিহোল্ডারদের একাউন্টে পলিসিহোল্ডারদের চাঁদা বা চাঁদার অংশ তহবিলের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ নির্দিষ্ট হার অনুপাতে জমা হবে।

৬. শেয়ার মূলধন, রিজার্ভ ও লাভ থেকে বার্ষিক ২.৫% হারে চার্জ নিয়ে একটি যাকাত তহবিল গঠন করা যেতে পারে।

৭. একটি শরীয়াহ তত্ত্বাবধান বোর্ড থাকতে হবে। বোর্ড শরীয়াহ'র আলোকে কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্যাবলী তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবে। ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় শরীয়াহর নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব শরীয়া বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে।

একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ হিসেবে ইসলামী বীমা বা 'তাকাফুল' ব্যবস্থার চুক্তি ইসলামী 'মুদারাবা' নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত। যার মানে মূলধন যোগানদাতা ও ব্যবসায়িক সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক সম্মত অংশীদারিত্বে লাভ ভাগাভাগি করে নেয়ার ব্যবস্থা আছে এবং একই সাথে বীমার সকল গ্রহীতা বা সদস্যরা পরস্পরের সাথে সহযোগিতার

www.pathagar.com

চুক্তিতে আবদ্ধ হন। 'মুদারাবা' ও 'তাউয়ূন' ইসলামী জীবনবীমার মৌলিক শর্ত। মুদারাবার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি দেশে 'ওয়াকালা' পদ্ধতিতে ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পুনঃতাকাফুলের প্রয়োজন

আমরা এ পর্যন্ত জীবনবীমার কার্যাবলী এবং ইসলামী শরীয়াহর আলোকে তার কার্যপ্রণালী আলোচনা করেছি। যদি পুনঃবীমা বা পুনঃতাকাফুলের পদ্ধতিটি আলোচনা না করি তবে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমরা জানি যে, বীমার পলিসিহোল্ডারদের তহবিল পরিচালনা করে বীমা কোম্পানী। এর মাধ্যমে কয়েকজনের ক্ষতি অনেকে ভাগাভাগি করে নেয়। তাই, ঝুঁকি যত বেশী বিস্তৃত করা সম্ভব হবে পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তত বেশি মজবুত হবে। অন্যভাষায় বলা যায়, ব্যবসায়িক পরিসীমার বিস্তৃতি ঘটালে অধিকতর ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। মুদারাবা/ওয়াকালা ও তাউয়ূনের মৌলিক নীতিমালা পুনঃতাকাফুলের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। ইসলামী বীমা কোম্পানী সমূহ পুনঃতাকাফুলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে ঝুঁকি ছড়িয়ে দিয়ে বাজার সামর্থ্য বাড়াতে পারে। যেকোন ধরনের বিশেষ ঝুঁকি হ্রাস যা বীমা কোম্পানীর কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হতে পারে তা পুনঃবীমার মাধ্যমে পুরোপুরি বা আংশিক অন্য কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে। এটা করার ক্ষেত্রে, বীমা কোম্পানী বীমাগ্রহীতার স্থান গ্রহণ করে এবং অতিরিক্ত ঝুঁকি অন্য বীমা কোম্পানীর কাছে হস্তান্তর করে। একে বলা হয় পুনঃতাকাফুল বা পুনঃবীমা।

পুনঃবীমা পদ্ধতি

পুনঃবীমা সাধারণত দুটি পন্থায় করা হয়ে থাকে :

ক) ফ্যাকালটেটিভ পদ্ধতি ও

খ) চুক্তি (Treaty)

ফ্যাকালটেটিভ পুনঃবীমা শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ ঘটনায় কার্যকর হয়। সাধারণভাবে পুনঃবীমা চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী বীমা কোম্পানী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঝুঁকি ছেড়ে দিতে সম্মত হয় এবং পুনঃবীমাকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে তা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। এ ধরনের চুক্তিকে বলা হয় 'কোটা শেয়ার' যাতে ছাড় দেয়া কোম্পানী এবং পুনঃবীমাকারী প্রতিটি ঝুঁকি মূল শর্তাবলী অনুযায়ী সমানুপাতিক হারে ভাগ করে নেয়। কোটা শেয়ার চুক্তিতে পুনঃবীমাকারী মূল বীমাকারকের নীতিতে পরিচালিত হয়। ছাড় দেয়া কোম্পানী তার আওতায় রাখতে চান না এমন প্রতিটি ঝুঁকির ব্যাপারে যখন পুনঃতাকাফুল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতায় পৌছে তখন তাকে বলা হয় 'সারপ্লাস চুক্তি'। সারপ্লাস মানে কোন বীমা কোম্পানীর নিজস্ব আওতায় রাখা ঝুঁকির

www.pathagar.com

পরিমাণের উদ্বৃত্ত। কোন কোম্পানীর ধারণ ক্ষমতা নির্ধারিত হয় কোন পলিসি কার্যকর থাকা অবস্থায় গৃহীত ঝুঁকির সর্বোচ্চ ব্যাপ্তি এবং কোম্পানীর সে ধরনের ক্ষতি বহন করার অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ওপর। ফ্যাকালটেটিভ পুনঃবীমা একক ঝুঁকি ভিত্তিতে করা হয়। প্রতিটি ঝুঁকি পুনঃবীমাকারীর কাছে উপস্থাপনের সময়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের প্রয়োজন হয় এবং পুনঃবীমাকারী এসব তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয় সে তা গ্রহণ করবে কিনা। ফ্যাকালটেটিভ পুনঃবীমা অনিশ্চয়তাপূর্ণ। তাই সাধারণভাবে এটি পছন্দ করা হয় না। অবশ্য, পুনঃবীমা (Treaty) চুক্তি বিদ্যমান থাকলে, কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকির আংশিক বা পুরো অংশ বা চুক্তির অতিরিক্ত ঝুঁকি থেকে মুক্তি পেতে ফ্যাকালটেটিভ পুনঃবীমা পদ্ধতি সহায়ক হয়ে থাকে।

সাধারণত 'Excess of loss' বা ক্ষতির অতিরিক্ত' পুনঃবীমা চুক্তির ব্যবস্থা করা হয় যখন মূল বীমাকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত উদ্ভিত সকল দাবি বহন করে এবং শুধুমাত্র তার চূড়ান্ত দায় তার এই পরিমাণকে অতিক্রম করে, সে একটি নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ পরিমাণ পর্যন্ত পুনঃবীমাকারীর নিকট থেকে পেতে পারে। এক্ষেত্রে ঝুঁকি ছাড় দেয়া বীমা কোম্পানী ও পুনঃবীমাকারীর মধ্যে ঝুঁকির সমানুপাতিক বণ্টন হয় না। নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত চূড়ান্ত নেট ক্ষতির ব্যাপারে পুনঃবীমাকারী দায়বদ্ধ থাকে। পুনঃবীমাকারীর দায়বদ্ধতা অবশ্য অসীম নয়, বরং সবসময়েই তা নির্ধারিত।

'স্টপ লস' ভিত্তিতে পুনঃবীমা চুক্তি করা যায়। এক্ষেত্রে যখন পুনঃবীমাকারী যেকোন বড় বা ছোট দাবির দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে না যতক্ষণ না বছরের প্রিমিয়ামের ক্ষতির অনুপাত একটি সম্মত অনুপাতে পৌঁছে। বছরের ক্ষতির অনুপাত যখন এই সম্মত শতাংশ অতিক্রম করে, পুনঃবীমাকারী শতাংশের বাইরের সকল ক্ষতির দায় বহন করে। ক্ষতির হার একটি সম্মত উর্দ্ধসীমায় পৌছা পর্যন্ত পুনঃবীমাকারীর দায়বদ্ধতা অব্যাহত থাকে। 'স্টপ লস' পুনঃবীমার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রিমিয়াম আয়ের একটি সম্মত শতাংশে ক্ষতির অনুপাতকে সীমাবদ্ধ করা।

পুনঃবীমা পদ্ধতি যাই হোক না কেন, এটা বুঝতে হবে যে, বিদেশ থেকে পুনঃবীমা চাওয়া হলে, তা হয় বিদেশ থেকে সেবা আমদানি করা এবং তার ফলে দেশ থেকে বিদেশে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে কোন দেশ যখনই বিদেশী ঝুঁকির জন্য পুনঃবীমা সুবিধা প্রদান করে, তা হয় বিদেশে সেবা রফতানি। দেশের বাইরে পুনঃবীমা ছেড়ে দেয়া বা গ্রহণ করা, আমাদের বাণিজ্যিক ভারসাম্যে প্রভাব সৃষ্টি করে। এজন্য, সাধারণভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে, পুনঃবীমা আমদানির মূল্য যথাসম্ভব সর্বনিম্ন থাকা উচিত।

ইসলামী পদ্ধতিতে পুনঃবীমা

'কোটা শেয়ার' ও 'সারপ্লাস' পুনঃবীমাকে সমানুপাতিক পুনঃবীমা হিসেবে চিত্রিত করা হলে 'এক্সেস লস' ও 'স্টপ লস' পুনঃবীমাকে অ-সমানুপাতিক পুনঃবীমা বলা যায়।

www.pathagar.com

সমানুপাতিক বীমায় প্রিমিয়াম হিসাব করা হয় পুনঃবীমা কোম্পানী কর্তৃক ছাড় দেয়া কোম্পানীকে প্রদান করা প্রিমিয়াম কমিশন ও প্রফিট কমিশন বাদ দিয়ে মূল নেট হার ধরে। অ-সমানুপাতি পুনঃবীমার প্রিমিয়াম ছাড় দেওয়া কোম্পানীর মোট মূল প্রিমিয়াম বা কোন বছরে পুনঃবীমাকারকের মোট নেট আয়ের শতাংশকে বিবেচনা করে। ইসলামী পদ্ধতিতে পুনঃবীমা আনুপাতিক হারমুখি হওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যেখানে পুনঃবীমাকারী বাস্তবে মূল ঝুঁকির সহ-বীমাকারীতে পরিণত হয়। ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় মুসলিম বিশ্বে বীমা শিল্পের ইতিবাচক সম্প্রসারণের জন্য ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোর উচিত নিজেদের মধ্যে সহ-বীমার প্রতি উৎসাহিত হওয়া।

অবশ্য, যেসব পেশাদার বীমা কোম্পানীর তৎপরতা পুনঃবীমায় গ্রহণযোগ্য তারা ইসলামী শরীয়াহর অধীনে কাজ করতে পারে। ইসলামী পুনঃবীমা কোম্পানী ইসলামী সমবায় (তাকাফুল) নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করতে পারে এবং দুটি পৃথক তহবিল ১) অংশগ্রহণকারী কোম্পানীসমূহ ও ২) শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল রাখা ও পরিচালনা করতে পারে। অংশগ্রহণকারী কোম্পানীসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্তের আংশিক বা পুরোটা 'বিশেষ রিজার্ভ' হিসেবে রাখতে পারে এবং অন্যান্য রিজার্ভ পুনঃবীমা কোম্পানীর স্বার্থানুযায়ী বিবেচনা করতে পারে। রিজার্ভ তহবিলের পাওনা বণ্টনের পর যদি ব্যালেন্স থাকে, তবে সেই নির্দিষ্ট বছরে প্রতিটি কোম্পানীর পুনঃবীমা প্রিমিয়ামের আনুপাতিক হিসাব অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভাগ করা উচিত। অংশগ্রহণকারী কোম্পানীসমূহের তহবিলে ক্ষতি হলে, তা মেটানো হতে পারে প্রাপ্ত শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল থেকে। ইসলামী পুনঃবীমা কোম্পানী অংশগ্রহণকারী কোম্পানীসমূহ এবং শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আরও পুনঃবীমার ব্যবস্থা করতে পারে যাকে বলা হয় 'রেট্রোসেশন প্রটেকশন'।

অবশ্যই, পুনঃবীমা বা রেট্রোসেশন প্রটেকশন নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী বীমা ও পুনঃবীমা কোম্পানীগুলোর উচিত হবে শুধুমাত্র ইসলামী পুনঃবীমা কোম্পানীগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া। অবশ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে, ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো বাণিজ্যিক বীমা ও পুনঃবীমা কোম্পানীগুলোর সাথে লাভ বণ্টন ব্যবস্থাপনায় উপনীত হতে পারে। তবে অনৈসলামিক বাজারের উপর নির্ভরশীলতা দূর করার জন্য এ ধরনের পুনঃবীমার প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে হ্রাস করা উচিত। এটাও ভালমতো জানা প্রয়োজন যে, উন্নত বিশ্বের বীমা তথাকথিত 'অদৃশ্য রফতানিতে' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে যাকে সঠিকভাবে বলা যায়, 'অদৃশ্য লুণ্ঠন'। তাই, মুসলিম বিশ্বে ইসলামী বীমা ও পুনঃবীমার উন্নয়ন এসব দেশকে অদৃশ্য লুণ্ঠন থেকে রক্ষা করতে পারে। ওআইসি'র পৃষ্ঠপোষকতায় প্রস্তাবিত ইসলামী পুনঃবীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইসলামী বীমার উন্নয়ন করতে পারে। এধরনের পুনঃবীমা গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহের উচিত হবে পারস্পরিক ভিত্তিতে বিপুল মাত্রার বিদেশী পুনঃবীমা গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে ঝুঁকি ছড়িয়ে দেওয়া। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণের সাথে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার মাধ্যমে বীমার

www.pathagar.com

ব্যয় সর্বনিম্ন করবে। বর্তমানে এশিয়া ও ইউরোপে ইসলামী নীতিমালার আলোকে পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ফলে পুনঃবীমার প্রাথমিক সংকট দূরীভূত হয়েছে।

অবশ্য, বড় ধরনের ক্ষতিপূরণের দাবির সমস্যা লাঘবের জন্য ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো একটি সমিতি (এসোসিয়েশন) গঠন করতে পারে, যেখানে কোন সদস্য সম্মত পরিমাণের অতিরিক্ত দাবি প্রদানের প্রয়োজন পড়লে নিজেদের মধ্যে যৌথ বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে নেবে। সমিতি যৌথ বন্দোবস্তের মাধ্যমে ঝুঁকির একটি অংশ বহন করবে এবং বিনিময়ে বাজারে পুনঃবীমার ব্যবস্থা করবে। সমিতির মাধ্যমে যদি পুনঃবীমা সম্পাদন করা হয় কোন একক বীমা কোম্পানীর সম্ভাব্য খরচের চেয়ে কম হবে। ঝুঁকির আকার এবং বিস্তৃতির কারণে এটা হতে পারে। বাস্তবিকই যৌথ বন্দোবস্ত ও পুনঃবীমার এই পদ্ধতিটি ১৮৯৯ সাল থেকে মিউচুয়াল প্রটেক্টিং এন্ড ইনডেমনিটি ক্লাবের মাধ্যমে সফলভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। পি এন্ড আই গ্রুপের তথাকথিত 'লন্ডন গ্রুপের' সদস্যরা তাদের ঝুঁকির ভিত্তিতে চাঁদা দিয়ে থাকে। এর মানে প্রতিটি সদস্য তার সার্বিক প্রিমিয়াম আয়ের সাথে সম্পর্কিত হারে যৌথ বন্দোবস্তে চাঁদা দিয়ে থাকে। ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোও তাই তাদের নিজেদের মধ্যে যৌথ বন্দোবস্তে আসতে পারে এর ফলে বীমাকারীর পুনঃবীমা খরচ হ্রাস করবে। যেহেতু নীতিগতভাবে বীমার আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং ইসলামী শরীয়াহর আলোকে ক্ষতিপূরণ যৌথ বন্দোবস্তের মাধ্যমে করা সম্ভব, পুনঃবীমা পদ্ধতি রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমার উর্দ্ধে উঠে মুসলিম উম্মাহর জন্য এ ধরনের পুনঃবীমা ব্যবস্থা অধিকতর কল্যাণ বয়ে আনবে।

উপসংহার

ইসলামের আলোকে জীবনবীমা ব্যবস্থা এখন অনেকটা বিতর্কের উর্ধ্বে চলে এসেছে। যদিও এ সম্পর্কে আরও ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা প্রয়োজন। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ বিভিন্ন আদলে (Model) কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহেও ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে এবং শরীয়ার আলোকে 'মুদারাবা', 'ওয়াকালা', 'তাউয়ুনী' পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ মুদারাবা পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করছে। বাস্তবে এটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আইনগত কিছু সংস্কার করা জরুরি। বাংলাদেশের বর্তমান আইনে যেভাবে এজেন্টদের দ্বারা কমিশন ভিত্তিতে ব্যবসা সংগ্রহ করা হয় এবং প্রথম বর্ষ প্রিমিয়ামের কমিশনের হার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে ইসলামী জীবনবীমা পরিচালনায় কিছু জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। আইনী পরিবর্তনের মাধ্যমে এসব জটিলতা নিরসনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া 'মুদারাবা' পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে 'ওয়াকালা' পদ্ধতি অনুসরণের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা। ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় গ্রাহকের, উদ্যোক্তার এবং সর্বোপরি উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণ জরুরি। সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য ইসলামী জীবনবীমা ব্যবস্থা অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করা। সরকারের নীতি নির্ধারকগণ এমনকি সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা আন্দোলন করেন তাদের মধ্যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি ইসলামী বীমার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে।

অতএব এ মুহূর্তে আমাদের উচিত হবে ইসলামী জীবনবীমার কল্যাণময়ী দিকগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা। এ কারণে প্রয়োজন সমাজের অপেক্ষাকৃত ভালো মানুষকে ইসলামী জীবনবীমার সাথে সম্পৃক্ত করা। সমাজে যারা ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চান তারা যদি নিজেদেরকে বীমার কার্যক্রম হতে দূরে রাখেন এবং অন্যদের দূরে থাকতে উৎসাহিত করেন তাহলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সফল হবে এমনটি আশা করা সমীচীন বলে মনে হয় না। রাতারাতি কোন আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বাস্তবতার আলোকে সময়ের মাপকাঠিতে একটি পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য অনেক ত্যাগ, তিতীক্ষার প্রয়োজন। প্রয়োজন দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটানো। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভীতি, আশংকা ও সন্দেহ আমাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে। ইসলামের কল্যাণময়ীতা প্রয়োগের সুফল ইসলামী জীবনবীমা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনয়ন সম্ভব। এ সুযোগকে কাজে লাগানো এবং এ ব্যাপারে সৎ পরামর্শ প্রদান ইসলামী চিন্তাবিদদের দায়িত্বের অংশ। পলায়নমুখী চিন্তা-চেতনা সমাজকে শুধু পেছনে ঠেলে দিবে। আদর্শবানরা যদি পিছিয়ে থাকেন তবে সমাজের নেতৃত্ব নেবে অধিকতর অর্থনৈতিক ও অযোগ্য ব্যক্তিরা। যেমনটি ঘটেছে অতীতে।

ইসলামকে বর্তমান বিশ্বে বিজয়ী করার জন্য ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের যে কোন প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা একান্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবে যদি ইসলামী বীমা ব্যবস্থার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয় কিংবা মুখ থুবড়ে পড়ে তাহলে শুধু একটি সৎ প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং ইসলামের আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে এবং এ ব্যাপারে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ এবং বিশেষ করে ইসলাম প্রিয় সাধারণ মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন বলে আমরা মনে করি।

---

www.pathagar.com

আট.

শরীয়াহ্‌সম্মত জীবনবীমা প্রসারে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা

জীবন সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বিশ্বচরাচর একটি সচেতন ও সুপরিকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট নিয়ম মাফিক সদা গতিশীল। বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন এক আল্লাহ এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতেই তার কর্তৃত্ব। পৃথিবী নামক যে গ্রহে আমরা বাস করি তা সমগ্র সৃষ্টিরাজির এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ এবং অন্য সকল সৃষ্টির মত পৃথিবীর যাবতীয় কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন আল্লাহ। মানুষ তার সৃষ্ট জীব। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, বাঁচিয়ে রেখেছেন। অতএব, নিরংকুশ (Absolute Independence) স্বাধীনতার ধারণা নিছক প্রতারণা ও বিভ্রান্তিমূলক। আল্লাহ আমাদের জীবনের প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর বেষ্টনী মুক্ত হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, আমাদের জীবন নিরংকুশ এক মহাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেখানে বাস্তব অর্থে আমরা সম্পূর্ণ অসহায়। মাতৃজঠরে জন্ম লাভের মুহূর্ত হতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত আমরা আল্লাহর অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক আইনের নিগঢ়ে এমনভাবে বাঁধা যে মুহূর্তের জন্য ঐ সব নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত হবার দাবি আমরা করতে পারি না।

অবশ্য জীবনের অন্য একটি দিক রয়েছে যেখানে আমরা কিছু পরিমাণ স্বাধীন। এটি হচ্ছে জীবনের নৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল। ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক বিষয়াদি বা আচার-আচরণের ক্ষেত্রে আমাদের পছন্দের ও ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতার দ্বারা নিশ্চয় আমরা সৃষ্টিকর্তার পথনির্দেশনা বা আইনসমূহ প্রত্যাখ্যান করাকে ন্যায়সংগত বলে প্রমাণ করতে পারব না। আমাদের পছন্দের যে স্বাধীনতা তার দ্বারা আমরা হয় আল্লাহ প্রদত্ত আইনের প্রতি অনুগত থাকব নতুবা তাঁর নির্দেশাবলীকে সরাসরি অস্বীকার করব।

বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও পথনির্দেশনা মানব প্রকৃতির সাথে সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যশীল। ব্যক্তি বা সমষ্টির জন্য ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন কর্মকাণ্ড হোক না কেন সুশৃঙ্খল আচরণের একটি মাপকাঠি আল্লাহর আইনে নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুত নাজিলকৃত গ্রন্থ এবং রসূল প্রদর্শিত জীবন দর্শনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহ-প্রদত্ত আইন ও নির্দেশ না মেনে চলবার বা পছন্দ/অপছন্দের কোন অবকাশ বা যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

www.pathagar.com

বরং আমাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়া। যে সব কারণে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের মেনে চলতে হবে তার কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত মানবদেহের যে সব অংগের সাহায্যে বা শক্তির দ্বারা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম, সে সবই আল্লাহর দান।

দ্বিতীয়ত পছন্দ-অপছন্দের যে স্বাধীনতা আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন তা তিনি আমাদের ওপর অর্পণ করেছেন আমরা আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা দ্বারা তা অর্জন করিনি।

তৃতীয়ত যেসব বস্তুর ওপর আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ করতে পারি সেসব আল্লাহর সম্পত্তি শুধু নয় তা সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি।

চতুর্থত যে এলাকায় আমরা স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ করতে পারি সে সব এলাকা আল্লাহর।

পঞ্চমত মানব জীবনের স্বেচ্ছাধীন কিংবা অস্বেচ্ছাধীন, দৈহিক কিংবা নৈতিক সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে একটি সার্বভৌম এবং সাধারণ উৎসের আইনের দ্বারা।

ইসলামের দৃষ্টিতে তথা শরীয়তে কোনটি অনুমোদিত এবং কোনটি অনুমোদিত নয় তা নিরূপিত হয় আল্লাহ নির্দেশিত বিধি-নিষেধ দ্বারা। মোদ্দা কথা ইসলামী সমাজ নিজের স্বাধীনতাকে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। অন্য কথায় মুসলিম সমাজে আইনের উৎস সর্বশক্তিমান আল্লাহ- মানুষ নয়। আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব এবং রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত সুন্নাহ অনুযায়ী যে জীবনবিধির দ্বারা একজন তাঁর আচার আচরণ পরিচালিত করে তাকে বলা হয় শরীয়ত। যেহেতু মুসলিম সমাজ শরীয়ত ভিত্তিক জীবন পরিচালিত করতে ওয়াদাবদ্ধ সেহেতু শরীয়ত ব্যতিরেকে অন্য কোন জীবন পদ্ধতি ইসলামী সমাজের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হতে পারে না।

শরীয়তের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

শরীয়তের দৃষ্টিতে জীবনের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় কি তা আমাদের জানা প্রয়োজন। শরীয়তের লক্ষ্য এবং মৌল বিষয়াদি যদি আমরা বুঝতে সক্ষম হই তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা আমাদের জন্য সহজসাধ্য হবে। শরীয়তের লক্ষ্য হচ্ছে মানব জীবনকে পবিত্রতা ও পূণ্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলা (শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় "মারুফাত") এবং সকল প্রকার পাপ পংকিলতা ("মুনকারাত") থেকে জীবনকে পরিচ্ছন্ন রাখা। বস্তুত বিবেক সম্পন্ন মানব হৃদয়ে যা কিছু উত্তম গুণাবলী হিসেবে চিরকাল গ্রহণযোগ্য হয়েছে তাই মারুফাত এবং এর বিপরীত যা তাই মুনকারাত। শরীয়তের কাজ হচ্ছে "মারুফাত" ও "মুনকারাত" এর বিষয়ে পরিষ্কার

www.pathagar.com

ধারণা সৃষ্টির দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করা। পাপ-পুণ্যের কোন তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে শরীয়তের কার্যবিধি সীমিত করে রাখা হয়নি বরং শরীয়ত মানব জীবনের জন্য একটি সর্বাঙ্গীন নকশা পরিবেশন করেছে যার ফলে মানবীয় সৎ-গুণাবলী বিকশিত হতে পারে এবং কোন পাপ-পংকিলতা মানব জীবনকে কলুষিত না করতে পারে।

এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শরীয়তে এমন সব বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে যা সৎ ও সুন্দর কার্যাবলীকে বিকশিত করতে পারে এবং তা বিকাশের পথে যে সব অন্তরায় থাকতে পারে তা দূর হয়ে যায়। শরীয়ত শুধু পাপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে না বরং পাপ ও মন্দের অনুপ্রবেশের পথসমূহ রুদ্ধ করে দেয় এবং যাবতীয় অন্যায়কে প্রতিরোধ করার শিক্ষা দেয়।

শরীয়তের দিকনির্দেশনা

এ যাবৎ আইনের যত শাখার বিকাশ ঘটেছে তার প্রতিটি শাখায় শরীয়তের দিক-নির্দেশনা রয়েছে। শরীয়তের কোন কোন বিষয় স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় এবং তা মানবতার জন্য মঙ্গলজনক এবং কোন অংশ পরিবর্তনীয় ফলে যুগ ও কালের চিরবর্ধিষ্ণু প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। ইসলামী আইনের অপরিবর্তনীয় নির্দেশমূলক বিধান ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে একটি স্থায়ী চরিত্র এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বস্তুত সমগ্র মানব ইতিহাসে এমন কোন সমাজ খুঁজে পাওয়া যাবে না যা অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী উপাদান ব্যতিরেকে পৃথক স্বকীয় সত্তা এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম। সংস্কৃতিতে যদি কোন স্থায়ী উপাদান না থাকে এবং প্রতিটি বিষয় যদি পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনযোগ্য হয় তবে তা স্বতন্ত্র স্বকীয় সংস্কৃতিরূপে গণ্য হতে পারে না।

গভীরে অনুশীলন করলে দেখা যাবে এমন সব নির্দেশ/আদেশ ও সীমারেখা শরীয়তে নির্দেশ করা হয়েছে যেখানে মানব মনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সহজেই ঘটে থাকে এবং বিপথগামী হওয়ার আশংকাও থাকে। অতএব, এসব ক্ষেত্রে শরীয়তে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা স্থাপনের মাধ্যমে আমাদের পথ চলা সুগম করা হয়েছে। জীবনের চলার পথে কিছু সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা মানব অগ্রগতির পথকে বিঘ্নিত করে না বরং পিছলে পড়া থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে। ইসলামী আইনে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রণয়ন করা যেতে পারে। এই অংশে রয়েছে পরিবর্ধন ও বিস্তৃতির ব্যাপক সম্ভাবনা এবং এভাবে প্রতিযুগের মানব সমাজের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।

বর্তমানকালে রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখার বিষয়াদি সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেম-ওলামাদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয়েছে। যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে যে সব কর্মকাণ্ডে আমাদেরকে অহরহ

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করতে হয় সেসব ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধি-বিধান কি সে সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের জানতে হবে। এই বোধ থেকেই যুগে যুগে মণীষীগণ তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা ও মতামত দিয়েছেন। তাদের প্রদত্ত মতামতের আলোকে সম্প্রতি সুদমুক্ত ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষেত্রে জীবনবীমা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে কয়েক শতাব্দী থেকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে জীবনবীমার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আমাদের মনে রয়েছে নানা ধরনের প্রশ্ন ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। ইসলামী চিন্তাবিদগণ শরীয়াহ্ ভিত্তিক জীবনবীমা ব্যবস্থার প্রচলনের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করার পর বিগত দুই দশকে বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশেও ইসলামী জীবনবীমার প্রচলন করা হয়েছে। অর্থাৎ শরীয়াহ্ ভিত্তিক জীবনবীমা ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে এসেছে ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ। ইসলামী জীবনবীমা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন জীবনবীমার প্রয়োজন কেন।

জীবনবীমার চাহিদা

জীবন সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন রকম হতে পারে। কিন্তু মানুষ একটি সামাজিক জীব। সমাজের সদস্য হিসাবে তাকে পালন করতে হয় বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রথমত পরিবারের প্রতি একজন নাগরিকের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করা প্রয়োজন। পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে গৃহকর্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গৃহকর্তার আয়ের ওপরে নির্ভর করে পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিয়ে-শাদি ইত্যাদি। পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে গৃহকর্তাকে ভাবতে হয় ভবিষ্যতে নিরাপত্তার কথা। যে কোন সময় জীবনের যে কোন বিপত্তি থেকে যদি গৃহকর্তা বেকার, পঙ্গু কিংবা অসুস্থ হন অথবা তার অকালমৃত্যু হয় তাহলে পরিবারের সদস্যদের জীবনধারণ দুঃসহ হয়ে পড়ে। এছাড়া বার্ধক্যেও যখন তার আয় করার কোন সামর্থ থাকবে না তখন তার নিজের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি তাকে ভাবতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে কারও গলগ্রহ হয়ে থাকা বা কারও আর্থিক সাহায্যে কালাতিপাত করার বিড়ম্বনা মানুষ কামনা করে না। তাই নিজের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েও তাকে ভাবতে হয়।

একটি পরিবারের সবচেয়ে বড় আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হয় গৃহকর্তার অকাল মৃত্যুর কারণে। ৩০ বা ৩৫ বছর বয়সে যদি কোন গৃহকর্তার অকালমৃত্যু হয় তাহলে সে পরিবারের জন্য আর্থিক ক্ষতি হবে সেই পরিমাণ টাকা যা তিনি সারা জীবনে কর্মক্ষম থাকা অবস্থায় আয় করতে পারতেন। পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য তার সম্ভাব্য অর্জিত আয়ের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হত। গৃহকর্তার অকাল মৃত্যুর ফলে পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যয় মিটানো তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। এই বিপুল ক্ষতির বোঝা যথাসম্ভব লাঘব করার জন্য জীবনবীমার প্রয়োজন।

www.pathagar.com

গৃহকর্তার অসুস্থতার ফলেও একটি পরিবারের সদস্যদের জীবনে নেমে আসতে পারে এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। বস্তুত অকাল মৃত্যুর চাইতেও এক্ষেত্রে দুর্দশা অনেক বেশী হতে পারে; কেননা অসুস্থতার ফলে যদি তিনি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু হয়ে যান তাহলে তিনি আর আয় করতে সমর্থ হবেন না কিন্তু একই সাথে তার নিজের চিকিৎসা সেবার জন্য প্রয়োজন হবে বিপুল পরিমাণ অর্থের। তিনি তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্বপালনে শুধু ব্যর্থই হবেন না বরং তাকে বেঁচে থাকতে হবে অন্যের করুণার পাত্র হয়ে। তার শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি মানসিক যন্ত্রণাও বাড়তে থাকবে।

ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। জীবনবীমার বিভিন্ন উপযোগী পলিসি এ প্রয়োজন মেটাতে পারে। আমাদের সমাজে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধ নরনারীর সংখ্যা বাড়ছে। আগামীতে এ সংখ্যা আরও বাড়তে থাকবে। বাংলাদেশে ষাটোর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং বাড়বে। অকালমৃত্যুর আশংকা হতে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভাবনা দ্বিগুণেরও বেশী। অতএব, বৃদ্ধ বয়সের জন্য প্রস্তুতি অবশ্যই আমাদের থাকতে হবে। জীবনবীমা সঞ্চয় ও নিরাপত্তা উভয়েরই ব্যবস্থা করে থাকে। জীবনবীমার মাধ্যমে মাসিক পেনশন বা বার্ষিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই মানুষ জীবনবীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভষ্যিতের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়।

অর্থকে অনর্থের মূল বলা হলেও আমরা সবাই জানি, অর্থ জীবনের প্রয়োজন মেটায়। অর্থ প্রয়োজন হয় দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটাবার জন্য। আমাদের চাহিদার কোন শেষ নেই এবং সব ধরনের চাহিদা মেটায় অর্থ, সম্পদ ইত্যাদি। অর্থের প্রয়োজন হয় মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য, আরাম আয়েশের জন্য কিংবা বিলাসের জন্য। অর্থের প্রয়োজন হয় বর্তমানের, নিকট ভবিষ্যতের এবং দূর ভবিষ্যতের সকল প্রয়োজন মেটাতে। পরিবারের সকল সদস্যদের দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা তথা অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা আশ্রয় ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন অর্থের। পরিবারের কর্তাকে এসব নিয়ে ভাবতে হয় এবং অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা নিতে হয়। তাকে এও ভাবতে হয় যে, তিনি যদি অসুস্থ হন কিংবা কোন দুর্ঘটনায় বা অসুস্থতায় পঙ্গু হয়ে পড়েন কিংবা তার যদি অকাল মৃত্যু হয় তাহলে পরিবারের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে যে অর্থের প্রয়োজন তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। বাস্তবতার এই নিরিখে পরিবারের কর্তাকে তার আয় হতে এমন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যা তার আজকের প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে।

জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের ফলেই মানুষের সন্তুষ্টি আসে না। সে চায় তার ছেলে দেশে কিংবা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করুক তার মেয়ের ভাল বিয়ে হোক এবং কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি যেন নিশ্চিত নিরাপদ ও স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে পারেন। গৃহকর্তার আয় করবার ক্ষমতা থাকুক বা নাই থাকুক কিংবা তিনি যদি বেঁচে না থাকেন

www.pathagar.com

তাহলেও এসব চাহিদার শেষ হবে না। এই ক্রমাগত চাহিদা বিভিন্ন সূত্র থেকে মেটানো সম্ভব হতে পারে। যেমন–

ক) গৃহকর্তার সঞ্চয় হতে;

খ) আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের অনুদান বা সাহায্য হতে;

গ) পুত্র-কন্যার উপার্জন হতে;

ঘ) সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার সাহায্য বা ঋণ হতে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের অধিকাংশ লোকেরই সঞ্চয়ের অভ্যাস নেই। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, কিংবা সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার সাহায্য যে সব সময় পাওয়া যাবে এমনটিও নয়। পুত্র-কন্যার আয় বা উপার্জনের ওপর নির্ভর করাও সুবিবেচনাপ্রসূত ও বাস্তবসম্মত নয়। সব পরিবারের গৃহকর্তারই রয়েছে দায়িত্ববোধ এবং ভালবাসা, আবেগ ও অনুভূতি। অতএব, নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে একটি উপযোগী সঞ্চয় পরিকল্পনা তথা উপযুক্ত জীবনবীমা এসব সমস্যার সমাধানে সুন্দর ভূমিকা রাখতে পারে।

একজন মানবশিশু এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর সে ধীরে ধীরে বড় হয় এবং কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। সে তার শারীরিক শ্রম কিংবা মেধার সাহায্যে উপার্জন করতে শুরু করে। সে স্বপ্ন দেখে সুন্দর এক জীবনের। বেছে নেয় একজন জীবনসাথীকে। গড়ে তোলে সংসার জীবন। তাদের সংসারেও আসে ফুটফুটে শিশুরা। যাদের সুন্দর ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু আর্থিক পরিকল্পনা তৈরী করতে হয়। সংসারে পিতা-মাতাকে ভাবতে হয় আগামী অনিশ্চয়তার কথা। তারা জানেন না তাদের কার কতদিন আয়ু। কেউ অকালে ঝরে যেতে পারেন আবার কেউ বা হতে পারেন দীর্ঘজীবী। উভয়ক্ষেত্রেই সুপরিকল্পিত আর্থিক কোন পরিকল্পনা না থাকলে সমস্যার উদ্ভব হয়। তারা যদি সঞ্চয়ী হন তাহলে সেই সঞ্চয় দিয়ে সব প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। আবার কেউ যদি দীর্ঘজীবী হন তাহলেও সীমিত সঞ্চিত অর্থে দীর্ঘদিনের জীবনযাত্রার ব্যয় সংকুলান সম্ভব নাও হতে পারে। অতএব, এমন একটি সঞ্চয়ী ব্যবস্থার প্রয়োজন যার দ্বারা উভয়ক্ষেত্রেই আর্থিক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নাও হতে পারে। অতএব, এমন একটি সঞ্চয়ী ব্যবস্থার প্রয়োজন যার দ্বারা উভয়ক্ষেত্রেই আর্থিক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। জীবনবীমা হচ্ছে সেই ধরনের ব্যবস্থা যা সঞ্চয় ও আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়।

এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আকুতি সকল মানুষের। কবির ভাষায় আমরা বলে থাকি "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"। বস্তুত কবির এই কামনা সব মানুষের মনের কথা। কিন্তু বাস্তবতা বড় নির্মম। কারণ মৃত্যুর শীতল হাত সবাইকে স্পর্শ করে। তাই মানুষ চায় দীর্ঘায়ু হতে। প্রার্থনায়, আশীর্বাদে, স্নেহের মায়ায় আমরা একে-অন্যের দীর্ঘায়ু কামনা করি। কিন্তু বার্ধক্যের বিড়ম্বনা কিংবা বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি আমরা খুব কমই ভেবে থাকি। পরিণত বয়সে

www.pathagar.com

মানুষের কর্মক্ষমতা ও আয়ক্ষমতা কমে যায় বা একেবারেই থাকে না। এই অবস্থায় মানুষের জন্য প্রয়োজন এমন একটি সঞ্চয় পরিকল্পনা এবং এমন ধরনের সম্পদ অর্জন যা বৃদ্ধ বয়সের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

একটি জীবনবীমা পলিসি বৃদ্ধ বয়সের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে অনন্য এবং অসাধারণ। বস্তুত জীবনবীমা হচ্ছে এমন একটি সম্পদ যা অল্প পরিমাণ কিস্তির বিনিময়ে অর্জন করা সম্ভব এবং এই সম্পদ হতে আয় ঠিক প্রয়োজনের সময় নিশ্চিত করা যায় এবং প্রয়োজনে আজীবন এই আয়ের উৎস অব্যাহত থাকে। জীবনবীমা এমন এক ধরনের সম্পদ যার জন্য ব্যবস্থাপনার কোন প্রয়োজন হয় না। বীমাগ্রহীতার পক্ষে বীমা কোম্পানী তহবিল ব্যবস্থাপনার কাজটি করে থাকেন। পলিসি গ্রাহকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সাহায্যে বিশাল তহবিল গড়ে তোলা হয়। এই তহবিলের সুষ্ঠু বিনিয়োগ এবং অধিক লাভের ব্যবস্থা করা বীমা কোম্পানীর দায়িত্ব। পেনশন বীমা পলিসি কিংবা বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণের মাধ্যমে (Annuity) বৃদ্ধকালীন আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সুন্দর পদ্ধতি রয়েছে বীমা ব্যবস্থায়।

জীবনবীমা একটি বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে এখন বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এসব প্রকল্পে সম্পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত নিয়মিত সঞ্চয় করা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু বীমার ক্ষেত্রে মেয়াদের শেষ কিস্তি পর্যন্ত প্রিমিয়াম দেয়ার তাগিদ বীমাকারী এবং বীমাগ্রহীতা উভয়ে অনুভব করেন। বীমাকারী নিয়মিতভাবে তাগিদ দিয়ে বীমাগ্রহীতাকে নিয়মিত প্রিমিয়ামের টাকা জমা দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। ব্যাংকের নিকট টাকা জমা দেওয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। অতএব, দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয় ব্যবস্থা হিসাবে এবং আপদকালীন নিরাপত্তা প্রদানের স্কীম হিসাবে জীবনবীমার কোন বিকল্প নেই। দুর্দিনে বন্ধু হিসাবে জীবনবীমা একান্ত প্রয়োজন।

নিরাপত্তার বিষয়টি মানুষকে সব সময় ভাবিয়ে তোলে। একজন নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রধানত রাষ্ট্র এবং সরকারের। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়ে; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তথা সুশাসনের ভিত্তিতে সকল নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল নাগরিকের আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি তথা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সামগ্রিক মানবকল্যাণের জন্য সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে একটি পরিবারের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সকল দায়-দায়িত্ব সেই পরিবারের সদস্যদেরকেই নিতে হয়। পরিবারের সকল সদস্য পিতামাতার আয়ের ওপর নির্ভরশীল। সন্তান-সন্ততি যতদিন পর্যন্ত না নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে, নিজেরা রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে, ততদিন পর্যন্ত তাদের সকল প্রয়োজন মেটানোর দায়-দায়িত্ব পিতামাতা বা অভিভাবককে নিতে হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে সামাজিক বীমার (Social Insurance) কোন ব্যবস্থা নেই। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সকল নাগরিকের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করা বাস্তবে সম্ভব নয়। অতএব, জীবনবীমার মাধ্যমে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের সুব্যবস্থা করা একান্ত অপরিহার্য। জীবনের এই বাস্তবতার নিরিখে মানুষ জীবনবীমা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে। উদ্বিগ্নতা কমাতে জীবনবীমা ব্যবস্থা অসাধারণ এক ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলেই মানুষ ক্রমশঃ জীবনবীমা ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

ইসলামী জীবনবীমা ও সামাজিক শান্তি

জীবনবীমা পদ্ধতিকে ইসলামের আলোকে তথা শরীয়তের বিধি-বিধান ও সীমারেখার মধ্যে পরিচালিত করার জন্য ইসলামী জীবনবীমা বা পারিবারিক তাকাফুল ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। চুক্তি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে ধরনের স্বচ্ছতা শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য, বর্তমান বীমা চুক্তিতে তার অভাব রয়েছে। যেহেতু বীমাকারী প্রতিষ্ঠান প্রকৃত অর্থে পলিসি মালিকদের প্রদত্ত প্রিমিয়ামের জিম্মাদার সেহেতু ইসলামী জীবনবীমা চুক্তিতে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনরূপ অস্পষ্টতা, অনিশ্চয়তা, ফটকাবাজারী শর্ত ইসলামী জীবনবীমার চুক্তিতে থাকবে না। ইসলামী জীবনবীমায় অংশগ্রহণকারীদের অর্থ কিভাবে জমা রাখা হবে, অনুদান হিসেবে কত অংশ প্রদান করা হবে, বিনিয়োগ কিভাবে করা হবে, লাভের অংশ কিভাবে বণ্টন করা হবে, ব্যবসা সংগ্রহ খরচ, ব্যবস্থাপনা খরচ, কোন্ খাত হতে কিভাবে ব্যয় করা হবে এর সব কিছুই চুক্তির শর্তাবলীতে স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন। ইসলামী জীবনবীমার স্বচ্ছতার কারণে জনগণের নিকট এর গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বেশী হবে বলে আশা করা যায়।

ইসলামী জীবনবীমা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ হতে হবে সুদমুক্ত এবং শরীয়তের অনুমোদিত পন্থায়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ যে ভাবে মুদারাবা, মুরাকাবা, মুশারাকা, ইজারা, ইসতিসনা ইত্যাদি পদ্ধতিতে লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুদমুক্ত লেন-দেন ও কারবার প্রচলন করার ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তাবিদগণ যে সব শরীয়ত অনুমোদিত পথ ও পন্থার কথা বলেছেন সে সব পদ্ধতি অনুসরণ করে উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ইসলামী জীবনবীমা বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

ইসলামী জীবনবীমা চালু হওয়ার ফলে পরিবারের সদস্যদের আপদকালীন সঞ্চয় ও নিরাপত্তার একটি শরীয়তসম্মত পদ্ধতি অনুসরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জীবনকে ঝুঁকিমুক্ত রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ নিশ্চয়তার মাধ্যমে সমাজের প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি ইসলামী জীবনবীমা পদ্ধতি অবলম্বন করে জীবনকে সহজ, সুন্দর ও সফল করার প্রয়াস নিতে পারেন। সমাজের সবাই যখন এভাবে সৎকর্মে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তখন ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ এবং সর্বোপরি জনজীবনে শান্তি ও সুখের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ কখনও চান না তার বান্দারা দুঃখ, কষ্ট বা দরিদ্রতার মধ্যে কালাতিপাত করুক। একজন সৎ ও বিশ্বাসী ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষী থাকুক কিংবা অন্যের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করুক তা শরীয়তের কাম্য নয়। অতএব, যে ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে কাজে লাগিয়ে শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় জীবনকে সুন্দর করার সহজ প্রচেষ্টা রয়েছে, শরীয়ত তা শুধু অনুমোদনই করে না রবং তাকে উৎসাহিত করে।

সমাজকল্যাণের মহান ব্রতকে সামনে রেখে জীবনবীমা ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা এবং ঠগবাজির মাধ্যমে সরলমতি মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয় এবং তাদের ন্যায্য হিস্সা বা পাওনা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। সমাজের সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তিদের দ্বারা যদি শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় জীবনবীমার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তবে এই পদ্ধতির প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে সমগ্র মানব সমাজ উপকৃত হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক নব দিগন্তের সূচনা হবে।

ইসলাম যেহেতু একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান, সেহেতু আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ইসলামের বিধি-বিধান প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য। শরীয়তের বিধি-বিধান প্রয়োগ শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং সামগ্রিক মঙ্গলের বিষয়টি চিন্তা করেও শরীয়তের বিধি-বিধান প্রয়োগ করা প্রয়োজন। যা কিছু সমাজের জন্য চির মঙ্গলকর ও কল্যাণকর যা কিছু মানুষের মধ্যে ন্যায়, সুবিচার, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করে তা সর্বশ্রেণীর, সর্বকালের মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে চালু করা প্রয়োজন। এ রকম একটি আন্তরিক তাগিদ হতে শরীয়াহ্ভিত্তিক জীবনবীমা পদ্ধতির প্রবর্তন ও প্রচলন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এই প্রয়াসের সফলতা সুন্দরের বিজয় ও মানবকল্যাণের একটি নতুন মাইলফলক হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হবে বলে আশা করা যায়।

উদ্যোক্তাদের ভূমিকা

শরীয়াহভিত্তিক জীবনবীমা বিপণনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত একটি বলিষ্ঠ এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে বাংলাদেশের বীমা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হবে বলে আশা করা যায়। নিছক ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং এ দেশের গণমানুষের চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামী জীবনবীমার মাধ্যমে জনকল্যাণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়ার উদ্দেশ্যে এই পরিবর্তন করা হলে এ শিল্পের বিকাশ দ্রুত ঘটার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

বাংলাদেশের শহরে, বন্দরে, গ্রামে, গঞ্জে সর্বস্তরের মানুষের নিকট শরীয়াহভিত্তিক জীবনবীমার স্কীমসমূহ পৌছে দেয়ার জন্য প্রতিটি জেলায়, উপজেলায় নিয়োগ করা হয়েছে হাজার হাজার কর্মী বাহিনী। এই সমস্ত কর্মী বাহিনীকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দ্বারা এমনভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন যেন তারা শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নয় বরং ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসাবে

www.pathagar.com

সত্যিকারের জনসেবামূলক মনোভাব নিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষের হৃদয়ে নিজেদের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে পারেন। কারণ, এদেরকে হতে হবে এমন চরিত্রের অধিকারী যা মানুষকে শুধু কথায় মোহিত না করে কাজে প্রমাণিত করবে যে, মানবকল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্যে ইসলামী জীবনবীমার স্কীমসমূহ একান্ত প্রয়োজন ও উপকারী। জীবনবীমার প্রতিনিধিবৃন্দকে প্রমাণ করতে হবে যে তাদের নিজেদের নয় বরং গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষা করাই তাদের প্রধানতম কাজ।

নৈতিকতার দিক থেকে এই সমস্ত কর্মী বাহিনীকে এমনভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন যেন তারা অতি সহজেই সমাজে নিজেদেরকে একজন আদর্শ মানুষ, প্রকৃত বন্ধু এবং নেতৃত্বে উচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত হতে পারেন। তাদের আন্তরিকতা এবং চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা মানুষ বুঝতে সক্ষম হবেন যে, এরা আর অন্যদের মত নয় বরং এদের মধ্যে রয়েছে সততা, নিষ্ঠা এবং সেবামূলক মনোভাব। শরীয়াভিত্তিক জীবনবীমা পারস্পরিক কল্যাণের একটি উত্তম পন্থা। এই সত্যকে পরিপূর্ণভাবে নিজেদের মন মগজে চিন্তা চেতনায় অনুধাবন করার পর সবার মাঝে তা ছড়িয়ে দেয়াই হবে জীবনবীমা প্রতিনিধিদের মূল লক্ষ্য।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম স্তম্ভ হলো পবিত্র হজ্জ্ব। আমাদের অনেকেরই হজ্জ্ব করার সৌভাগ্য হয় না কারণ এর জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা একবারে জোগাড় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা মাফিক অর্থ সঞ্চয়ের প্রকল্প। অতএব, হজ্জ্ব-বীমা পরিকল্প হজ্জ্ব পালনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক এবং উপযোগী হবে। হজ্জ্ব-বীমার পাশাপাশি রয়েছে পেনশন ও চিকিৎসাবীমা পরিকল্প। যে কোন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এই পরিকল্পের মাধ্যমে পরিণত বয়সে নিয়মিত মাসিক পেনশন পাবার ব্যবস্থা করতে পারেন। বয়স্ক ব্যক্তি অবসর জীবনের আর্থিক প্রয়োজনের দিক লক্ষ্য রেখে পেনশন ও চিকিৎসা বীমা পরিকল্প তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে লাভক্ষতির ভিত্তিতে তিন কিস্তি ও পাঁচ কিস্তি বীমা পরিকল্প। বীমার মেয়াদকালের মধ্যে তিনটি/পাঁচটি কিস্তিতে বীমাকৃত অর্থ পরিশোধ করা হয়। ফলে সংসারের বিভিন্ন প্রয়োজনে সেই টাকা কাজে লাগানো যায়।

শহর ছাড়িয়ে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শরীয়াহ ভিত্তিক বীমা বিপণনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৈরী করা হয়েছে ক্ষুদ্র বীমা প্রকল্প। স্বল্প ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিকে ইসলামী বীমার আওতায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের ও বার্ধক্যের নির্ভরশীলতার হাত থেকে দরিদ্র জনসাধারণকে মুক্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র বীমার প্রচলন করা হয়েছে। ইসলামী জীবনবীমার প্রতিনিধিরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে পাশ বই-এর মাধ্যমে প্রিমিয়ামের টাকা সংগ্রহ করে থাকেন। সাধারণত মাসিক ভিত্তিতে প্রিমিয়ামের টাকা জমা নেয়া হয় তবে গ্রাহক ইচ্ছে করলে প্রতি তিন মাসে, ছয় মাসে বা বছরে এক বার যে কোন পদ্ধতিতে টাকা দিতে পারেন। এই বীমা স্কীম বীমাগ্রাহকের পরিবারের সদস্যদেরকে (গ্রাহকের

www.pathagar.com

অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে) ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক বিপদ থেকে এবং বিধবাদের পরের ঘরে হাত পাতা থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও স্বল্প আয়ের লোকজনদেরকে মিতব্যয়ী হতে সাহায্য করে এবং অপচয় প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য রয়েছে সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্পনা। সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্পনা সঞ্চয় ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি প্রকল্প। পলিসি চালু অবস্থায় মেয়াদের মধ্যে বীমাগ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ঋণ দানেরও ব্যবস্থা করা হয়। মুক্ত বীমা ও ইসলামী বীমার স্কীমসমূহে সঞ্চয়কৃত অর্থ লাভজনক হালাল খাতে বিনিয়োগ করে একদিকে যেমন হালাল আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা হয় ঠিক একই সাথে পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে আর্থিক সহায়তা দানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

ইসলামী জীবন বীমার স্কীমসমূহ শরীয়াহ্ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত এবং সুদ, জুয়া ও প্রতারণাবিহীন এক অনন্য জীবনবীমা ব্যবস্থা। স্থান, কাল, পাত্র এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে আপামর জনসাধারণের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে শরীয়াহ ভিত্তিক বিভিন্ন বীমা স্কীম প্রণীত হয়েছে। জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন স্কীম নিয়ে শরীয়াহ ভিত্তিক বীমা বিপণনের কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

জীবনবীমা একটি সেবামূলক শিল্প। এখানে বীমাগ্রাহক তাৎক্ষণিকভাবে-এর কোন সুবিধা ভোগ করতে পারেন না বা ব্যবহার করতে পারেন না। বীমাকারীর অঙ্গীকার, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার ভিত্তিতে বীমা ব্যবসা পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে বীমা প্রতিনিধিদের চারিত্রিক গুণাবলী, আচার, আচরণ একদিকে যেমন বীমা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ঠিক তেমনিভাবে বিপণন ব্যবস্থার কলাকৌশল ও নীতিমালা গ্রাহকের আস্থা ও সন্তুষ্টি অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বিক্রয় বিপণনের একটি অংশ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, জোর জবরদস্তি করে কোন বীমা পলিসি বিক্রয় করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, গ্রাহকদের প্রয়োজন মেটানো এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা। একজন সম্ভাব্য বীমাগ্রাহক যখন উপলব্ধি করবেন যে, শরীয়াহ্ ভিত্তিক জীবনবীমা প্রকৃত অর্থে একটি আদর্শ আর্থিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা এবং এই পদ্ধতিতে সুদ বা জুয়ার কোন সংমিশ্রণ নেই বরং স্বল্প পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রয়োজন আর্থিক সহায়তা পাওয়া সম্ভব তখন তারা সাগ্রহে, স্বেচ্ছায় ইসলামী জীবনবীমার গ্রাহক হতে আগ্রহী হবেন। অতএব, বীমা বিপণনের ক্ষেত্রে আমাদের কোন আক্রমণপ্রবণ (Aggressive) ভূমিকা থাকবে না। বরং আমরা মনে করি, সাধারণ শিষ্টাচার ও ভদ্রতা বীমা সেবা বিপণনের ক্ষেত্রে প্রধানতম প্রয়োজনীয় গুণ।

বীমা বিপণনের অংশ হিসেবে প্রতিনিধির সংখ্যা একদিকে যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই সাথে

www.pathagar.com

নতুন ও পুরাতন সকল প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য, দক্ষ ও উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস পাওয়া যাচ্ছে। শুধুমাত্র বিক্রয় প্রতিনিধির প্রশিক্ষণ নয় বরং অফিসের সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যেও সুষ্ঠু পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি আদর্শ সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিপণন বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেননা প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রযাত্রা এবং লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিপণনের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে সবাই সচেতন। একটি বিমানের জন্য তার দু'টি ডানা যেমন সহায়ক, বিপণন ঠিক তেমনিভাবে আমাদের চলার পথকে সহজ ও সুগম করে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা, বাজার গবেষণা, নতুন পলিসির উদ্ভাবন ও সেবার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের বিপণন ব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে দৃঢ় ও বিস্তারের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে উন্নয়ন বিভাগের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা (Action Plan) তৈরী করা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে সম্ভাব্য পলিসি গ্রাহকের প্রয়োজন, প্রতিযোগিতার ধরন এবং উপযুক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

বিক্রয় ব্যবস্থাপনার সাথে যারা জড়িত তারা একাধারে পরিকল্পনাকারী এবং তা বাস্তবায়নকারী। ইসলামী জীবনবীমার বিক্রয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রধানতম সহায়ক শক্তি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীর নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা ও চারিত্রিক গুণাবলী। যোগ্য নেতৃত্বের ফলে বিক্রয় প্রতিনিধিরা তাদের নিজ নিজ মেধা এবং কর্মদক্ষতা পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। অতএব, প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হতে শুরু করে প্রাথমিক এজেন্ট পর্যন্ত সবার মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে এমন এক কর্মপ্রেরণা যা প্রত্যেক কর্মীকে স্বপ্রণোদিত হয়ে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম করে তুলবে। প্রতিটি স্তরের কর্মীর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। এগুলি হচ্ছে "সততা", "শৃঙ্খলা" ও "দৃঢ় মনোবল"।

বিপণন ও বাজার গবেষণা

বিপণনের ক্ষেত্রে বাজার গবেষণা (Market Research) নিছক সংখ্যা তত্ত্বের সমাহার নয় বরং গুণগত গবেষণা জীবন বীমা বিপণনের ক্ষেত্রে অধিক প্রয়োজনীয়। একটি বিশেষ স্কীম বা পরিকল্পনা কতজন গ্রাহককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে তার সংখ্যাগত হিসাব শুধু নয় বরং কেন তা অধিকাংশ মানুষকে আকৃষ্ট করছে বা করছে না তা উপলব্ধি করা এবং এইসব তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিপণন কৌশল প্রণয়ন করা বাজার গবেষণার মূল লক্ষ্য। বাজার গবেষণার আর একটি মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে বাজার পরিবেশ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং তা নিয়ন্ত্রণের পথ ও পদ্ধতি নিরূপণ করা।

www.pathagar.com

বাজার গবেষণার অংশ হিসেবে নিত্য নতুন স্কীম বা পরিকল্পনা সকল সম্পর্কে ক্রমাগত গবেষণার কার্যক্রম হাতে নেয়া দরকার। বাংলাদেশের সম্ভাব্য গ্রাহকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান, সামাজিক পরিবেশ এবং জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামী জীবনবীমার স্কীমসমূহের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন প্রয়োজন হতে পারে। মানবীয় আচার-আচরণের গভীর পর্যালোচনা নতুন নতুন স্কীম প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। অতএব, বাজার গবেষণার ভিত্তিতে ইসলামী জীবনবীমার বিপণন ব্যবস্থাপনা নীতির একটি বৈশিষ্ট্য হওয়া প্রয়োজন।

বিপণনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে যোগাযোগ ও বিতরণ ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপন নির্ভর যোগাযোগ পদ্ধতির পাশাপাশি গণযোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমকে অত্যন্ত কার্যকররূপে ব্যবহার করা আমাদের বিপণন কৌশলের অন্তর্গত। বীমাগ্রাহকদের সাথে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এইসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জন। কারণ আমরা জানি, আমাদের হাজার হাজার সন্তুষ্ট গ্রাহক সত্যিকার অর্থে নীরব বিপণন কর্মী হিসেবে কাজ করবেন এবং তাদের মাধ্যমেই সম্ভাব্য লক্ষ লক্ষ নতুন গ্রাহক সৃষ্টি হবে।

উপযুক্ত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে ফলপ্রসূ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে আমাদের বাজার গবেষণার মৌলিক লক্ষ্য। শিশু বয়স থেকেই সবাই যেন শরীয়াহ ভিত্তিক ইসলামী জীবনবীমার প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে সেই জন্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী জীবনবীমার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার উদ্যোগ নেয়া জরুরি। এছাড়াও শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর নিকট সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম এর মাধ্যমে ইসলামী জীবনবীমার বৈশিষ্ট্য ও তুলনামূলক সুবিধাদি তুলে ধরতে হবে। আপামর জনতার কাছে সহজে পৌছানোর লক্ষ্যে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কেও গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

শরীয়াহ ভিত্তিক বীমা পলিসি বিক্রয়ের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে জীবন বীমা কর্মীরা সেতুবন্ধন তৈরী করে থাকে। পলিসি গ্রাহকের আর্থিক নিরাপত্তার অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠানকে দিতে হয়। একারণে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গ্রাহকের আস্থা অর্জন করা। পলিসি বিক্রয়ের পরে গ্রাহকের সাথে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক শেষ হয় না বরং শুরু হয়। অতএব, পলিসি গ্রাহকের প্রতিদিনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনার সাথী হতে হবে। এজন্য গ্রাহকের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ এবং প্রয়োজনে যে কোন রকম পরামর্শ, সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে। একজন বীমা গ্রাহকের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রদত্ত প্রিমিয়ামের হেফাজত, বিনিয়োগ এবং

www.pathagar.com

ন্যায় ও সুবিচার ভিত্তিক মুনাফা বণ্টন ইসলামী জীবনবীমার মূল লক্ষ্য। সবচাইতে কম সময়ের মধ্যে গ্রাহক সেবার সকল কাজ সম্পাদন করা এবং দাবি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে বাংলাদেশের বীমা শিল্পে একটি উদাহরণ সৃষ্টি করা ইসলামী জীবনবীমার অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শরীয়াহ্ ভিত্তিক বীমার মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নিশ্চয়তা। ভাল কাজের সহযোগিতা করা এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখে সহমর্মিতা প্রকাশের উৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে ইসলামী বীমার উদ্ভব হয়েছে। সময়ের দাবি ও প্রয়োজন অনুসারে শরীয়াহ্ আইনের অনুসরণে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের নিকট বীমা সেবা প্রদানের যে মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে প্রয়োজন সকল শ্রেণীর, সকল পেশার মানুষের সহযোগিতা। একই সাথে প্রয়োজন দেশের আলেম সমাজ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে নীতি নির্ধারক এবং আমলাদের সহযোগিতা, সমর্থন এবং অংশগ্রহণ।

www.pathagar.com

নয়.

ইসলামী জীবনবীমার বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবতা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটি মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশিকা। মানুষের সারা জীবনের সকল বিষয়েরই দিক-নির্দেশনা এতে আছে। ইসলাম আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর সর্বোত্তম পন্থা সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করে। ইসলাম শান্তি এবং সম্প্রীতির পথ। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম মুসলমানদেরকে সঠিক পথে চলতে এবং খারাপ সব কিছু থেকে বিরত থাকতে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার হুকুম পালনের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যদিও তিনি তার হুকুম পালনের জন্য তাকে বাধ্য করেন না। তিনি আমাদেরকে তার আদেশ পালনের কিংবা লংঘনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। কারণ তিনি আমাদের পরীক্ষা করতে চান। আমাদের মধ্যে যারা এই পরীক্ষায় পাশ করবে, তারা এই জগতে এবং পরবর্তী জগতেও পুরস্কার পাবে।

আল্লাহপাক কুরআনে বলেন, **"আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে আমার উপাসনা ছাড়া (অন্যকিছু করার জন্য) সৃষ্টি করিনি।** উপাসনা মানে আল্লাহর নির্দেশাবলীর পুরোপুরি পালন। আমরা যা কিছু করি তা যদি তার নির্দেশ অনুযায়ী এবং তার সন্তুষ্টির জন্য করি, তবে তাই ইবাদত। জীবনে আমাদের লক্ষ্য হতে হবে আমাদের সকল ভাল কাজের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। এই দুনিয়ার শান্তি হলো আল্লাহর আইনের অনুসরণের পুরস্কার এবং বিশৃঙ্খলা হলো তার অবাধ্য হওয়ার পরিণতি। এ জন্যই ইসলাম মানে শান্তি। আল্লাহ কুরআনে বলেন, **"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম (৫:৩)।**

ইসলাম প্রদর্শিত জীবনের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। তিনি এর মালিক এবং তিনি এটি পরিচালনা করেন। আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করছি, তা মহাবিশ্বের একটি খুবই ছোট অংশ। তিনিই মানুষকে 'সৃষ্টির সেরা' হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহই আমাদের টিকিয়ে রেখেছেন এবং তার নিয়ন্ত্রণ থেকে কেউ বেরুতে পারে না। আমাদের জীবনের একটি বড় অংশ আমাদের সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সরাসরি

www.pathagar.com

পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে আমরা বাস্তবিকই অসহায়। আমাদের জীবন এবং মৃত্যু প্রশ্নে আমাদের কাছে কোনই বিকল্প নেই। আমরা আমাদের মায়ের গর্ভে অস্তিত্ব লাভ করা থেকে শুরু করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক আইনের মধ্যেই থাকি।

প্রকৃত বিশ্বাসীদের কাছে, আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন মানবজাতির জন্য সবচেয়ে নির্ভুল এবং সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। এটি মানুষের ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত উভয় জীবনের জন্য সুশৃঙ্খল আচরণের মানদণ্ড বিশেষ। ইসলাম প্রদর্শিত জীবন দর্শন গ্রহণ করলে আমাদেরকে অবশ্যই শরীয়াহ্ নির্দেশিত দিক-নির্দেশনা এবং বিধান মেনে চলতে হবে। যারা নিজের ইচ্ছায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করবে এবং আত্মসমর্পন করবে, তারা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার নির্দেশিত পথে তাদের জীবন পরিচালনা করবে। তারা কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ ছাড়াই আল্লাহর নির্ধারিত ভাল ও মন্দ বা হালাল-হারামকে মেনে নেবে। মুসলমানদের সমাজে পরিকল্পিতভাবে শরীয়াহ ভিন্ন অন্যকোন পদ্ধতি মেনে নেয়া পীড়াদায়ক। যদি তা করা হয়, তবে সমাজটি অনৈসলামী হয়ে পড়ে।

শরীয়াহ্ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য মুসলমানদের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। এতে জীবনের সকল বিষয় সন্নিবেশিত আছে। নির্দেশনায় কোনটি ভাল বা খারাপ, কোনটি কল্যাণকর ও কোনটি অকল্যাণকর ও ক্ষতিকারক, কোন সৎকাজটি বিকশিত ও উৎসাহিত করতে হবে এবং কোন মন্দ কাজটির দমন এবং নিরুৎসাহিত করতে হবে, তা বলে দেয়া হয়েছে। সমাজে গতিশীলতা সৃষ্টির জন্য কোন পন্থা এবং উপায় অবলম্বন করতে হবে এবং কোন পদ্ধতিটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে তার নির্দেশও শরীয়ায় দেয়া আছে। শরীয়াহ্ জীবনের একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা, তাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু নেই, তাতে কোন ঘাটতিও নেই। অতএব, ইসলামের অনুসারী হিসেবে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে। বীমা হলো সমাজের কল্যাণের জন্য একটি আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, শরীয়াহর নীতিমালা অনুযায়ী এটি পরিচালিত হতে হবে। এবং মুসলমানদের সমাজে ইসলামের দিক-নির্দেশনা অনুসারে জীবনবীমা ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মানব জীবনে ঝুঁকি এবং ইসলামী বীমা

আমরা সবাই জানি, জীবনে একমাত্র নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু ছাড়া) হলো অনিশ্চয়তা। যদিও মৃত্যু নিশ্চিত, তবুও আমরা জানি না কখন কে মারা যাবে। সে কী স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে নাকি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করবে। জীবন যেহেতু অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ, তাই আমরা এর পরিণতি যতটুকু সম্ভব কম ক্ষতিকর করার জন্য আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি। এমন অনেক দুর্যোগ আছে যা মানব জীবনকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ধ্বংস করে। মানবসম্পদ একটি জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। মানব জীবনের মূল্য

www.pathagar.com

অনেক বেশি এবং তা যে কোন সম্পদের মূল্য থেকে অনেক বড়। তাই, মানব জীবনের কল্যাণ আমাদের সকলের মৌলিক বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

পরিবার এবং নিয়োগকর্তার কাছে জীবনের অর্থনৈতিক মূল্য আছে। পরিবারের কাছে একটি মানব জীবনের অর্থনৈতিক মূল্য নিরূপিত হয় প্রতিটি সদস্যের আয় করার সামর্থের মূল্যায়নের মাধ্যমে। নিয়োগকর্তার কাছে জীবনের অর্থনৈতিক মূল্য নিরূপিত হয় প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবদান নিরূপণের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক ক্ষতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একজন মানুষ মারা যাবে কিনা তা জানা প্রয়োজনীয় নয় বরং সে যখন মারা যাবে তার ফলশ্রুতিতে কি হতে পারে সেটি জানা প্রয়োজন। কারণ, একজন মানুষ একসময় মারা যাবে তা একশতভাগ নিশ্চিত। তবে কোন ব্যক্তি কখন মারা যাবে, সে সম্পর্কে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। অবশ্য, আমরা বলতে পারি, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার মৃত্যুর আশংকাও বাড়তে থাকে। একজন লোক তার পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় না করেই শীঘ্র মারা যেতে পারে, আবার কেউ অনেক দিন বাঁচতে পারে, ফলে তার সঞ্চয়ের চেয়েও (যদি থাকে) বেশি অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু যখনই হোক না কেন, তা নির্ধারিত হয় অনির্দিষ্ট কারণ দ্বারা।

মৃত্যু ছাড়া বৃদ্ধ বয়সের জীবনও ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ অনেক মানুষ দীর্ঘদিন বাঁচে এবং এই সময়েও তাদের একটি আয়ের প্রয়োজন হয়। বিপুলসংখ্যক মানুষ পর্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় ছাড়াই বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যায়। ফলে তারা দুর্বিসহ জীবনের শিকার হয় এবং অসহায় হয়ে পড়ে। দুর্ঘটনা বা রোগের কারণে স্বাস্থ্যহানি হওয়ার ফলেও মানুষের উপার্জন ক্ষমতা পুরোপুরি বা আংশিক নষ্ট হতে পারে। এছাড়াও মেডিকেল ও হাসপাতালের বিল পরিশোধ এবং অসুস্থতাকালীন পরিচর্যার খরচ মেটানো প্রয়োজন। এ অবস্থা পরিবার এবং সমাজের উপর চাপের সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে জীবনহানির চেয়ে স্বাস্থ্যহানি অনেক বেশি অর্থনৈতিক ক্ষতি করে থাকে, কারণ অসুস্থতাজনিত অক্ষমতার কারণে এসময়ে আয়ের পথ বন্ধ হয় এবং চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে হয়।

মানব জীবনের ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় সবচেয়ে কার্যকর এবং সুবিধাজনক পন্থা হিসেবে বীমা বিবেচিত হয়ে থাকে। বীমার প্রধান কাজ হলো সঞ্চয়ের মাধ্যমে কিছু লোকের অর্থনৈতিক ক্ষতি ন্যায়সংগত উপায়ে নিরসন করা। বীমার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো সমাজের ঝুঁকি লাঘব করা। জীবনবীমার লক্ষ্য হলো ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা অথবা মৃত্যু হলে প্রত্যাশিত অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। জীবনের অনিশ্চয়তার কারণে কোন ব্যক্তিই বলতে পারে না, কতদিন সে বাঁচবে। তাই প্রতিটি দূরদর্শী এবং সুবিবেচক ব্যক্তি তার মৃত্যুর ফলে তার উপর নির্ভরশীলদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করে যেতে সঞ্চয়ের এবং সম্পদের জন্য আগ্রহী হন। বাংলাদেশে বর্তমানে ইসলামী জীবনবীমা ব্যবস্থা প্রধানত এই মহানব্রতকে সফল করার লক্ষ্যে কাজ করছে যে, জীবনের যে কোন নেতিবাচক পরিবর্তন থেকে সমাজের প্রতিটি সদস্যকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ইসলামী জীবনবীমা মানুষের দুটি মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে; নিরাপত্তার প্রয়োজন এবং সঞ্চয়ের প্রয়োজন। বৃদ্ধ বয়সের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সঞ্চয় দরকার এবং পরিবারের জীবিকা উপার্জনকারীর মৃত্যুর বিপরীতে নিরাপত্তা প্রয়োজন। ইসলামী জীবনবীমা একটি জনকল্যাণমূলক স্কীম এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি উত্তম সেবা। ইসলামী শরীয়াহ কিভাবে সাম্য, ন্যায়বিচার এবং নিরপেক্ষভাবে একটি নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারে, তার একটি বাস্তব উদাহরণ ইসলামী জীবনবীমা। ব্যক্তি, পরিবার এবং সংস্থার অনিশ্চিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে স্থিতিশীলতা প্রদান এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইসলামী জীবনবীমার প্রচলন করা হয়েছে।

ইসলামী জীবনবীমার লক্ষ্য ও পদ্ধতি

ইসলামী জীবনবীমা এমন একটি পদ্ধতি যাতে একদল মানুষ তাদের মধ্যকার কোন সদস্যের মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট ক্ষতির বোঝা লাঘবের জন্য একে অপরের সাথে সহযোগিতা করবে। ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিটি সদস্যের জন্য সহায়তা প্রদানের এবং লাভসহ ফিরিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে কোম্পানী তার উত্তরাধিকারীদের সঞ্চয়ের কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ অর্থ এবং সেই সাথে মৃত্যুকালীন সময় পর্যন্ত তার প্রদত্ত কিস্তির উপর অর্জিত লাভও প্রদান করে। ইসলামী জীবনবীমা দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সম্পদ সৃষ্টির একটি পদ্ধতি। বিনিয়োগ লাভ পাওয়া ছাড়াও ইসলামী বীমা স্কীম তার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতারও ব্যবস্থা করে। ইসলামী জীবন বীমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

১. অনিশ্চয়তা মোকাবেলায় তহবিল সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিয়মিত সঞ্চয় করা।

২. সঞ্চিত অর্থ থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ সাধারণ অনুদান তহবিলে জমা দেয়া।

৩. শরীয়াহ্ অনুমোদিত পন্থায় লাভের আশায় সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করা।

৪. প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সাধারণ তহবিল থেকে সাহায্য গ্রহণ করা।

ইসলামী জীবনবীমা কোন ব্যক্তি এবং তার পরিবারের জন্য অনেক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে। এটি পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের যোগান দিতে পারে, এ ছাড়া বাড়ী বন্ধকীর পাওনা পরিশোধ করতে পারে, সন্তানের পড়াশোনা ও বিয়ের ব্যয় মেটাতে পারে। জীবনবীমাকে অবসরকালীন আয়ের জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

চুক্তি সম্পাদন করার আইনগত যোগ্যতা আছে, এমন যে কোন ব্যক্তিই ইসলামী জীবনবীমা স্কীমে অংশ নিতে পারেন। তিনি যদি আগ্রহী হন তবে যে কোন মেয়াদের জন্য নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ প্রদান করবেন। প্রদানের কিস্তির পরিমাণ, কিস্তি

www.pathagar.com

প্রদানের সময়ের ব্যবধান এবং নিয়মিত কিস্তি প্রদানের মেয়াদ মূলত অংশগ্রহণকারীকেই নির্ধারণ করতে হয়। অংশগ্রহণকারী প্রদত্ত কিস্তির টাকা দুটি পৃথক শিরোনামে-মুদারাবা হিসাব ও তাবাররু হিসাবে জমা হবে। কিস্তির বড় অংশটি (ধরা যাক ৯০%-৯৫%) নিজস্ব হিসেবে জমা হবে এবং বাকী অংশ তাবাররু হিসেবে জমা হবে। তাবাররুর তহবিল সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো পলিসির মেয়াদ পূর্তির আগেই কোন সদস্য মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীদেরকে আর্থিক সুবিধাবলী প্রদানের ব্যবস্থা করা। কোন সদস্য যখন মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত জীবিত থাকেন, তখন তিনি তার নিজস্ব হিসেবে জমাকৃত অর্থ ও লভ্যাংশ পাবেন।

ইসলামী জীবনবীমার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

সনাতন বীমার সাথে ইসলামী বীমার প্রধান স্বাতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্য হলো চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর মধ্যকার আইনগত সম্পর্ক। ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানী প্রকৃত অর্থে অংশগ্রহণকারী সকল জমাকৃত অর্থের জিম্মাদার ও ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করে। তারা সম্ভাব্য পলিসিহোল্ডারদের (অংশগ্রহণকারী) সংগঠিত করার ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে এবং সমন্বয়কারী ও সহযোগী হিসেবে কাজ করে। অংশগ্রহণকারীদের তহবিল পরিচালনা করে থাকে বীমা প্রতিষ্ঠান। এ স্কীমে অংশগ্রহণকারীরা একে অপরকে সহযোগিতা করার জন্য তাবাররু তহবিলে অর্থ প্রদান করতে সম্মত হয়।

প্রচলিত জীবনবীমার বিপরীতে পারিবারিক তাকাফুল স্কীম বা ইসলামী জীবনবীমার স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য সঞ্চিত অংশ বিনিয়োগ অংশ থেকে পৃথক রাখা হয়। নিজস্ব হিসাবের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভ অংশগ্রহণকারীগণ এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠান ভাগাভাগি করে নেয়। চুক্তির শর্তে লাভ বণ্টনের হার নির্ধারিত হয় এবং লাভের পরিমাণ নির্ভর করবে বিনিয়োগ সফলতার ওপর। প্রচলিত জীবনবীমা পলিসিতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি অধিকারের ব্যাপার নয়। সাধারণতঃ জীবনবীমা কোম্পানীগুলো বিশেষ ধরনের পলিসিহোল্ডারদের বোনাস দিয়ে থাকে। কিন্তু চুক্তির শর্তে বোনাস-এর হার সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয় না।

পারিবারিক তাকাফুল ব্যবস্থা সুদের উপাদান থেকে মুক্ত এবং আল-মুদারাবা ও আল-তাবাররু নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। বিনিয়োগের পুরো ব্যবস্থাটাই শরীয়াহর নির্দেশনার আলোকে করতে হয়। উদ্বৃত্ত তহবিল অবশ্যই সুদমুক্ত শরীয়াহ নির্ধারিত স্কীমে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগ কোন অবস্থাতেই অনৈসলামী বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা যাবে না। অন্যদিকে, সনাতন জীবনবীমার তহবিল সুদভিত্তিক স্কীমে বিনিয়োগ হতে পারে। শরীয়াহর বিধানে সমর্থিত নয়, এমন কোন স্কীম বা প্রকল্পে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে সনাতন বীমা ব্যবস্থায় কোন বাধা নেই। সুদের নিষিদ্ধতা ইসলামী জীবন বীমা ব্যবসাকে শরীয়াহ পথে পরিচালিত করার জন্য অপরিহার্য।

www.pathagar.com

তাকাফুল চুক্তির অধীনে, বীমা পলিসি সমর্পণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীর মুদারাবা হিসাবে (বিনিয়োগ অংশ) সঞ্চিত অর্থ এবং সেই সাথে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত লাভ ফেরত দেয়া হবে। তাবাররু হিসেবে দান করা অংশ ফেরত দেওয়া হবে না। সমর্পনের ক্ষেত্রে বীমা প্রতিষ্ঠান সার্ভিস ফি দাবি করতে পারে। সনাতন জীবনবীমা চুক্তির ক্ষেত্রে পলিসি সমর্পণ করা হলে পলিসি হোল্ডার প্রকৃতপক্ষে যত প্রিমিয়াম জমা দিয়েছে, তার তুলনায় সে ফেরত পায় অনেক কম। অধিকন্তু, সনাতন জীবন বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তির প্রথম দুই বছরের মধ্যে পলিসি হোল্ডার আত্মহত্যা করলে তার উত্তরাধিকারীগণ কিছুই দাবি করার অধিকারপ্রাপ্ত হয় না। অথচ, তাকাফুল স্কীমের আওতায় অংশগ্রহণকারী দুই বছরের মধ্যে আত্মহত্যা করলেও তার উত্তরাধিকারীগণ বীমার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে না।

ইসলামী জীবনবীমার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নমিনি আর্থিক সুবিধাবলী প্রাপ্তির নিরঙ্কুশ অধিকারী হয় না, বরং সে নিছক একজন জিম্মাদার (ট্রাস্টি) বা সম্পাদনকারী (এক্সিকিউটর) হিসেবে বিবেচিত হয়, যার দায়িত্ব হবে ইসলামের উত্তরাধিকার বিধানের আলোকে পলিসির অর্থ অংশগ্রহণকারীর সকল উত্তরাধিকারের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া। ইসলামী জীবনবীমা ব্যবস্থা এভাবে শরীয়াহর বিধান অনুসরণের মাধ্যমে সমাজে বণ্টন সাম্য নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

মানব আচরণের স্ববিরোধিতা

আমাদের দেশে জীবনবীমা কখনো হয় না, এটা বিক্রি করা হয়। জীবনবীমা পলিসি ক্রয় করতে কেউ ইচ্ছুক কিনা তা নির্ধারণ করতে মানুষের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ জানা প্রয়োজন। মানুষের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরকে সচেতন করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন থাকে না। এ কারণে মানুষ তাদের জীবনের নানাবিধ ঝুঁকি এবং তার পরিণতি সম্পর্কেও সচেতন থাকে না। তারা ভালভাবেই জানে যে, জীবন হলো অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ কিন্তু তবুও তারা যৌক্তিক উপায়ে ঝুঁকি মোকাবেলা বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা সব সময়ে করে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষকে সবচেয়ে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তবুও তারা অনেক সময় যৌক্তিক এবং দায়িত্বশীলের মতো আচরণ করে না। সাধারণভাবে মানুষ চায় অর্থনৈতিক ও আবেগপ্রবণ চাপ থেকে নিরাপদ থাকতে। তারা চায় ভয়, ক্ষুধা ও কষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জীবনের কঠোর বাস্তবতা থেকে দূরে থাকতে চায়। তারা অপ্রিয় বাস্তবতাকে এড়িয়ে যেতে চায়। তারা প্রায়ই ভুলে যায় যে, তারা মারা যেতে পারে বা জরুরি প্রয়োজনে তার অনেক অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। তাই, মানুষকে কঠিন সত্য ও বাস্তবতার সাথে পরিচিত করা প্রয়োজন হয়। নিজেকে এবং তার প্রিয়জনদের রক্ষার জন্য বীমা ক্রয় করার জন্য তাকে সচেতন করতে হয়।

www.pathagar.com

মানুষ মালিকানার গর্ব উপভোগ করে। তারা তাদের নিজের বলে দাবি করতে পারে এমন কিছু অধিকার থাকার ধারণা পছন্দ করে। তারা অর্থনৈতিকভাবে আরো ভাল থাকতেও পছন্দ করে। তারা অর্থ, সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকতেও পছন্দ করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে অর্থ সঞ্চয়ের ইচ্ছাশক্তির অভাব দেখা যায়। তাদের কাছে খরচ করা সহজ এবং সঞ্চয় করা কঠিন মনে হয়। তারা অধিকতর ধনী হতে চায় অথচ তাদের মধ্যে যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তির অভাব আছে। এটাই অধিকাংশ মানুষকে পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত সঞ্চয় থেকে বিরত রাখে। মানুষ কল্পনাবিলাসী হতে পছন্দ করে। মানুষ তাদের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। তারা সবসময় তাদের লক্ষ্য, আশা এবং উচ্চাশা সম্পর্কে চিন্তা করে, কিন্তু খুব কম সময়েই তারা সেই স্বপ্নগুলো পূরণ করার জন্য কাজ শুরু করে। তাদের মধ্যে মনোযোগ ও মনোবল কম থাকার প্রবণতা কাজ করে। কি করতে হবে, কখন করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে-এসব ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তারা তাদের মনস্থির করতে পারে না। তাই তাদের প্রয়োজন নির্দেশনা ও পরামর্শ। তাদের আবেগ ও মানসিক দ্বন্দ্ব কাটানোর জন্য তাদের প্রয়োজন কারো সহযোগিতা ও উপদেশ।

সাধারণভাবে যে কোন বিষয়ে গুরুত্ব অনুধাবন এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বুঝবার অনুমতি মানুষের আছে। মানুষ চায় তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং তারা যা করছে তার অনুমোদন। তারা চায় প্রশংসা এবং তারা তাদের অর্জনের স্বীকৃতি চায়। মানুষ চায় ক্ষমতা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাদের সাথে অন্যরা যে আচরণ করছে, তা নিয়ে খুশি নয়। তারা অসন্তুষ্ট। তারা উদ্বিগ্ন। তাই, তাদের প্রয়োজন ভালবাসা এবং বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ। তাই তাদের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অন্যদের পরামর্শ।

মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সব মানুষ একরকম নয়। প্রতিটি মানুষই অন্যের চেয়ে আলাদা। নিজেদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। নতুন কিংবা ভিন্ন এমন আবেদনে তারা আকর্ষিত হয়। তাদের প্রতিটি বিশেষ অভাব ও প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে তারা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হতে চায়। তারা বিশেষ আবেদনে উদ্দীপ্ত হতে পারে। মানব আচরণের এসব বৈশিষ্ট্য, স্ববিরোধিতা ও মনোজাগতিক জটিলতার কারণে বীমা ক্রয়ের ক্ষেত্রে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়না। মানুষের সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবনবীমার মাঠ কর্মীদেরকে বীমা বিক্রি করার জন্য সম্ভাব্য বীমা গ্রাহকদের মধ্যে আগ্রহ, উৎসাহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদান করতে হয়। তাই বীমা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মাঠ কর্মীদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে ইসলামী জীবনবীমার তুলনামূলক সুবিধা

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনায় জীবনবীমা ব্যবসা খুবই কম। দেশের মূলধন বাজারে বীমা খাতের অবদান এখনো খুবই তাৎপর্যহীন। জীবনবীমার মাধ্যমে সৃষ্ট

www.pathagar.com

বার্ষিক আয় জি.ডি.পি'র মাত্র ০.৫% (প্রায়)। দেশের মাথাপিছু জীবনবীমা প্রিমিয়াম খুবই কম যা মাথাপিছু প্রায় সত্তর টাকা মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশে (বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা অনুপস্থিত থাকায়) জীবনবীমা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের একটি তুলনামূলক সারণী নিম্নে দেয়া হলো ঃ

বাংলাদেশের তুলনায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে বীমা ব্যবসার অবস্থান

দেশ	জিডিপি এর অংশ হিসেবে (২০০২) প্রিমিয়াম আয়			জন প্রতি প্রিমিয়াম ২০০২ (মার্কিন ডলারের হিসাব)		
	জীবন	সাধারণ	মোট	জীবন	সাধারণ	মোট
বাংলাদেশ	০.৩০%	০.১৮%	০.৪৮%	৳ ১.০০	৳ .০৬	৳ ১.০৬
ভারত	২.৬০%	০.৬৭	৩.২৭	৳ ১১.৭০	৳ ৩.০	৳ ১৪.৭০
পাকিস্তান	০.২৫%	০.৪০	০.৬৫%	৳ ১.০০	৳ ১.৭	৳ ২.৭০
শ্রীলংকা	০.৫৫%	০.৭৫%	১.০০%	৳ ৪.৫০	৳ ৬.২০	৳ ১০.৭০
ইন্দোনেশিয়া	০.৬৬%	০.৮৪%	১.৫০	৳ ৬.২০	৳ ৬.৬০	৳ ১১.৮০
মালয়েশিয়া	২.৯৫%	২.০০%	৪.৯৫%	৳ ১১৯.০০	৳ ৮০.০০	৳ ১৯৯.০০

জীবনবীমা পলিসির সম্ভাব্য ক্রেতারা কেন জীবনবীমা পলিসি ক্রয় করছে না, এব্যাপারে তাদের বক্তব্য জানার জন্য সম্প্রতি একটি জরিপ চালানো হয়। এতে পরিলক্ষিত হয়, বীমা পলিসির সাথে বিধিমালার জটিলতার কারণে মানুষ বীমা পলিসি ক্রয়ে নিরুৎসাহিত হয়। জরিপে এটাও দেখা যায়, বীমার সুবিধা সম্পর্কেও মানুষের সচেতনতার অভাব রয়েছে। উপযুক্ত বীমা শিক্ষার অভাব মানুষের জীবনবীমা পলিসি না কেনার একটি বড় কারণ। বাংলাদেশের জীবনবীমা বাজারের এইসব প্রেক্ষাপটের আলোকে আমরা এখন ইসলামী জীবনবীমার গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো কিভাবে শরীয়াহ ভিত্তিক জীবনবীমা স্কীমের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে তা যাচাই করে দেখবো।

বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮টি প্রাইভেট জীবনবীমা কোম্পানী কাজ করছে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে মাত্র দুটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানী হিসেবে কাজ শুরু করছে যথাক্রমে ২০০০ ও ২০০২ সাল থেকে। উভয় কোম্পানীই স্বল্প সময়ের মধ্যেই দ্রুত এবং উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতি অর্জন করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাজারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশকারী প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স লিমিটেড বিগত বছরসমূহে গড়ে মোট প্রিমিয়াম আয়ের ক্ষেত্রে প্রায় ১০০% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। অন্য ইসলামী কোম্পানীটি (যা প্রথম ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানী) বিগত চার বছর কার্যক্রমের সময়কালে শীর্ষ সাতের মধ্যে পৌছে গেছে। ইসলামী জীবনবীমা সম্পর্কে মানুষের ব্যাপক উৎসাহের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামী জীবনবীমার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা একটি বড় বৈশিষ্ট্য। ইসলামী বীমার অংশগ্রহণকারীরা যে প্রিমিয়াম প্রদান করে তা তাদেরই থাকে এবং তা বীমা কোম্পানীর হয় না। কোম্পানী নিছক তহবিলের জিম্মাদার (ট্রাস্টি) ও ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করে এবং তা থেকে প্রাপ্ত লাভের একটি ন্যূনতম অংশ পেয়ে থাকে। পলিসি দলিলে বলা হয়ে থাকে, উদ্বৃত্তের কত অংশ পলিসিহোল্ডারকে প্রদান করা হবে। ঝুঁকি প্রিমিয়াম হিসেবে কেটে নেয়া তাবাররুর (দান) পরিমাণও পলিসিহোল্ডার জানবেন। তাই চুক্তির শর্তাবলী স্ফটিক-স্বচ্ছ। ইসলামী জীবন বীমার চুক্তিতে কোন দ্ব্যর্থবোধকতা বা অনিশ্চয়তা নেই।

ইসলামী জীবনবীমার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাবাররু পদ্ধতি। স্কীমের প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকেই অন্য অংশগ্রহণকারীর জন্য দান করতে হয়। কোন সদস্যের আকস্মিক মৃত্যুতে কিস্তির ঘাটতি পূরণের জন্য তাবাররু তহবিল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পলিসিহোল্ডারগণ পারস্পরিক কল্যাণের জন্য নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করে থাকেন। প্রতিটি পলিসিহোল্ডার সাহায্যের প্রয়োজন এমন কাউকে সহায়তার জন্য তার জমার একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করেন। তাই অনিশ্চয়তা দূর হয়। পদ্ধতিটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং সবার জন্য কল্যাণময়।

ইসলামী জীবনবীমা সহযোগিতার মাধ্যমে পরস্পরকে সেবা প্রদান করার একটি সুন্দর পদ্ধতি। শরীয়াহ ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা এবং সুষম সমাজ গঠনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বার্থে এই ব্যবস্থার মিল রয়েছে। তাই অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় এবং প্রতিযোগিতামূলক বিকল্প বীমা পদ্ধতি হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামী জীবনবীমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। কারণ বাংলাদেশে জীবনবীমার বাজার এখনো পুরোপুরি আবাদ করা হয়নি এবং স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে এই পদ্ধতি অধিকতর গণমুখী।

মানুষের হৃদয় জয় করা পদ্ধতি

বাংলাদেশে জীবনবীমা শিল্প তিন দশকের পুরাতন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জীবনবীমা এখানকার নাগরিকদের মাঝে জনপ্রিয় নয়। ১৯৯০ এর প্রথম দিকে প্রতি হাজারে মাত্র ৪/৫ জনের জীবনবীমা পলিসি ছিল। এটা এখন বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি হাজারে ১৩/১৪ জনে পৌঁছেছে। প্রথম বছরের প্রিমিয়ামের হিসাবে, বর্তমানে, জীবনবীমার বার্ষিক বৃদ্ধির হার প্রায় ১৮% থেকে ২০%। অবশ্য, সনাতন জীবনবীমার তুলনায় ইসলামী জীবন বীমার বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। এটা সহজেই সম্ভব হয়েছে কারণ যেসব ব্যক্তি ইতোপূর্বে অইসলামী বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় কখনো জীবনবীমা পলিসি ক্রয় করতেন না, ইসলামী জীবনবীমা পদ্ধতি সেই সব লোকদের এর আওতায় এনেছে। ইসলামী জীবনবীমা ব্যবস্থাকে আরো বিকশিত করতে হলে এবং গণমানুষের হৃদয় জয় করতে হলে, বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশের মানুষ কেন জীবনবীমা পলিসি গ্রহণ করতে আগ্রহী নয় তার কারণ অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে।

www.pathagar.com

বীমা চুক্তি সংক্রান্ত বিধিমালায় জটিলতা, বীমার লাভ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, বীমা শিক্ষার অভাব, নিম্ন আয় ও সঞ্চয়ের নিম্ন প্রবণতা ইত্যাদি হলো বড় বাধা যা মানুষকে জীবনবীমা পলিসি ক্রয়ে নিরুৎসাহিত করে। বলা হয়, বাংলাদেশের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা জীবনবীমার অনগ্রসরতার বড় কারণ। অবশ্য, এটা পুরো সত্য নয়। ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার জীবনবীমার প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি। পেশাদারিত্বের অভাব, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের অভাবও বাংলাদেশে বীমা শিল্পের নিম্নপ্রবৃদ্ধির জন্য দায়ী। জাপানের মাথাপিছু ৩,৫০০ মার্কিন ডলার প্রিমিয়ামের তুলনায় বীমা ব্যবসায়ে বাংলাদেশে মাথাপিছু প্রিমিয়াম এক ডলার মাত্র। বাংলাদেশে জীবনবীমার প্রসারের অন্তরায় কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক কারণের মধ্যে রয়েছে বিনিয়োগের রিটার্ন কম, দুর্বল গ্রাহক সেবা, যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির স্বল্পতা, মূলধন বাজারের স্বল্প উন্নয়ন এবং দুর্বল তত্ত্বাবধান।

সাম্প্রতিককালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশের মানুষের জীবনবীমা পলিসি ক্রয় না করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বিধিমালায় জটিলতা। বাংলাদেশে বীমা আইন ১৯৩৮ এখনো প্রচলিত। এই আইন সেকেলে হয়ে পড়েছে এবং এই শিল্পের বিকাশে সহায়তা করতে পারছে না। ফলে শূন্যতা দেখা দিয়েছে। এই শিল্পে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। অনেক মানুষই বিশ্বাস করে না যে, মেয়াদ পূর্তির পর সময়মতো বীমাকৃত টাকা পাওয়া যাবে। অনেকসময়ে, যথাযথ সেবা না পেয়ে জীবনবীমা পলিসি ক্রয়ের পর পলিসি হোল্ডাররা হতাশ হয়ে পড়ে। এক বা দুই কিস্তি জমা দেয়ার পর অনেক পলিসিই চালু থাকে না। বীমার বাজে ও নেতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় বীমা এজেন্টদের আচরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা গ্রাহকদের কাছে তাদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। পলিসিহোল্ডারদেরকে প্রতারিত করার প্রবণতা এখনো আছে এবং পুরো প্রক্রিয়ায় বীমা প্রতিষ্ঠানকে বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। নিজের সাময়িক লাভের জন্য কর্মীরা কোম্পানীকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে কোম্পানীর ভাবমূর্তি ধ্বংস হয়। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীগুলো, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মালয়েশিয়া ও সুদানের মতো ইসলামী বীমার জন্য যথাযথ আইন ও বিধি প্রণয়নের জন্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করে আসছে। এটা করা হলে তা আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিল্পটির সাবলীল সম্প্রসারণের সহায়ক হবে। ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীগুলো তাদের এজেন্ট হিসেবে অপেক্ষাকৃত ভাল লোকদের এজেন্ট হিসেবে নিয়োগের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাদ্রাসায় পড়াশোনা করা লোকদেরও এই শিল্পে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং কোম্পানীর জন্য তা ভাল ফল বয়ে আনছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তির মধ্যে যাদের মাঝে নীতি, নৈতিকতা এবং ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি গভীর নিষ্ঠা রয়েছে তাদেরকে মাঠকর্মী হিসেবে নিয়োগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মানুষের জীবনবীমা পলিসি গ্রহণ না করার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে জীবনবীমার সুবিধাসমূহ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। বীমা পলিসি সম্পর্কে অপর্যাপ্ত তথ্য, জীবনবীমা পলিসির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব জীবনবীমা পলিসি গ্রহণ না করার জন্য দায়ী। মানুষের বীমা পলিসি গ্রহণ না করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বিশ্বাস। যদিও বীমা ইসলামে অগ্রহণযোগ্য নয়, তবুও তথ্যের অভাব তাদের এই সন্দেহকে আরো শক্তিশালী করেছে। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সমাজের বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সমিতিসমূহ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা এছাড়া ইসলামী বীমা সংক্রান্ত পুস্তক, স্মারক, সাময়িকপত্র, পুস্তিকা, লিফলেট, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করা হচ্ছে ফলে জনগণের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে এবং ইসলামী জীবনবীমা সম্পর্কে আরো বেশি বেশি জানার ইচ্ছা মানুষ পোষণ করছে।

জীবনবীমা পলিসি গ্রহণ না করার আরেকটি কারণ হচ্ছে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর প্রভাব। লক্ষ্য করা গেছে যে, সমাজের শিক্ষিত ও প্রভাবশালী মানুষের অনেকেই জীবনবীমার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। এজন্য বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং, বীমা ও অর্থনীতি পড়ানোর ক্ষেত্রে সুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, বীমা শিক্ষা ও জীবন বীমার সামাজিক গুরুত্বের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাই যথার্থ বীমা সংক্রান্ত শিক্ষা সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া অতীব প্রয়োজন।

বাংলাদেশের মানুষের জীবনবীমা পলিসি গ্রহণ না করার বড় কারণ হচ্ছে পলিসির আকর্ষণীয়তার অভাব। এইসব সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার লক্ষ্যে ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজন পূরণের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্র বীমা প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যেখানে কেউ দৈনিক দুই টাকা বা তার চেয়েও কম সঞ্চয় করে তার বীমা পলিসি চালু রাখতে পারবে। মাসিক সঞ্চয় পেনশন স্কিম চালু করেছে যাতে প্রয়োজনের সময়ে কিস্তির পরিমাণ কমিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গবেষণা বিভাগও চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেউ কেউ এবং সম্ভাবনাময় পলিসিহোল্ডারদের বিশেষ গ্রুপের প্রয়োজন পূরণের জন্য অনেক নতুন স্কিম চালু করার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যেই হজ্ব বীমা এবং দম্পতিদের জন্য (দেন-মোহর বীমা) চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এছাড়া পারিবারিক স্বাস্থ্য বীমা প্রচলন করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে।

গ্রাহকসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য গ্রাহক সেবা বুথ চালু করা হয়েছে। যাতে করে কোন বীমা গ্রাহক টেলিফোনে তাৎক্ষণিকভাবে তার নিজের পলিসি সংক্রান্ত যে কোন তথ্য পেতে পারেন। চূড়ান্ত রশিদ প্রদানের দুই সপ্তাহের মধ্যে পলিসি

www.pathagar.com

দলিল প্রদানেরও নিশ্চয়তা প্রদান করা হচ্ছে। বীমা দাবী স্বল্পতম সময়ে নিস্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬৪ হাজার গ্রাম নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ গঠিত। আশা করা হচ্ছে যে, দুর্ঘটনা, রোগ এবং মৃত্যুজনিত সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যেও অনুভূত হবে এবং সেই সাথে ইসলামী বীমা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে পল্লী বাংলাদেশ হবে খুবই সম্ভাবনাময় বাজার। গ্রাম বাংলার মানুষকে তাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য ইসলামী জীবনবীমাকে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হলে ইসলামী জীবনবীমা শিল্পের জন্য সামাজিক অঙ্গীকার পূরণ ও ব্যবসায়িক উন্নয়ন-উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা হবে তাৎপর্যপূর্ণ।

একটি আনুমানিক হিসাবে দেখা যায়, আগামী দশকে বাংলাদেশে দরিদ্র পরিবার সংখ্যা ৫০% হ্রাস পাবে এবং মধ্য আয়ের পরিবার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হবে। এই উর্দ্ধমুখী জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের ফলে গ্রামের মানুষ দরিদ্র থেকে সমৃদ্ধির দিকে যাবে। ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আজকের জীবনবীমার যারা গ্রাহক নয়, আগামীতে বিপুল সংখ্যায় তারা প্রথমবারের মতো বীমা বাজারে প্রবেশ করবে। অত্যন্ত আশার কথা যে, বাংলাদেশের সার্বিক পরিবেশে এমন এক ধরনের আর্থ-সামাজিক শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, যার ফলে বাংলাদেশ জীবনবীমার পলিসি বিক্রয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা প্রয়োজন। অধিকন্তু, প্রিমিয়াম প্রদানের এমন একটি পদ্ধতি ও সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে যা হবে গ্রাহকের জন্য সর্বোচ্চ সুবিধাজনক ও তাদের বিশ্বাস ও আদর্শের জন্য হবে যথোপযুক্ত। ইসলামী বীমা শুধুমাত্র একটি সুযোগ নয়, বরং সমাজের প্রতি বাধ্যবাধকতা হিসেবে এটাকে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ এবং ঐতিহাসিক মিশন সম্পন্ন করার জন্য ইসলামী জীবনবীমা শিল্প ইসলামের অনন্য সাধারণ আদর্শ বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। গ্রাহক সেবার উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ, কাঙ্ক্ষিত বিপণন, মূল্যসাশ্রয়ী বিতরণ কৌশল, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযান, গণ মাধ্যমে প্রচারণা, বীমা নির্বাহীদের (মাঠ ও ডেস্ক উভয়) পেশাদারিত্বের উন্নয়ন ও সৃষ্টিশীলতার বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশের অনাবাদি বাজার ইসলামী জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য পূর্ণ সম্ভাবনাময় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

---

www.pathagar.com

দশ.

বাংলাদেশে ইসলামী জীবনবীমা সমস্যা ও সম্ভাবনা

ন্যায়নীতি ভিত্তিক সুষম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার আমাদের শাসনতন্ত্রের মৌল নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। অতএব সামাজিক সুবিচার ভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হলে তা শুধুমাত্র শাসনতান্ত্রিক অঙ্গীকার পূরণেরই সহায়ক হবে না বরং তা হবে আদর্শভিত্তিক জীবন যাপনের মহৎ উদ্যোগ।

আমরা জানি যে, বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে পেশ করা হচ্ছে এবং অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের যাবতীয় অঙ্গনে ইসলামের বিজ্ঞান ভিত্তিক নীতিমালা প্রয়োগের ব্যাপারে যথেষ্ট অনুকূল সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রে গড়ে উঠছে ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক, বীমা ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান। অত্যন্ত আশা ও গর্বের ব্যাপার এই যে, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক সুদবিহীন ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। জনগণ এই প্রচেষ্টাকে শুধু সমর্থনই করেনি বরং সক্রিয় সহযোগিতা দান করেছে।

আমরা জানি যে, সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে এদেশের ধর্মপ্রাণ উদ্যোক্তাদের ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বীমা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অধিকতর উপলব্ধি করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সুদান, তিউনিসিয়া, সৌদি আরব, ইরান, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, শ্রীলংকা প্রভৃতি রাষ্ট্রে শরীয়ত ভিত্তিক বীমা প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ এবং বাহামায় ইসলামী বীমা (তাকাফুল) প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং সফলতার দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ সচেতন ও ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশী চিন্তাবিদগণ জনগণের চাহিদা মোতাবেক ইসলামী বীমা ব্যবস্থার প্রচলনের তাগিদ অনুভব করেছেন এবং সুখের বিষয় এই যে, বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তাগণও এ ব্যাপারে সংগঠিত হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং বাংলাদেশে একাধিক ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

www.pathagar.com

বীমা নিয়ে বিতর্ক

ইসলামের দৃষ্টিতে বীমার বৈধতা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। এর মধ্যে বীমা নিয়ে বিতর্কের মাত্রা অনেক বেশি। বিতর্কের মৌল বিষয়গুলো নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে।

ক) জীবন বীমা কি জীবনের বীমা করে? বস্তুত তা নয়। জীবন বীমা একটি আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বীমাযোগ্য স্বার্থ ব্যতিরেকে বীমা করা যায় না। মানুষের জন্য ঝুঁকি যেমন অবধারিত তেমনি মৃত্যু অবধারিত। অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা আমরা এড়াতে পারি না। দুর্ঘটনার ফলে আমাদের জীবনে নেমে আসে দুঃখ, দুর্দশা ও দৈন্য। জীবন বীমার দ্বারা জীবনের আর্থিক দৈন্যতা ও আর্থিক ক্ষতির মোকাবেলা করা হয়। কারো করুণা বা দয়ার ভিক্ষা দ্বারা নয় এটি করা হয় পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে। নিজেদের পরিবার পরিজনকে কারও মুখাপেক্ষী না করে বিত্তের ব্যবস্থা করা ইসলামেরই শিক্ষা।

খ) জীবন বীমা কি সুদ ও জুয়ার সমতুল্য নয়? না, প্রচলিত বীমা সুদভিত্তিক হলেও তা জুয়ার সমতুল্য নয়। বস্তুত জুয়া যেখানে ঝুঁকি সৃষ্টি করে, বীমা সেখানে ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা করে। বীমা পদ্ধতি জুয়া বা লটারীর অনুরূপ নয় বরং এর বিপরীত। জুয়া বা লটারী যেখানে ঝুঁকি সৃষ্টি করে, বীমা সেখানে চলমান ঝুঁকিজনিত ক্ষতি নিরসনে সহায়তা প্রদান করে। ক্ষতি নিরসনে মানুষ যদি পরস্পরের প্রতি সহমর্মীতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করে তখন তা পাপ নয় পুণ্য হিসাবে গণ্য হবার কথা। বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুদমুক্ত, জুয়ামুক্ত চুক্তির দ্বারা জীবন বীমা ব্যবসা পরিচালিত হলে তা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ বলে গণ্য হতে পারে।

গ) জীবন বীমা কি ইসলামের মৌল বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়? অবশ্যই তা নয়। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী বা বিকল্প হিসাবে মুসলমানরা জীবন বীমা ক্রয় করেন না। বরং সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিচল আস্থা ও নির্ভরশীলতা বজায় রেখেই বীমা পদ্ধতির (পারস্পরিক সহযোগিতা) মাধ্যমে নিজের, নিজ পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের উদ্যোগ ইসলামের মৌল বিশ্বাসের সাথে সংঘর্ষশীল নয়। ভালো কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য কুরআনে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ২)

ইসলামী বীমা কি?

ইসলামী বীমা কি- এ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইসলাম "ফিতরাত" বা প্রকৃতির ধর্ম। অতএব, মানব প্রকৃতির প্রতিটি প্রয়োজনকে ইসলাম স্বীকার করে এবং গুরুত্ব দেয়। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই ইসলাম কিছু সীমারেখা টেনে দেয়।

www.pathagar.com

মানব জীবনের জন্য ক্ষতিকর বিষয় যেমন জুয়া, সুদ, ফটকাবাজারী ইত্যাদি ইসলাম অনুমোদন করে না। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী ব্যবস্থার অধীনে এমন কোন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান চালু করা সম্ভব নয় যেখানে জুয়া, সুদ, বা ফটকাবাজারী অবকাশ আছে। ফলে ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বীমা ব্যবসা যে পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হয়ে থাকে তা ইসলামসম্মত নয়। কারণ প্রথমত পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থার মত পুঁজিবাদী বীমা ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে পুঁজিপতির পুঁজি সৃষ্টির মাধ্যম বা হাতিয়ার হিসেবে। ইসলামী সমাজ ঠিক এর বিপরীতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে চায় যা সমাজের সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। অপরের পুঁজিকে ভিত্তি করে একটি বিশেষ গোষ্ঠী লাগামহীন মুনাফা ভোগ করবে ইসলাম তা অনুমোদন করে না।

অতএব বর্তমানে যে পদ্ধতিতে বীমা ব্যবসা পরিচালনা করা হয় তার পরিবর্তে "সকলের তরে সকলে আমরা" নীতির ওপর ভিত্তি করে বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতি অনেকটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ হবে। কিন্তু বাস্তবে সংগঠনটির অবয়ব ও গঠন প্রকৃতিতে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে গড়ে উঠবে। দেশের কোম্পানী আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠানটি রেজিস্ট্রী করা প্রয়োজন হবে এবং কোম্পানীর উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারীগণ জনগণের মাঝে খোলা বাজারে শেয়ার ছাড়তে পারবে।

তবে শেয়ার মালিকদের মূলধন এবং পলিসি গ্রাহকদের উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ করা হবে সম্পূর্ণ আলাদা হিসাবের মাধ্যমে। অর্থাৎ শেয়ার মালিকদের বিনিয়োগ থেকে যে মুনাফা আসবে তা কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের উদ্বৃত্ত তহবিল বা এর মুনাফার সাথে একীভূত করা হবে না। পলিসি গ্রাহকদের জমাকৃত চাঁদা বা প্রিমিয়ামের অংক পৃথক দুটি অংশে বিভক্ত করা হবে। শুধুমাত্র শরীয়ত অনুমোদিত খাতসমূহে এবং পদ্ধতির মাধ্যমে কোম্পানীর মূলধন ও তহবিল বিনিয়োগ করা হবে। একটি "শরীয়াহ্ তত্ত্বাবধায়ক কমিটি" কোম্পানীর সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে এবং শরীয়তের অনুমোদন/ অননুমোদন বিষয়ে মতামত প্রদান করবে।

ইসলামী পদ্ধতিতে জীবন বীমা গ্রহীতাগণকে একটি সমিতির সদস্যের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যেখানে সদস্যগণ একটি সাধারণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করবে। এই চাঁদার অর্থ শরীয়ত অনুমোদিত পথে (সুদমুক্তভাবে) বিনিয়োগ করা হবে। ইসলাম প্রবর্তিত বীমা ব্যবস্থা মূলত একটি সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান যেখানে পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি থেকে ব্যক্তি ও সমাজ উপকৃত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

বীমা ব্যবসা ও ইসলাম

বীমা ব্যবসা ইসলাম সম্মত কিনা এ বিষয়ে বিগত শতাব্দীতে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ ফিকাহ ও শরীয়তের আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা করার পর দেখেছেন যে, পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি অনুযায়ী সুদমুক্তভাবে বীমা ব্যবসা পরিচালনা করা হলে তা ইসলাম বিরোধী হবে না।

ইসলামী ব্যবস্থায় বীমা ব্যবসা যে পদ্ধতিতে কাজ করবে তা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলামী জীবন বীমা প্রচলনের ক্ষেত্রে যদি কোন শরীয়ত বিরোধী ব্যবস্থা বা পদ্ধতির ছোঁয়া না পাওয়া যায় তবে তাকে ইসলাম সম্মত না বলার কোন যুক্তি নেই। এ ছাড়াও ইসলামী বীমা ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা বিচার করতে হবে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দ্বারা।

ইসলামী বীমা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা দীর্ঘদিন থেকে আলোচনা করে আসছি। এ আলোচনার ফলশ্রুতিতে আমরা যা বুঝেছি তা নিম্নরূপ ঃ

ক) আমরা লক্ষ্য করেছি, বীমা ও জুয়া সম্পূর্ণ আলাদা ও বিপরীতধর্মী এবং ইসলাম ধারণাযোগ্য ঝুঁকি মোকাবেলার নীতি অনুমোদন করে।

খ) আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বর্তমান যুগে বীমার অনেকগুলো অত্যাবশ্যক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপযোগিতা রয়েছে।

গ) আমরা জানি, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অনুসৃত বীমা পদ্ধতির বিভিন্ন ত্রুটি রয়েছে এবং এ পদ্ধতি ইসলামী শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ঘ) আমরা অনুভব করি যে, ইসলামী শরীয়ার আওতাধীনে একটি নতুন বীমা পদ্ধতি চালু করা যায় যার ভিত্তি হবে আল-তাকাফুল বা যৌথ নিশ্চয়তা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা।

ঙ) বীমার নতুন পদ্ধতি (তাকাফুল) অনুসরণ করলে তা বীমাগ্রহীতা, বীমাকারী এবং সাধারণভাবে সমাজের জন্য অধিকতর সুফল বয়ে আনবে।

সমস্যাসমূহ (সাধারণ সমস্যা)

ইসলামী বীমার সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে প্রথমে আমাদের শিক্ষিত সমাজের একাংশের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। ইসলামী কোন প্রতিষ্ঠান এই সমাজে বাস্তবায়িত হোক সমাজের এক শ্রেণীর লোক তা কামনা করে না, বরং অনেকেই এর বিরোধিতা করেন। ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির ঘন কুয়াশা আমাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, এ সম্পর্কে কোন আলোচনাও অনেকে অপছন্দ করেন। এরা কিন্তু অধিকাংশই শিক্ষিত ও এলিট শ্রেণীভুক্ত। এরা সবাই যে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে এমনটি করেন তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেহায়েত

www.pathagar.com

অজ্ঞতা থেকে তাদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের প্রধান সমস্যা এই যে, সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে এ ধরনের অজ্ঞতা ও সংশয় অধিক পরিমাণে বিরাজ করছে। এই দুঃখজনক বাস্তবতা কিন্তু হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মত সৃষ্টি হয়নি। বরং শতাব্দীর পুঞ্জিভূত ক্রম অবক্ষয়ের চরম পরিণতি এ অবস্থার জন্য দায়ী।

বিগত কয়েক শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান, শিক্ষা, গবেষণা, চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্বের সৃষ্টি হয়েছিল তার চরম পরিণতি ও অশুভ প্রভাবের ফলেই শিক্ষিত শ্রেণীর মুসলমানরা পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার রঙিন চশমা ব্যতিরেকে কোন কিছু দেখতে পান না। পাশ্চাত্যের নয়, এমন কোন কিছু তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে না বা বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করে না। আপাত বিরোধী মনে হলেও এ কথা সত্য যে, পাশ্চাত্যের সভ্যতা-সংস্কৃতির লালন ও অন্ধ অনুকরণ আমাদের এক ধরনের নেশা বা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

আমাদের মধ্যে যারা পাশ্চাত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত নিজেদের ধর্মের জ্ঞান এদের অতি সীমিত। স্বাভাবিকভাবে ইসলামী নীতিমালা অনুসারে কোন প্রতিষ্ঠান চালু করার জন্য শরীয়তের বিধি-বিধানের বিষয় উত্থাপিত হলে এসব প্রস্তাবের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা তাদের জন্য কষ্টকর হয়। ফলে যে কোন প্রস্তাব পাশ কাটিয়ে চলা বা ধামাচাপা দিয়ে রাখা এদের পক্ষে স্বাভাবিক। ইসলামী বীমা চালুর ক্ষেত্রে আমাদের সামনে যে সব বাধার প্রাচীর রয়েছে তা কিন্তু অলংঘনীয় নয়।

এখানে মৌলিক যে সমস্যা তা হচ্ছে অনেকে এটা বিশ্বাস করেন না যে, ইসলামী নীতিমালার আলোকে বীমা ব্যবস্থার প্রচলন হলে সমাজকল্যাণের ইপ্সিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন সম্ভব। এটি অবশ্যই ইসলামের কোন ত্রুটি নয়। ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের চরম অজ্ঞতা থেকে এই অবিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। অতএব আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নিকট ইসলামী বীমার নীতিমালা ও বিশেষত্বসমূহ ব্যাখ্যা করা। শরীয়া আইনের গতিশীলতা এবং কিভাবে তা প্রতিযুগের প্রগতিকামী মানব সমাজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম সে সম্পর্কে সবার স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। আমরা যদি এসব করতে পারি তাহলেই ভ্রান্তির কুয়াশা দূরীভূত হবে এবং সমাজের বুদ্ধিজীবীগণ ইসলামী বীমা স্কীমসমূহ সমর্থন দেবেন।

ইসলামী বীমার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে প্রধান বাধা হচ্ছে শরীয়ত সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণার অভাব। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশই ইসলামী শরীয়ত বা বিধি-বিধান একালে অচল বলে মনে করেন। তারা মনে করেন অতীতে যে সব আইন-কানুন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বা প্রয়োজনে প্রণয়ন করা হয়েছিল সেগুলো পুনঃপ্রবর্তন করা নির্বুদ্ধিতারই শামিল।

কিন্তু শরীয়তের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জীবনকে সভ্য, সুন্দর ও পবিত্ররূপে গড়ে তোলা, এবং মানব জীবন হতে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার ও পাপ-পংকিলতা মুক্ত করা।

www.pathagar.com

শরীয়তের মূল লক্ষ্য যদি আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে জীবনের লক্ষ্য এবং ইসলামী জীবনবীমার তাৎপর্য উপলব্ধি করা আমাদের জন্য সহজসাধ্য হবে। শরীয়তের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জীবনকে সৎ, সুন্দর, ন্যায় ও পবিত্রতার ভিত্তিতে গড়ে তোলা। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয়েছে "মারুফাত" বা "ভাল কাজ"। এর বিপরীতে যা কিছু অন্যায়, অসুন্দর, পাপ-পংকিলতায় পরিপূর্ণ তাকে বলা হয়েছে "মুনকারাত" বা মন্দ কাজ। মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে ভালো কাজে সহযোগিতা ও মন্দ কাজের বিরোধিতা করার।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাপ-পুণ্যের কোন তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে শরীয়তের বিধি-বিধানকে সীমিত করে রাখা হয়নি। শরীয়ত মানব জীবনের জন্য একটি পরিপূর্ণ ছক বা নকশা পরিবেশন করেছে যার ফলে মানবীয় সৎ গুণাবলী বিকশিত হতে পারে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য শরীয়তে সেই সব কাজ ও পদ্ধতিকে উৎসাহিত ও অনুমোদিত করা হয় যা সৎ ও সুন্দরকে বিকশিত করতে পারে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে মারুফাত বা ভাল কাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা- ক. নির্দেশমূলক (ফরয/ওয়াজিব), খ. উপদেশমূলক (মতলুব), গ. অনুমোদিত (মুবাহ)। শরীয়তে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি এমন সব কাজকেই মুবাহ বলা হয়। অনুমোদনযোগ্য মারুফাতের (মুবাহর) পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সুস্পষ্ট নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার বাইরে "মুবাহ" কোনটি তা যুগে যুগে সময়ের দাবি অনুযায়ী নির্ধারিত করবার দায়িত্ব ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণের।

আমাদের তৃতীয় যে সাধারণ সমস্যা তা হচ্ছে এই যে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শরীয়তের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের জন্য ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ, ইসতিহসান প্রভৃতির প্রতি আমাদের অনীহা। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা, অনুসিদ্ধান্ত, রায় ও বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও অনগ্রসরতা ইসলামী প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির পথে একটি প্রধান অন্তরায়। অগাধ পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি সময়ের ও সমাজের দাবি এই যে, তারা যেন নিজেদের মেধা, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তির সাহায্যে শরীয়ার আলোকে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও প্রয়োগে সহযোগিতা দান করেন। এখানে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন। কেননা প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার, নীতি, পদ্ধতি, সমস্যাসমূহকে প্রথমে চিহ্নিত ও বিন্যস্ত করতে হবে। এরপর এসব বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য কি তা উদঘাটন করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে, ইসলামের বক্তব্য বিষয়গুলো আধুনিক গবেষকদের ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় নেই। কারণ এগুলো আধুনিক জ্ঞানের অনুরূপ শ্রেণীবদ্ধ নয়। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতগণ প্রায়শ এগুলো মর্ম অনুধাবনে ব্যর্থ হন। ইসলামী জ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার অনুসন্ধানের উদ্যম ও সময় এসব জ্ঞানী ব্যক্তিদের নেই।

www.pathagar.com

অন্যদিকে প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত আলেমগণ আধুনিক বীমা ব্যবস্থার বিস্তারিত বিষয়াদি সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন এগুলো সাথে ইসলামী বিধানের সম্পর্ক নির্ণয়েও ব্যর্থ হন। অতএব বীমা ব্যবস্থার বিস্তারিত দিকসমূহের ওপর যথেষ্ট আলোচনা ও প্রশিক্ষণ হওয়া প্রয়োজন। যাতে করে আমাদের আলেমগণ প্রস্তাবিত পদ্ধতিসমূহের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত ও রায় প্রদান করতে পারেন। ঠিক একইভাবে আধুনিক বীমা ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ও বিশেষজ্ঞদেরকে ইসলামী শরীয়ত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামের পণ্ডিতগণ কিভাবে আধুনিক বীমা ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ও বিশেষজ্ঞদেরকে ইসলামী শরীয়ত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামের পণ্ডিতগণ কিভাবে অনুধাবন করেছেন, সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছেন তা জানতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে। এর ফলে সম্ভব হবে পাশ্চাত্যের বীমা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রকৃত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া।

চতুর্থ সাধারণ সমস্যা হচ্ছে এই যে, একালে শরীয়তের সকল বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। শরীয়তের কিছু অংশ গ্রহণ এবং কিছু অংশ বর্জন সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ শরীয়তকে সামষ্টিকভাবে পালন না করা হলে সমাজে পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। যেমন সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা কখনই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না যদি না পাশাপাশি সুদমুক্ত শরীয়ত ভিত্তিক বীমা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আবার সুদমুক্ত বিনিয়োগ ব্যবস্থার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকলে ইসলামী ব্যাংক বা ইসলামী বীমার জন্য তা সুফল বয়ে আনবে না। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান চালু না হলে ইসলামী ব্যাংক, বীমা, বিনিয়োগ সবকিছুই হোঁচট খেতে থাকবে।

শরীয়তের প্রতিটি হুকুমকে কাজে পরিণত করা ও তার প্রতিটি অংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মুসলমানদের জন্য একান্ত কর্তব্য। এরূপ করা হলে কুরআনের নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে মানা হয়। কুরআনে বলা হয়েছে "তোমরা কি কুরআনের কতক অংশ বিশ্বাস কর কতক অংশ অবিশ্বাস কর? তাই যদি হয়, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তাদের শাস্তি হল দুনিয়ার জীবনে চরম লাঞ্ছনা এবং কেয়ামতের দিনে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে কঠিন আযাবের মধ্যে"।

"ইসলামী বীমা" ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে শরীয়তের বিধি মোতাবেক পরিচালিত করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। প্রচলিত বীমার সবকিছু হুবহু রেখে দিয়ে শুধুমাত্র ভাষাগত কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন করলেই তা "ইসলামী বীমা" হিসাবে পরিগণিত হবে না। শরীয়া আইন মোতাবেক কিছু কিছু পরিবর্তন করা হল আর কিছু কিছু পরিবর্তন করা হল না তা শরীয়ার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং এরূপ করলে আমাদের জন্য চরম লাঞ্ছনা ও পরকালীন কঠিন শাস্তির বিষয়ে কুরআনে সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

সাময়িক সমস্যা

ইসলামী বীমা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পথে কতিপয় সাময়িক সমস্যার প্রতি আমরা এবারে দৃষ্টিপাত করব। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ইসলামী বীমা কোম্পানী এবং একাধিক প্রচলিত জীবন বীমা (Conventional Life Insurance)- "ইসলামী বীমা প্রকল্প" নামে কাজ করলেও বীমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব ও কার্যপদ্ধতির ব্যাপারে বিশেষ বিধি বা আইন প্রচলনের উদ্যোগ এখনও নেয়া হয়নি। যেহেতু ১৯৩৮ সালের বীমা আইনের অধীনে ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, সেহেতু আপাত দৃষ্টিতে একথা বলা যায় যে, ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রেও ১৯৩৮ সালের বীমা আইন প্রযোজ্য হবে। কিন্তু ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানীর সংঘ স্মারকে (Memorandum) স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, শরীয়া আইন অনুযায়ী কোম্পানীর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবি হচ্ছে এই যে, ইসলামী বিধি মোতাবেক যারা বীমা ব্যবস্থা পরিচালিত করতে চান তাদেরকে আইনগতভাবে তা করার জন্য বিধিগত সমর্থন প্রদান। অন্যথায় সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির নিরসন করা দুরূহ হবে।

প্রচলিত বীমা আইনের কতিপয় ধারার প্রয়োগ ইসলামী বীমার জন্য রহিত করা যেতে পারে, কিংবা ইসলামী বীমার জন্য নতুন বীমা আইন প্রণয়ন ও প্রচলন করা যেতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশে এর উদাহরণ রয়েছে। এজন্য বীমা অধিদপ্তরে ইসলামী বীমার জন্য "বিশেষ সেল" গঠন করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত সেল বা শাখা শরীয়াহ ভিত্তিক বীমা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য আইনগত ও বিধিগত জটিলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীভূত করার উদ্যোগ নিতে পারে।

ইসলামী জীবন বীমার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সাময়িক সমস্যা হচ্ছে এই যে, প্রচলিত "জীবন বীমার" প্রিমিয়াম হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক বিনিয়োগ আয়কে হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। যেহেতু ইসলামী জীবন বীমার বিনিয়োগ সুদমুক্ত ব্যবস্থায় করতে হবে সেহেতু প্রতিটি "প্রডাক্ট" এর প্রিমিয়াম হার নির্ধারণের জন্য সুদের পরিবর্তে সম্ভাব্য মুনাফাকে ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা প্রয়োজন। সম্ভাব্য মুনাফার ভিত্তিতেও প্রিমিয়াম নির্ধারণ করতে সক্ষম বিধায় এ সমস্যা হতে উত্তরণ সহজসাধ্য হবে।

ইসলামী "জীবন বীমা"র ক্ষেত্রে আর একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক সমস্যা হচ্ছে সর্বস্তরের মানুষের কাছে ইসলামী জীবনবীমার ধারণাগত ও পদ্ধতিগত (Conceptual and Procedural) রূপরেখা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব। ইসলামী জীবন বীমার ওপর পুস্তক-পুস্তিকা, প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী লেখার অভাবের ফলেই এ সমস্যার উদ্ভব। জীবন বীমার ইসলামী বাস্তবায়নের ইতিহাস তিন দশকেরও কম। মুসলিম দেশসমূহে ব্যাপকভাবে ইসলামী জীবন বীমার ওপর পর্যাপ্ত আলোচনা, গবেষণা না হওয়ার ফলে

www.pathagar.com

যারা জীবন বীমার ইসলামী রূপায়ণ দিতে এগিয়ে এসেছেন তাদের মধ্যেও এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ধারণার অভাব রয়েছে। এর ফলে দৈনন্দিন কাজ-কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ও অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। ইসলামী বীমার ব্যবস্থাপনায় যারা নিয়োজিত হবেন তারা যদি প্রথম থেকেই সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য, উপাত্ত, সাহিত্য, জ্ঞান, গবেষণার উপাদানসমূহ নিজেদের আয়ত্বে আনতে সচেষ্ট হন এবং প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সঠিক সমাধানের পথসমূহ চিহ্নিত করতে সক্ষম হন তাহলে এ সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব।

ইসলামী জীবন বীমা বাস্তবায়নের চতুর্থ সাময়িক সমস্যা হচ্ছে উপযুক্ত ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব। দেশের বীমা পেশাজীবীদের মধ্যে ইসলামী বীমা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উভয়টির অভাব রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি স্বাভাবিক। ফলে প্রচলিত বীমার কর্মীবাহিনী ও নতুন অনভিজ্ঞ নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদেরকে পরিকল্পিতভাবে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ইসলামী জীবনবীমার উৎস, ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য, প্রচলিত বীমার সঙ্গে এর তফাৎ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ছাড়াও নীতি, নৈতিকতা, সততা ও নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পেশাগত শিক্ষার বিষয়টিকে সম গুরুত্ব দিতে হবে। কর্মীবাহিনীর আদর্শবাদিতা ও পেশাগত উৎকর্ষতার সমন্বিত রূপায়ণের ওপর নির্ভর করছে ইসলামী জীবনবীমার সফলতার গতি। এক্ষেত্রে অনীহা বা অবহেলা আত্মঘাতী হবে বিধায় বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

চলতি সমস্যা

আমাদের দেশের বীমা বাজারে ও প্রচলিত জীবনবীমায় যে সব মৌলিক সমস্যা বিরাজমান, ইসলামী বীমার ক্ষেত্রেও তা সমভাবে বর্তাবে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ 'বীমা' বলতে জীবন বীমাকেই বুঝে থাকে। সাধারণ বীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা অত্যন্ত সীমিত বা নেই বললেই চলে। কিন্তু জীবন বীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা ইতিবাচক নয় বরং নেতিবাচক বলা চলে। বীমা সম্পর্কে মানুষের ধারণা নেতিবাচক হওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। আজকের আলোচনায় সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি জীবনবীমা সম্পর্কে মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। কেননা জীবনবীমা ব্যবস্থা অবশ্যই জনকল্যাণমুখী ধ্যান-ধারণা হতে উৎসারিত। মানুষের কল্যাণ বা মঙ্গল যেখানে নিহিত সেখানে মানুষ যদি এর সুফল সম্পর্কে সন্দিহান হয় তবে বুঝতে হবে সমস্যাটির জন্য বীমা ব্যবস্থা নয় বরং এর সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গই এর জন্য দায়ী। জীবন বীমার কল্যাণমুখী দিকসমূহ মানুষের নিকট তুলে ধরতে না পারার জন্য আমাদের ব্যর্থতা দায়ী।

www.pathagar.com

ইসলামী বীমার প্রস্তাব মানুষের নিকট যখন পেশ করা হয় তখন এদেশের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাৎক্ষণিক ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া পড়ে যাবে এমন নয়। জীবনবীমা সম্পর্কে মানুষের অনীহার মধ্যেই ইসলামী বীমার কর্মীদের কাজ করতে হবে এবং মানুষের মধ্যে বীমা ব্যবস্থার প্রতি আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনতে হবে। এ কাজটি করা সহজ হবে যদি গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে যে সমস্ত বীমা কর্মী মানুষের নিকট ইসলামী জীবনবীমার সওগাত বয়ে নিয়ে যাবেন তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও নৈতিকমানে উন্নীত করা হয়। বীমা প্রতিনিধি বা এজেন্টদের আচার, আচরণ, চারিত্রিক মাধুর্য, সেবা, সততা, সত্যবাদীতা ইত্যাদি গুণাবলীর ওপর ইসলামী জীবনবীমার সফলতা অধিকাংশ নির্ভরশীল।

প্রচলিত জীবনবীমার দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই বীমা ব্যবস্থায় মানুষের পরিবর্তিত প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী বিস্তার ও বিভিন্নমুখী বীমাপত্র চালু করা হয়নি। প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে প্রায় শতাধিক জীবনবীমার প্রডাক্ট বা বীমা পলিসি চালু রয়েছে। একথা সত্য যে, সব পলিসির সমান চাহিদা নেই। কিন্তু সব ধরনের চাহিদা মেটানোর জন্য বীমা কোম্পানীসমূহকে অবশ্যই নানামুখী বীমা পলিসি তৈরী করতে হবে। এটি করা সম্ভব হলে সর্বস্তরের সকল মানুষের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে বীমার বাজার ক্রম সম্প্রসারিত হতে থাকবে। এ জন্য প্রয়োজন সার্বক্ষণিক বাজার গবেষণা (Continuous Market Research)। অতি সম্প্রতি জীবনবীমার ক্ষেত্রে পল্লীর জনসাধারণ, নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কতিপয় নতুন বীমা স্কীম চালু করার সুফল ইতোমধ্যে বাজারে লক্ষ্য করা গেছে। বাজার-গবেষণাকে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ না করে ক্রমাগত ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামী জীবন বীমার ক্ষেত্রেও সুফল বয়ে আনবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অতি সম্প্রতি দম্পত্তি (দেনমোহর) বীমা এমন একটি সফলতার দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে অভিযোগটি প্রায় করা হয় তা হচ্ছে এর সেবার মান। গ্রাহক সেবার নিম্নমুখী মান মানুষকে বীমার প্রতি বিমুখ করেছে বলে অনেকে মনে করেন। বিশেষ করে বিক্রয়োত্তর সেবা (After Sales Service) নিশ্চিত করা হয় না বলে বীমাগ্রাহকগণ প্রায়ই অসন্তুষ্ট থাকেন। একজন অসন্তুষ্ট গ্রাহক যদি দশজনের নিকট তার অসন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করেন তবে বাকী এই দশজনের নিকট পরবর্তীতে বীমাপত্র বিক্রয় করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বীমা পেশাজীবীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত থাকেন যে, বাজারের দীর্ঘমেয়াদি ও ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার ফুরসত পান না। যেহেতু বীমা একটি সেবাশিল্প, সেহেতু বিক্রয়পূর্ব বা বিক্রয়োত্তর সেবার দিকটিকে খাটো করে দেখবার কোন অবকাশ নেই। ইসলামী বীমার পণ্য নিয়ে যারা মাঠে– ময়দানে কাজ করবেন, যারা বিপণন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত

www.pathagar.com

থাকবেন তারা যদি সার্বক্ষণিকভাবে সেবার মান নিশ্চিত করতে সক্ষম হন তাহলে প্রতিটি সন্তুষ্ট গ্রাহক বীমা কোম্পানীর পক্ষে নীরবে বিপণন কর্মী হিসেবে কাজ করে যাবেন। বীমার বাজারে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং বীমা প্রতিনিধিদের দেখে মানুষ দূরে সরে না গিয়ে সানন্দে এগিয়ে আসবে।

প্রচলিত বীমার চতুর্থ সমস্যা হচ্ছে এর অতিরিক্ত Overhead Expense বা মাথাপিছু ব্যয়। বিশেষ করে জীবনবীমার ক্ষেত্রে সংগ্রহ ব্যয় বেশী হওয়ার কারণে অনেক দেশে বিতরণ ব্যবস্থার বিকল্প পথ ও পদ্ধতির ব্যবহার করা হচ্ছে। বলা হয় যে, জীবনবীমার প্রথম বছরের এক টাকা প্রিমিয়াম আয়ের জন্য এক টাকা পঁচিশ পয়সা ব্যয় হয়। বিপণন ও বিতরণ ব্যবস্থায় গুণগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হলে ইসলামী বীমার উদ্বৃত্ত প্রচলিত বীমার চাইতে বেশী হবে। এর ফলে বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতাগণ অধিকতর উপকৃত হবেন। ইসলামী বীমার ব্যয়ভার কম হলে জনগণ এর প্রতি অধিক আকৃষ্ট হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমার সমন্বিত ও যৌথ উদ্যোগ অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকর হবে।

প্রচলিত জীবনবীমার আরও একটি সমস্যা হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত Lapsation বা অতিবাহিত বীমার হার। বলা হয় যে, বীমা বিক্রয়ের প্রথম দুই বছরের মধ্যেই পাঁচ ভাগের প্রায় তিনভাগ পলিসি বন্ধ হয়ে যায়। এ সমস্যাটি অবশ্য পৃথক কোন সমস্যা হিসেবে না দেখে প্রচলিত বীমার ত্রুটিপূর্ণ বিপণন ব্যবস্থার ফল হিসাবে দেখা যেতে পারে। বাজারে নানা ধরনের অনৈতিক পদ্ধতি (Unethical Practice) চালু থাকার ফলেই এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। কমিশন ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার যৌক্তিক পরিবর্তন ঘটিয়ে Lapsation-এর হার কমানো সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত

১৯৭৯ সালে সুদানে প্রথম ইসলামী বীমা কোম্পানী চালু হবার পর বিগত দুই দশকে পৃথিবীর প্রায় পঁচিশটি দেশে ৭০টির অধিক ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে বলে আমরা জানি। আমরা এও জানি যে, পৃথিবীর ৪৫টি দেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আফ্রিকার সুদানে ইসলামী বীমার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রপাত হলেও বর্তমানে এশিয়া মহাদেশে ইসলামী বীমার ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রসার ঘটেছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় যে, ইসলামী বীমার প্রচার, প্রসার ও ব্যাপকতার সম্ভাবনা এদেশে অনেক বেশি। সম্ভাবনার কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো ঃ

১. ইসলামী বীমা প্রচলিত বীমার সাথে পাল্লা দিয়ে এদেশের জনগণের নিকট অধিকতর গ্রহণীয় হবে তখনই যখন গ্রাহকরা উপলব্ধি করবে যে, ইসলামী বীমার মাধ্যমে গ্রাহক স্বার্থ অধিকতর সুচারুরূপে সংরক্ষিত হচ্ছে। যখন তারা দেখবে ও

www.pathagar.com

বুঝবে যে, ইসলামী বীমা শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে কম খরচে গ্রাহকদেরকে অধিকতর সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের অনুসারী নয় এমন জনগোষ্ঠীও এই বীমা ব্যবস্থার প্রতি তাদের আস্থা প্রকাশ করবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সিঙ্গাপুরের কথা, সেখানে কমপক্ষে দুইটি বীমা প্রতিষ্ঠান তাকাফুল বা ইসলামী বীমা প্রকল্প চালু করেছে। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে যে, সিঙ্গাপুরের ইসলামী বীমাগ্রাহকদের প্রায় ২২% হচ্ছে অমুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার সাথে তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে না পারলে এটি হওয়া সম্ভব নয়।

২. বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি থাকলেও সাধারণ মানুষের মনে "ইসলাম" সম্পর্কে রয়েছে শ্রদ্ধামিশ্রিত আবেগ ও ভালবাসা। যে কোন ইসলামী উদ্যোক্তার জন্য এটি অত্যন্ত আশার কথা। সাম্প্রতিক কালে পণ্য উৎপাদনকারীরা "হালাল" শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা এর সুফল পেতে শুরু করেছেন। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের সফলতা ও গ্রহণযোগ্যতা একথা সুপ্রমাণিত করেছে যে, ইসলামী বীমার ক্ষেত্রেও সফলতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হবে। সর্ব সাধারণের মধ্যে সচেতনতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ জীবনবীমার প্রয়োজনীয়তা বেশী বেশী উপলব্ধি করবে এবং শরীয়াসম্মত পদ্ধতিতে জীবনবীমা ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হবে। এ জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইসলামী জীবনবীমা সম্পর্কে প্রচার ও এর সফলতাসমূহ তুলে ধরা।

৩. বীমা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগে ঝুঁকি মোকাবেলার একটি পদ্ধতি হিসেবে। বর্তমান কালে ইসলামী বীমা যে পথ ও পদ্ধতিতে বীমা ব্যবস্থার রূপায়ণ ঘটাচ্ছে তাকে আমরা Mutual Insurance এর শরীয়াসম্মত সংস্করণ বলতে পারি। পলিসি মালিকদের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় "না-লাভ, না-ক্ষতি" এই ভিত্তিতে বীমা ব্যবস্থা পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। অনেক দেশে মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স পদ্ধতিতে প্রচলিত বীমা অত্যন্ত সফলতা লাভ করেছে। বিশেষ করে জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মিউচুয়াল বীমার সফলতা প্রমাণ করে যে, ইসলামী বীমার ক্ষেত্রেও পরিচালনা ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে অধিক উদ্বৃত্ত নিশ্চিত করা সম্ভব। বীমাগ্রহীতাগণ যখন উদ্বৃত্তের অংশ ফেরত পাবেন তখন স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রিমিয়াম প্রচলিত বীমার প্রিমিয়াম থেকে কম হবে। পলিসি গ্রাহকগণ চুক্তি মাফিক লাভের অংশ যত বেশী পাবেন, ইসলামী জীবনবীমা তত বেশী প্রসার লাভ করবে।

৪. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক সমূহ তাদের প্রায় ২০০টি শাখার মাধ্যমে সারা দেশে প্রায় দশ লক্ষাধিক গ্রাহকের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। ইসলামী জীবনবীমা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান এই লক্ষ লক্ষ পরিবারে পলিসি বিক্রয়ের সুযোগ বা সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তি বীমা ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকসহ সকল ইসলামী প্রতিষ্ঠানে "গ্রুপ বীমা" চালু করার উদ্যোগ সফলতা লাভ করবে বলে আশা করা যায়। "গ্রুপ বীমা" শুধুমাত্র ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের নয়, যে কোন প্রতিষ্ঠানে এর উপযোগিতা রয়েছে। যেহেতু "গ্রুপ বীমার" প্রচলন বর্তমানে অত্যন্ত সীমিত আকারে রয়েছে, সেহেতু ইসলামী জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান সম্ভাবনাময় এই বাজারকে সম্প্রসারিত করার সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

৫. আমাদের দেশে স্বাস্থ্য বীমার প্রচলন অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে। গ্রুপ বীমার মত স্বাস্থ্য বীমার সম্প্রসারণ ইসলামী জীবনবীমার জন্য একটি নতুন ও প্রায় অনাবিষ্কৃত বাজারের সৃষ্টি করতে পারে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতামূলক চুক্তি ও সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হলে বাংলাদেশের Formal Sector এ বিশেষ করে চাকুরীজীবীদের মধ্যে স্বাস্থ্য বীমার বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব বলে মনে হয়। আমাদের দেশে স্বল্প ও নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থায়নের উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। ইসলামী জীবনবীমা পদ্ধতির মাধ্যমে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব। শুধু চাকুরীজীবী নয় পেশাজীবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও সমর্থনে স্বাস্থ্য বীমার বাজার সম্প্রসারিত হতে পারে।

৬. শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জনসাধারণ নয় বরং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বীমার চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা (Non-Government Organisations) ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে মেয়াদী জীবনবীমা পদ্ধতি অত্যন্ত সফলতার সাথে চালু করেছে। প্রচলিত বীমার বাইরে এসব প্রতিষ্ঠান নিজেরাই এক ধরনের স্ব-বীমা (Self Insurance) পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারী/সকল সদস্যের জন্য জীবনবীমা প্রচলনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পাশাপাশি নতুন একটি তহবিল গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। এই তহবিল হতেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পুনঃঋণ প্রদান সম্ভব হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকসহ যে সব সাহায্যকারী সংস্থা সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু করেছে সেখানে ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে মেয়াদী বীমা প্রচলন করা সম্ভব।

৭. হজ্জ বা জেয়ারত গমনেচ্ছুদের জন্য ইসলামী জীবনবীমার বিশেষ পলিসি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উপযোগী হতে পারে। ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ পেশাজীবীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ও মতের ভিত্তিতে মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক প্রভৃতিদের জন্য বিশেষ বীমাপত্র চালু করার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। কেননা এতে করে সেই

www.pathagar.com

সব জনগোষ্ঠীকে বীমার আওতাভুক্ত করা সম্ভব হবে যারা পূর্বে কখনও বীমা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে অপারগতা বা অনীহা প্রকাশ করেছেন।

৮. সমাজের উচ্চবিত্ত ও ধনী ব্যবসায়ীদের জন্য Annuity বা একক প্রিমিয়াম বীমা বাংলাদেশে চালু করার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উঠতি ধনিক শ্রেণীর চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাবে Annuity এবং Single Premium Policy প্রচলন করার ক্ষেত্রে ইসলামী জীবনবীমা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

৯. ইসলামী বীমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর স্বচ্ছতা। পলিসি গ্রাহকদের অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হবে, বিনিয়োগ করা হবে, লাভ কিভাবে বণ্টন করা হবে এসব পরিষ্কারভাবে চুক্তিপত্রে ঘোষণা করতে হয়। এর ফলে সম্ভাব্য গ্রাহকদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি সহজতর হবে। জীবনবীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে নেতিবাচক ধারণার মূল কারণ হচ্ছে আস্থার অভাব। স্বচ্ছতার মাধ্যমে আস্থা সৃষ্টির দ্বারা ইসলামী জীবনবীমা জনমনে ইতিবাচক সাড়া ফেলতে সক্ষম হবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

১০. স্বচ্ছতা ও আস্থা সৃষ্টির জন্য বীমার গ্রাহক ও অপারেটরদের মধ্যে তথ্য প্রবাহ ও যোগাযোগ সার্বক্ষণিকভাবে হওয়া প্রয়োজন। তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের দ্বারা ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানী প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের নিকট সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত হিসাব ও কোম্পানীর নতুন প্রডাক্ট ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম হলে ইসলামী জীবনবীমার অগ্রযাত্রা সহজ হবে। ইলেক্ট্রনিক কমার্স, ইন্টারনেট, ওয়েব সাইট ইত্যাদির ব্যবহার ইসলামী জীবনবীমার প্রচার ও প্রসারে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

১১. বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের বীমা ব্যবসার অগ্রগতি যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব যে, জীবনবীমার প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি পেয়েছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে জীবন বীমার গ্রস প্রিমিয়াম আয় ছিল ১০০ কোটি টাকার কম কিন্তু গত এক দশকে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৬০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। প্রাইভেট সেক্টর ও পাবলিক সেক্টর উভয় ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, সাধারণ বীমার গ্রস প্রিমিয়াম ছিল ১৯৯১ সালে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ জীবনবীমার প্রিমিয়াম প্রবৃদ্ধি সাধারণ বীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশী হয়েছে। এই প্রবৃদ্ধি ইসলামী জীবনবীমার ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশী হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর।

১২. পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বীমার অগ্রগতি অত্যন্ত অপ্রতুল। যেমন একজন জাপানী গড়ে বছরে জীবনবীমার জন্য প্রায় ১,৭০,০০০/- (এক

www.pathagar.com

লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে থাকেন। সেখানে বাংলাদেশে জনপ্রতি জীবনবীমার গড় বার্ষিক প্রিমিয়াম মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার মত। এ তথ্য আমাদের আশাহত নয় বরং আশান্বিত করে। কারণ সামনে অনেক অনেক বেশী অগ্রসর হবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিবেশী দেশসমূহ যেমন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকার তুলনায়ও আমাদের প্রিমিয়াম অত্যন্ত কম। ভারতে জন প্রতি বার্ষিক জীবনবীমার প্রিমিয়াম ব্যয় ছয় ডলারের বেশী কিন্তু বাংলাদেশে তা এক ডলারের কম।

১৩. সাধারণ মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা যত বাড়বে, জীবনবীমার চাহিদা তত বৃদ্ধি পাবে। আমাদের মাথাপিছু আয়, জিডিপি ইত্যাদি যেমন বাড়ছে তেমনি মুদ্রাস্ফীতির হার এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় কম। জীবনবীমার ক্রমবৃদ্ধির জন্য অর্থনীতির এই চিত্র আমাদের আশান্বিত করে যে, বর্তমান শতাব্দীতে বাংলাদেশে জীবনবীমার চাহিদা ক্রম সম্প্রসারিত হবে।

১৪. অর্থনৈতিক পরিবর্তন আমাদের সমাজ জীবনে প্রভাব ফেলতে শুরু করছে। আমাদের গড় আয়ু বাড়ছে। আগামী দশকে বাংলাদেশে ষাটোর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। বয়স্কদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই বীমা স্কীমের প্রয়োজন হবে। বৃদ্ধ বয়সে পেনশন প্রদানের জন্য ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে Group Super annuation স্কীম চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরনের স্কীম চালু করার জন্য ইসলামী জীবনবীমা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-কন্যার মুখাপেক্ষী হতে অনেকেই অপছন্দ করবেন এবং আগামীতে ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধ পিতামাতার দায়-দায়িত্ব নেবে এমন মন-মানসিকতা লোপ পেতে থাকবে। পেনশন বীমার ব্যাপক প্রচলন এ অবস্থা হতে উত্তরণে সহায়ক হবে।

১৫. সর্বশেষ কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইসলামী জীবনবীমার সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব ও উপযোগিতার ভিত্তিতে। প্রচলিত জীবনবীমার তুলনায় ইসলামী জীবনবীমা যদি অধিকতর কল্যাণমুখী, গণমুখী ও সেবামুখী না হয় তবে শুধুমাত্র ইসলামী হওয়ার কারণেই তা সফল হবে না। মুসলমান হিসেবে যেহেতু আমাদের বিশ্বাস যে, ইসলাম শ্রেষ্ঠতম ধর্ম। তাহলে অবশ্যই মানতে হবে যে, ইসলামের নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত যে কোন প্রতিষ্ঠান যেকোন পদ্ধতি শ্রেষ্ঠতর নয় বরং শ্রেষ্ঠতম (The Best) হবে। বাংলাদেশে সম্প্রতি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ পরপর কয়েক বছর দেশের শ্রেষ্ঠতম ব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ উদাহরণ আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। এর ব্যতিক্রম হলে সে ত্রুটির দায়-দায়িত্ব হবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে ত্রুটি বা অব্যবস্থাপনার- ইসলামী পদ্ধতির নয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে জীবনবীমা

১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৩৮ সনের বীমা আইনকে ঠিক রেখে বাংলাদেশের বীমা কোম্পানীগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য ১৯৭২ সনের ২৬শে মার্চ তদানীন্তন সরকার বাংলাদেশ বীমা (জরুরি বিধান) আদেশ জারি করেন। এই আদেশের ফলে বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী মালিকানাধীন বীমা কোম্পানীগুলো ছাড়া অন্য সকল বীমা কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করে।

১৯৭২ সনের ৮ আগস্ট তদানীন্তন সরকার বাংলাদেশ বীমা (রাষ্ট্রীয়করণ) আদেশ ১৯৭২ জারি করেন। এই আদেশ জারি ও কার্যকরী করার ফলে সকল বীমা কোম্পানীকে মোট ৪টি ভাগে ভাগ করে ৪টি সংস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। এদের মধ্যে ২টি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং ২টি সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ শুরু করে।

জীবন বীমা হিসাবে কার্যকরী ২টি সংস্থার নামকরণ করা হয় ক. রূপসা জীবন বীমা ও খ. সুরমা জীবন বীমা। ১৯৭৩ সনের ১৪ই মে বাংলাদেশ বীমা কর্পোরেশন অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশের বলে পূর্বের ৪টি বীমা সংস্থাকে বাতিল ঘোষণা করে ২টি বীমা সংস্থা ঘোষণা করা হয়। রূপসা ও সুরমাকে একত্রিত করে জীবনবীমা কর্পোরেশন গঠন করা হয়। পরবর্তীতে বীমা ব্যবসায় প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর বিস্তার ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারী খাতে বীমা কোম্পানী ও বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য সরকার ১৯৮৪ সালের ১১ আগস্ট বীমা (সংশোধনী) অধ্যাদেশ পাশ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৮৫ সাল থেকে ব্যক্তিমালিকানায় দেশীয় জীবন বীমা কোম্পানীর অভ্যুদয় ঘটে। বর্তমানে দেশে সরকারী খাতে ১টি জীবন বীমা কর্পোরেশনের পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানায় ১৭টি জীবন বীমা কোম্পানী বীমা ব্যবসার কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। মাত্র ৫৬,১২৬ বর্গমাইলের ছোট দেশে প্রায় ১৪ কোটি লোক বাস করে। তাই বলা যায় বাংলাদেশ জীবনবীমার একটি বিরাট বাজার। কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় এ বিরাট বীমা বাজারে জীবন বীমা ব্যবসার অর্থাৎ পলিসি বাজারজাতের অনেক অন্তরায় রয়েছে। জীবন বীমা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এই পেশাটির ওপর বৃহত্তর জনগণ সম্পৃক্ত হতে পারছে না। উপরন্তু যারা এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছে সমাজে তাদের সামাজিক মূল্যও অতি নগন্য। এর পিছনে নিশ্চয় কিছু অন্তরায় রয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বা পাঠ্যসূচির দিকে দৃষ্টিপাত দিলে দেখা যাবে যে, স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পর্যায়েই বীমা বিষয়ের ওপর তেমন কোন শিক্ষণীয় বিষয় নেই। অথচ অন্যান্য প্রায় সকল পেশা সম্পর্কে ছাত্র-জীবনে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তাই অন্তত স্কুল বা কলেজ পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে যদি বীমার ওপর ১টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে বীমা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে থাকবে।

www.pathagar.com

জীবন বীমা কি এবং কেন করা দরকার আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণের এ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও নেই। জনগণ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে (কোন বিষয়ের খারাপ দিকটাই জনগণ সাধারণত: সমালোচনা করে থাকে) যতটুকু জানে তা হলো জীবন বীমা করা অর্থ হলো জীবন শেষ না হলে টাকা পাওয়া যাবে না আবার জীবন শেষ হলেও বীমা কোম্পানী টাকা দেয় না আর যদিও দেয় তাতে বীমাগ্রহীতার লাভ বেশী নয়। বীমা সম্পর্কে গণসচেতনতার অভাবই এর জন্য দায়ী। তাই জীবন বীমা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার জন্য জীবন বীমা কোম্পানীগুলোকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। সম্মিলিত বা এককভাবে গ্রাহক সম্মেলন করার মাধ্যমে এর সুফল পাওয়া যেতে পারে।

অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর বাংলাদেশ। এ দেশের শতকরা ৫০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদাসমূহ যেমন- অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করতে পারলেই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী বলা যায়। জীবন বীমার মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন দুরাবস্থা মোকাবেলা করা যায় বিধায় বীমাকে মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদার মতই আবশ্যকীয় বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষা-সচেতনতায় অনগ্রসর আমাদের সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামী এখনও বিদ্যমান। জীবন বীমাকে না জায়েজ বলে আখ্যায়িত করে এ পেশাকে গ্রহণযোগ্য হতে বাধা দিচ্ছেন কেউ কেউ। অথচ জীবন বীমার ধারণা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বীমা সম্পর্কে বিরুদ্ধাচরণ রুখতে হলে আলেম সমাজকে বীমা পেশায় জড়িত করার উদ্যোগ বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিতে হবে।

বীমা পেশার মূল হাতিয়ার হচ্ছে সততা। এই সতর্কতাকে তথা চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষের কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করে বীমা করাতে হয়। কিন্তু সেই সদ্বিশ্বাস যাদের ওপর ন্যস্ত তারা অর্থাৎ বীমাকারীরা যদি তা ভঙ্গ করে বীমাগ্রহীতাকে প্রতারিত করে তাহলে এর বিরূপ ফলাফল ভোগ করতে হয় পুরো বীমা শিল্পকে। আর এহেন কর্মকাণ্ডে স্বল্প সংখ্যক বীমাকর্মী জড়িত বিধায় আজও জীবন বীমা পেশা এ দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। দু'চারজন বীমাকর্মীর প্রতারণার দায় নিতে হচ্ছে গোটা বীমা শিল্পকে। তাই এ ধরনের ঘটনা জানার সাথে সাথে গণমাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই বীমা প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে বীমা শিল্পের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা বেড়ে যায়। বীমা কর্মীর প্রতারণার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানেরই নেয়া উচিত যাতে করে বীমাগ্রহীতা কোন রকমেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহ নৈতিক গুণ সম্পন্ন আদর্শবান তরুণদেরকে বীমা কর্মী হিসেবে নিয়োগ দানের মাধ্যমে বীমা ব্যবসায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

বীমা শিল্পের অনগ্রসরতার পিছনে বীমা পেশাজীবীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব রয়েছে। যেমন, এক প্রতিষ্ঠানের বীমা কর্মী দ্বারা অন্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিরূপ ধারণা ছড়ানো

www.pathagar.com

জনগণের মাঝে পুরো বীমা শিল্প সম্পর্কেই আতংক সৃষ্টি করে। এভাবে হাজার হাজার বীমাকর্মী প্রতিনিয়ত গোটা বীমা শিল্পের সর্বনাশ করে চলেছে। আবার দেখা যাচ্ছে এক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চাকুরীচ্যুত বীমা কর্মী অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চাকুরী পেয়ে সমাদৃত হচ্ছেন। এতে দেখা যায় যে, এক প্রতিষ্ঠানে নিম্নপদে আসীন কর্মকর্তাকে অন্য প্রতিষ্ঠান চড়াদামে উচ্চতর পদে নিয়োগ দিচ্ছেন। জীবন বীমা পেশায় কোন Code of Conduct আজো প্রণীত হয়নি। আর বীমা পেশাজীবীদের ঐক্যের অভাবে বীমা শিল্প অদক্ষ অপেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে বিধায় বীমা বাজার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বীমা পেশাজীবীদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। বীমা বাজার উন্নয়নে বীমা পেশাজীবীদের সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন- অসৎ বীমাকর্মীদের বিতাড়িত করতে হবে। বীমাকর্মীদের জন্য একটি নীতিমালা ঠিক করতে হবে। ছাড়পত্র ব্যতিরেকে এক কোম্পানীর লোক অন্য কোম্পানীতে যোগদান রোধ করতে হবে। পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পরিহার করতে হবে। প্রয়োজনে এগুলো বিধিবদ্ধ আকারে পালনের জন্য শক্তিশালী বীমা পেশাজীবী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দুর্বলতা ও জটিলতা জীবন বীমা অন্তরায়ের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বীমাগ্রাহকগণ বীমা কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি সংক্রান্ত যে সমস্ত অভিযোগ করে থাকেন তা ব্যবসা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখেন না যাতে করে বীমাগ্রহীতাগণ অসন্তুষ্ট হন। তাই শক্ত হাতে বীমা কর্মীদের দুর্নীতি প্রতিরোধে বিহিত ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে করা উচিত। এতে করে বীমা প্রতিষ্ঠানে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে উঠবে।

জীবনবীমা বাজারকে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন বীমা কর্মীরা। কারণ তারাই জনগণের সবচেয়ে নিকটে থাকেন এবং তাদের মাধ্যমেই জনগণ জীবন বীমার প্রাথমিক ধারণা পেয়ে থাকেন। বীমা কর্মীরাই হলো বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। তাই তাদের হতে হয় বীমা সম্পর্কে শিক্ষিত, জ্ঞানী এবং মানুষ হিসাবে হতে হয় সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমী, সদালাপী ও বিচক্ষণ অর্থাৎ জনসমাজে গ্রহণযোগ্য হওয়ার মত একজন ব্যক্তিত্ববান। অথচ এক্ষেত্রে কোন বাছ-বিচার ছাড়াই গণহারে জীবন বীমার বীমা কর্মীর নিয়োগ দেয়া হয়। ফলে এ সকল অদক্ষ ও অপেশাদার বীমা কর্মীরা একদিকে যেমন জীবনবীমাকে মারাত্মক অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে জীবন বীমার ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে প্রকৃত সৎ, দক্ষ ও পেশাদার বীমাকর্মীদেরকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করে তুলছে। তাদের কারণে জনসমাজ বীমা কর্মীদেরকে অবমূল্যায়ন করছে ফলে সমাজের ভাল ছেলেরা এ পেশায় আসছে না। তাই, সৎ, আন্তরিক, শিক্ষিত ও সমাজে গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ববান ছেলেদেরকে এ পেশায় আকৃষ্ট করতে হলে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বীমা কর্মী নিয়োগে সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে এ পেশার মান উন্নয়নে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

শুধুমাত্র শিক্ষিত, সৎ, আন্তরিক, পরিশ্রমী ও ব্যক্তিত্ববান বীমা কর্মী নিয়োগে প্রাথমিক দায়িত্ব সমাধা হলেও তাদেরকে বীমা বিষয়ে প্রশিক্ষণ না দিলে পেশার উৎকর্ষ সাধনে তারা সফল হবে না। আজকাল দেখা যায়, বীমা কর্মী নিয়োগ করার পরপরই বীমা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান না দিয়েই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদেরকে বাজারে বীমা পলিসি বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হয়। তারা একদিকে না পারে গ্রাহকের প্রশ্নের জবাব দিতে অন্যদিকে না পারে নিজেকে একজন বিচক্ষণ ও আকর্ষণীয় বীমাব্যক্তিত্বে প্রকাশ করতে। ফলে বীমা পেশা তথা বীমা প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের বিরূপ ধারণা জন্মে।

বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকমত কাজ করছে কিনা বা বীমা আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা, জনগণের স্বার্থ ঠিকমত সংরক্ষণ হচ্ছে কিনা ইত্যাদি দেখার জন্য সরকার একটি বীমা নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছে। ঢাল-তলোয়ার বিহীন অবস্থায় সর্দারী করা যায় না। একটি বিরাট বীমা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলেও একটি শক্তিশালী বীমা নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা দরকার। শক্তিশালী বীমা নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলতে যা বুঝায় তাহলো এর জন্য দরকার আরও অধিক সংখ্যক পেশাগত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা। যেমন ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তিশালী বাংলাদেশ ব্যাংক তেমনি বীমা সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী বীমা নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। স্বল্প সংখ্যক জনবল নিয়ে বর্তমান বীমা নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিশাল বীমা শিল্পের নিয়ন্ত্রণে সত্যিই হিমসিম খাচ্ছে যার দরুন বীমা বাজারে বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে এবং বীমা শিল্পের মান-উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

উল্লিখিত প্রতিকূলতা ছাড়াও বীমা শিল্পে আরও অনেক প্রতিকূলতা বিদ্যমান। যেমন বীমা শিল্পে শিক্ষিত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ বীমা বিশেষজ্ঞের অপ্রতুলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হাটি হাটি পা পা করে জীবন বীমা বাজার আজ এক বিশাল শিল্পে পরিণত হয়েছে। জীবন বীমা খাতে স্বাধীনতা পরবর্তীতে যেখানে পাঁচ/সাত কোটি টাকা প্রিমিয়াম আয় হতো আজ তা বেড়ে প্রায় হাজার কোটিতে উন্নীত হয়েছে। একটি মাত্র সরকারী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে আরও ১৭টি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান বাজারে কাজ করছে। হাজার হাজার বীমা কর্মীর জায়গায় লক্ষ লক্ষ বীমা কর্মী বাজারে কাজ করছে। উন্নতির এ ধারাকে আরও বেগবান করতে হলে উল্লিখিত প্রতিকূলতাসমূহ দূর করতে হবে এবং তা হলেই বীমা শিল্প আগামী দিনে আরো সমৃদ্ধ হবে। এক্ষেত্রে ইসলামী বীমার অগ্রযাত্রা এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ইসলামী জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ বাজারের বর্তমান সমস্যা সমূহকে কাটিয়ে উঠতে একযোগে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ইসলামী বীমার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান প্রয়োজন ইসলামী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতা।

www.pathagar.com

এগার.

ইসলামী বীমার ধারণা এবং আশু করণীয়

ইসলামী বীমা (তাকাফুল) প্রচলিত বীমার একটি বিকল্প ব্যবস্থা যা ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতা ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে নিজস্ব পন্থায় অর্থনৈতিক দায়ভার করে নেয়ার জন্য এখন তাকাফুল ব্যবস্থার অনুসরণ করছে। জীবনের অনিশ্চয়তা মোকাবেলার জন্য তারা পারস্পরিক সহযোগিতার ইসলামী পন্থা উদ্ভাবন করেছে। বস্তুত তাকাফুল হলো ভ্রাতৃত্ববোধ, সংহতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক ব্যবস্থা। তাকাফুল স্কীমের অংশগ্রহণকারীগণ স্বেচ্ছায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ একটি অনুদান তহবিলে প্রদান করতে সম্মত হয়। যার মাধ্যমে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়। তাকাফুল ব্যবস্থা স্কীমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যকার একটি পারস্পরিক সমঝোতা। একজনের ক্ষতি সম্মিলিতভাবে ভাগাভাগি করে নেয়ার ধারণা থেকে এই ব্যবস্থার উদ্ভব। তাকাফুল ব্যবস্থা ইসলামী নীতিমালা ও ইসলামী বিধিবিধান (শরীয়াহ্) মোতাবেক পরিচালিত।

ইসলামী বীমার (তাকাফুল) উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীন আরব গোত্রীয় প্রথা 'আল-আকিলা' থেকে। এক গোত্রের কোন সদস্য ভিন্ন কোন গোত্রের সদস্যের দ্বারা নিহত হলে, হত্যাকারীর পৈত্রিক আত্মীয়দেরকে নিহতের উত্তরাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হতো। 'আল-আকিলা' নামে পরিচিত পৈত্রিক আত্মীয়রা অভিযুক্তের অর্থনৈতিক দায় ভাগাভাগি করে নিত। এই প্রাচীন আরব দেশীয় প্রথা পরবর্তীতে ইসলামী শরীয়া কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

ইসলামী বীমা বা তাকাফুল অর্থনৈতিক সহযোগিতার একটি নতুন ধারণা হিসেবে বর্তমানে বিকাশ লাভ করেছে, যাতে একদল লোক পরস্পরকে নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য সম্মত হয় এবং এই লক্ষ্যে জীবন সম্পত্তি কিংবা দায়ভাগের নির্দিষ্ট ঝুঁকির মোকাবেলায় ক্ষতিপূরণ/অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য তাদের প্রত্যেকের অনুদান সঞ্চয় থেকে একটি সাধারণ তহবিল গঠন করে। অংশগ্রহণকারীদের (Policyholders) চাঁদা বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে প্রতিষ্ঠান (Insurers)। তাকাফুল প্রতিষ্ঠান (ইসলামী বীমা কোম্পানী) শরীয়াহ'র মূলনীতি অনুযায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

www.pathagar.com

তাকাফুল কি?

তাকাফুল আরবি শব্দ 'কাফাল' থেকে উদ্ভব হয়েছে যার অর্থ কারও প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করা। তাকাফুল ব্যবস্থার অধীনে সদস্যবর্গ কিংবা অংশগ্রহণকারীগণ কিছু নির্দিষ্ট বিপত্তির ফলে সৃষ্ট ক্ষতি বা লোকসান কাটিয়ে উঠার জন্য নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার যৌথ নিশ্চয়তা প্রদানে একমত হন। অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য পুরো দলটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ক্ষতি পুষিয়ে দিতে কিংবা তাকে আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য গঠিত তহবিল থেকে সাহায্য করবে। তাকাফুল স্কীম অংশগ্রহণকারীদের মধ্যকার এমন একটি চুক্তি যাতে তাকাফুল সনদে বর্ণিত কোন ক্ষতির সম্মুখীন তাদের যে কোন সদস্যকে সহযোগিতা করতে আইনগতভাবে বাধ্য। তাকাফুল ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শ তথা কুরআন এবং সুন্নাহ'র (মহানবী (সাঃ) এর বাণী ও কাজ) ভিত্তিতে পরিচালিত।

কুরআন বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা সৎকাজ ও পরহেজগারীতে পরস্পরের সহযোগিতা করো, তবে পাপ বা অন্যায় কাজে নয়।" (পবিত্র কুরআন ৫.২)

মহানবী মোহাম্মদ (সাঃ) বলেন, "ঈমানদাররা পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া ও সহানুভূতির কারণে একটি দেহের মতো, যদি তার কোন একটি অঙ্গ কষ্ট বা আঘাত পায়, তবে পুরো দেহই কেঁপে ও জেগে উঠে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।" (মুসলিম শরীফ)

মহানবী (সাঃ) আরো বলেন,

"যে ব্যক্তি বিধবা ও দরিদ্র মানুষের তত্ত্বাবধান করে ও তাদের সাহায্যের জন্য কাজ করে সে যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তির মতো কিংবা যে ব্যক্তি দিনের বেলায় রোজা রাখে এবং সারা রাত নামাজ পড়ে তার মতো।" (বুখারী শরীফ)

তাকাফুলের সাধারণ অর্থ যৌথ নিশ্চয়তা। এটা একদল লোকের মধ্যে (যাদেরকে অংশগ্রহণকারী বলা যেতে পারে) একটি সমঝোতা যেখানে তারা কোন নির্দিষ্ট (চুক্তিপত্রে বর্ণিত) ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রে পরস্পরকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। তাকাফুল চুক্তির মূল লক্ষ্য হলো স্কীমের অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক গঠিত একটি সাধারণ তহবিল থেকে দায় পরিশোধ করা বা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এইভাবে গঠিত তহবিলটি পরিচালনা করবে একটি নিবন্ধিত তাকাফুল প্রতিষ্ঠান। অংশগ্রহণকারীদের ন্যায়সঙ্গত চাঁদার সাহায্যে তহবিলটি গঠিত হবে। তাকাফুল প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী সংশ্লিষ্ট কোম্পানী আইন, সমবায় আইন বা সোসাইটি নিবন্ধন আইন এবং বীমা আইন/তাকাফুল আইনে নিবন্ধিত হতে পারে। ইসলামের মূলনীতির আওতায় তাকাফুল স্কীম পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য লেনদেন ব্যবস্থাটি ইসলামী চুক্তি আইন অনুযায়ী হতে হবে। তাই তাকাফুল চুক্তি 'মুদারাবা (সীমিত অংশীদারিত্ব)' অর্থাৎ লাভ ও লোকসানে অংশগ্রহণ নীতিমালার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

তাকাফুল স্কীমের মৌলিক ভিত্তি হলো এর কার্যক্রমের শরীয়াহ (ইসলামী আইন) অনুমোদিত নয়, এমন কোন উপাদান থাকে না। তাকাফুল প্রতিষ্ঠান স্কীমে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য তাকাফুল তহবিল সৃষ্টি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তহবিলের সম্পদসমূহ প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব এবং ব্যয় পূরণের জন্য যথাযথভাবে নির্ধারিত অংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তাকাফুল তহবিলের সম্পদসমূহ প্রতিষ্ঠানের অন্য সকল সম্পত্তি থেকে আলাদা রাখা প্রয়োজন হবে। ফলে তাকাফুল কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণের তহবিল তাকাফুল স্কীমের অংশগ্রহণকারীদের সৃষ্ট তাকাফুল তহবিলের সাথে মিশিয়ে ফেলা উচিত হবে না।

কোন তাকাফুল স্কীম যখন পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কিংবা সমবায় নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তখন তাকাফুল কার্যক্রমের উদ্বৃত্ত কিংবা ভর্তুকি অংশীদারগণকে বা সদস্যদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে হয়। কিন্তু যখন কোন তাকাফুল স্কীম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তখন তাকাফুল কার্যক্রমের উদ্বৃত্ত 'মুদারাবা' নীতিমালার আলোকে তাকাফুল প্রতিষ্ঠান এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে হয়। এ ধরনের উদ্বৃত্ত চুক্তিসম্পন্নকারী পক্ষগুলোর মধ্যে সম্মত সমঝোতা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে ভাগাভাগি হতে পারে। অংশগ্রহণকারী তহবিলের যোগানদাতা হিসেবে উদ্বৃত্তের একটি অংশ পাবে এবং প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী উদ্যোক্তা ও তহবিলের ব্যবস্থাপক হিসেবে উদ্বৃত্তের একটি অংশ পাবে। কোন তাকাফুল প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যখন কোন চুক্তি হবে তখন 'তাবারু' (অনুদান) প্রদানের বিষয়টি এতে অঙ্গীভূত থাকবে। এর অর্থ হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের নির্দিষ্ট বিপত্তি বা দুর্ভোগ মোকাবেলায় সহযোগিতা প্রদানের জন্য অংশগ্রহণকারীকে তাকাফুল কিস্তির নির্দিষ্ট অংশ ছেড়ে দিতে সম্মত থাকতে হবে।

তাকাফুল ব্যবস্থার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে 'শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড বা কাউন্সিল (Shariah Supervisory Board or Council) নামক একটি স্বাধীন সংস্থা। শরীয়াহ বোর্ড প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রমের ব্যাপারে পরামর্শ দেবে যাতে শরীয়াহ'র নীতিমালায় অনুমোদন করে না, এমন কোন কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত না হয়। তাকাফুল কার্যক্রম শুরুর পূর্বে অবশ্যই একটি শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড গঠন করতে হবে। শরীয়াহ বোর্ড শরীয়াহ'র দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকাফুল প্রতিষ্ঠানকে লেনদেনের বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং শরীয়াহ'র প্রাসঙ্গিক নিয়ম ও নীতিমালা প্রশ্নে প্রতিষ্ঠানকে পরিষ্কার ধারণা দেবে।

তাকাফুল কিভাবে কাজ করে?

তাকাফুল ব্যবসায়ের পরিচালনা এবং কর্মপদ্ধতি বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বাণিজ্যিক বীমার প্রায় অনুরূপ। ব্যবসায়ের ধরনটি হতে পারে পারিবারিক তাকাফুল (জীবনবীমা) কিংবা

www.pathagar.com

সাধারণ তাকাফুল (সাধারণ বীমা)। পারিবারিক তাকাফুল স্কীম মূলত দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ কর্মসূচি যা একই সাথে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করে। চুক্তি করতে সামর্থ্যবান কেউ পারিবারিক তাকাফুল স্কীমে অংশগ্রহণ করতে চাইলে তাকে তহবিল সৃষ্টির জন্য নিয়মিত তাকাফুল কিস্তি প্রদান করতে হবে। কিস্তির পরিমাণ এবং নিয়মিত পরিশোধের মেয়াদ কি হবে তা প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণকারী তার বর্তমান এবং ভবিষ্যত সামর্থের আলোকে সিদ্ধান্ত নেবে। পারিবারিক তাকাফুলে অংশগ্রহণকারীদের (পলিসি হোল্ডারগণ) প্রদেয় অর্থ দু'টি পৃথক একাউন্টে জমা হবে। একটি অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব হিসেবে গণ্য হবে এবং অন্যটি তাকাফুল ব্যবস্থার ধারণাকে বাস্তবায়নের জন্য সকল অংশগ্রহণকারীর মধ্যে যৌথ নিশ্চয়তা ও দায় দায়িত্ব ভাগাভাগি করার উদ্দেশ্য অনুদান (তাবারু) সংরক্ষিত হবে।

স্কীমের অংশগ্রহণকারী প্রদেয় কিস্তির প্রধান অংশটি (ধরা যাক ৯০%) জমা হবে অংশগ্রহণকারীর (Participants Account) হিসাবে এবং অবশিষ্ট (Balance Amount) যাবে বিশেষ হিসাব (Special Account) বা তাবাররু (অনুদান) হিসাবে। অংশগ্রহণকারীর হিসাবের লভ্যাংশ নির্ধারিত শর্ত অনুপাত অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী ও তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। তাবাররু একাউন্ট সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো কোন অংশগ্রহণকারী যদি নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে (Maturity Date) ইন্তেকাল করেন তবে তার উত্তরাধিকারীদের নির্দিষ্ট অংক (Policy Amount) প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। পারিবারিক তাকাফুল স্কীমে অংশগ্রহণকারী যদি নির্দিষ্ট তারিখের আগেই ইন্তেকাল করেন, তবে তার উত্তরাধিকারীগণ তার নিজস্ব (বিনিয়োগ থেকে অর্জিত লাভের অংশসহ) সঞ্চিত অর্থ (তাবারু অংশ ব্যতিরেকে) এবং তিনি যদি জীবিত থাকতেন তবে শেষ কিস্তি পর্যন্ত যে পরিমাণ তাকাফুল কিস্তি পরিশোধ করতেন, তাও প্রদান করা হবে। যদি কোন অংশগ্রহণকারী শেষ কিস্তি জমা দেওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকেন, তবে তাকাফুল সুবিধাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে নিজস্ব জমায় অংশগ্রহণকারীর একাউন্ট (Participants Account) লাভসহ। এছাড়াও বিশেষ তহবিলের গাণিতিক (Acturial) মূল্যায়ন সাপেক্ষে নীট উদ্বৃত্ত প্রদেয় হয়ে যায়। গাণিতিক মূল্যায়ন তাকাফুল স্কীমের আওতায় ভবিষ্যতের দায় নিরূপণের জন্য প্রয়োজন হয়।

তাবারু'র পর্যাপ্ততা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং একাউন্টের বিতরণযোগ্য উদ্বৃত্ত নির্ণয়ের জন্য গাণিতিক মূল্যায়ন করতে হবে। সনাতন জীবনবীমা পলিসির তুলনায় পারিবারিক তাকাফুল স্কীমের বিশেষত্ব হলো এতে ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য গঠিত অংশ থেকে বিনিয়োগ অংশ আলাদা করা হয়। বিনিয়োগ তহবিল থেকে অর্জিত লাভ অংশগ্রহণকারীগণ এবং তাকাফুল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ভাগাভাগি করে নেয়। তাকাফুল ব্যবসায়ের বড় বৈশিষ্ট্য হলো লাভ ভাগাভাগি। তাই তাকাফুল হিসাবরক্ষণ

www.pathagar.com

পদ্ধতির বিশুদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অংশগ্রহণকারীর নিজস্ব জমার লভ্যাংশের হিসাব এবং বাৎসরিক হিসাব বিবরণ (Yearly Statement) অংশগ্রহণকারীকে নিয়মিত অবহিত করতে হবে।

পারিবারিক তাকাফুল স্কীমে অংশগ্রহণকারীকে একজন নমিনী মনোনীত করতে হবে, যিনি তাঁর মৃত্যুর পর তাকাফুল স্কীমের প্রদেয় অর্থ গ্রহণ করবেন এবং ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তা বন্টন করে দেবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (Nominee) শুধুমাত্র একজন জিম্মাদার (Trustee) হিসেবে সুবিধাসমূহ গ্রহণ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি অমুসলিম হন, তবে তিনিই হবেন নিরঙ্কুশ সুবিধাভোগী ((Beneficiary)। অবশ্য, একজন মুসলমানও কাউকে সুবিধাসমূহ দিয়ে যেতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে স্কীমের আওতায় সুবিধাসমূহ আগেই দানগ্রহণকারীর অনুকূলে হিবা (উপহার) করতে হবে। এই ক্ষেত্রে দানগ্রহণকারী তাকাফুল সুবিধাসমূহ প্রাপ্তির নিরঙ্কুশ অধিকারী হন।

প্রচলিত জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানগুলো পলিসি গ্রাহকদের বোনাস কিংবা বিশেষ ধরনের লাভের ঘোষণা দিয়ে থাকে। বীমাকারকের বিদ্যমান দায়দায়িত্বের মূল্যায়ন সাপেক্ষে লাভের বিষয়টি ঘোষিত হয়। বোনাসের হার বছর বছর পরিবর্তিত হয়। অন্যদিকে, তাকাফুল চুক্তিতে চুক্তি সম্পাদনের সময়ই তাকাফুল বিনিয়োগের উদ্বৃত্ত তাকাফুল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এবং অংশগ্রহণকারীর মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হবে, তা নির্দিষ্ট করা হয়। 'মুদারাবা' (লাভ বন্টন) নীতির আলোকে তা করা হয়। পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এবং অংশগ্রহণকারীর মধ্যকার সমঝোতা অনুযায়ী লাভ বণ্টিত হয়। প্রচলিত জীবনবীমা পলিসিতে পলিসি হোল্ডারের সংগৃহীত প্রিমিয়াম থেকে এজেন্সী কমিশন প্রদান করা হয়। কিন্তু তাকাফুল প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী ('তেজারী' মডেল) এজেন্টকে প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিবেচনা করে। তাই শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল/লভ্যাংশ বাদ দিয়েই কোম্পানী এজেন্সী কমিশন প্রদান করে। অবশ্য, চুক্তির সময়ে কোম্পানী এবং অংশগ্রহণকারীর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা হয় সে অংশগ্রহণকারীর অংশের বাইরে থেকে এজেন্সী কমিশন দিতে হবে এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠান (ওয়াকালা মডেলের আওতায়) সমঝোতা অনুযায়ী এজেন্সি কমিশন প্রদান করবে।

প্রচলিত জীবনবীমা চুক্তিতে 'সমর্পণ মূল্য' (Surrender Value) মেয়াদের প্রাথমিক বছরগুলোতে পলিসি হোল্ডারের পরিশোধিত প্রকৃত প্রিমিয়ামের চেয়ে অনেক কম হয়ে থাকে। কিন্তু তাকাফুল চুক্তিতে সমর্পণ করার ক্ষেত্রে, অংশগ্রহণকারীর বিনিয়োগ অংশ হিসেবে যত অর্থ সঞ্চিত থাকে এবং বিনিয়োগ থেকে যা লাভ হয়েছে, সবই ফেরত দেওয়া হয়। তবে যে অংশ 'তাবাররু' হিসেবে দান করা হয়েছে, তা ফেরত দেয়া হবে না। তবে কিস্তির মোট পরিমাণের তুলনায় তাবাররুর পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় অংশগ্রহণকারীর সমর্পণ মূল্য তার প্রদান করা মোট কিস্তির পরিমাণের প্রায় কাছাকাছি

www.pathagar.com

থাকে। অধিকন্তু, জরুরী প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারী তার পি. এ. তহবিলে সঞ্চিত অর্থ আংশিকভাবে উত্তোলন করতে পারেন।

প্রচলিত জীবনবীমার ক্ষেত্রে চুক্তির একবছরের মধ্যে পলিসি হোল্ডার আত্মহত্যা করলে তার উত্তরাধিকারীগণ কোন দাবী করতে পারবে না। কিন্তু তাকাফুল স্কীমের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী আত্মহত্যা করলেও তার উত্তরাধিকারীগণ তাকাফুল প্রদেয় সুবিধাসমূহ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে দাবী করার অধিকার রাখে।

তাকাফুল স্কীমের আওতায় অংশগ্রহণকারীগণ যদিও পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার নীতির বরখেলাপ করে তথাপি বাজেয়াপ্ত হয় না। অংশগ্রহণকারী অনিয়মিত কিস্তি পরিশোধ এবং সমর্পণ মূল্য দাবি করলে তার পি. এ. তহবিলের জমাকৃত অর্থ এবং সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত বিনিয়োগের মুনাফাসহ ফেরত পাবে। তবে কোম্পানী স্কীম থেকে প্রত্যাহারের জন্য সার্ভিস চার্জ ধার্য করতে পারে। তাকাফুল কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারের তহবিলের একাউন্ট সংশ্লিষ্ট তাকাফুল তহবিল থেকে আলাদাভাবে রাখা হয়। তাকাফুল কোম্পানীর আয় পাওয়া যায় শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগ হতে লাভ এবং তাকাফুল তহবিলের লভ্যাংশ থেকে। পরিচালনা ব্যয়, যেমন স্টাফ খরচ, প্রাতিষ্ঠানিক খরচ এবং প্রশাসনিক খরচ ইত্যাদি শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল থেকে মেটানো হবে। সাধারণ তাকাফুলের পরিচালনা প্রচলিত সাধারণ বীমা ব্যবস্থার অনুরূপ। সাধারণ তাকাফুল স্কীমের অংশগ্রহণকারীগণ অনুদান (তাবাররু) হিসেবে অর্থ প্রদান করেন এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী সুদের সংশ্লিষ্টতাবিহীন ইসলামী বিধান অনুযায়ী এই অর্থ বিনিয়োগ করবে। বিনিয়োগের সকল লাভ তাকাফুল তহবিলে জমা হবে এবং অংশগ্রহণকারীর সম্পত্তি বা দায়-দায়িত্ব ক্ষতি কিংবা লোকসানের ক্ষেত্রে এই তহবিল থেকে মেটানো হবে। সাধারণ তাকাফুল তহবিলের উদ্বৃত্ত পৃথকভাবে সংরক্ষিত শেয়ারহোল্ডারের তহবিলে জমা হবে না। সাধারণ তাকাফুল তহবিলের লভ্যাংশের একটি নির্ধারিত অংক (ধরা যাক ৫০%) জমা হবে শেয়ার হোল্ডারের তহবিলে। শেয়ারহোল্ডারের তহবিলের হিসাব বিবরণ পৃথকভাবে প্রস্তুত হবে।

পারিবারিক তাকাফুল স্কীমের মত সাধারণ তাকাফুল স্কীমগুলো সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না। অবশ্য, অংশগ্রহণকারীগণ তাকাফুলের মেয়াদ শেষে লাভের নির্দিষ্ট অংশ পেয়ে থাকেন। সকল ধরনের পরিচালনা ব্যয়ের পর যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তবে উদ্বৃত্ত অর্থ অংশগ্রহণকারী ও সাধারন তাকাফুল প্রতিষ্ঠান বণ্টন করে নেবে। চুক্তি করার সময়েই উদ্বৃত্ত বন্টনের ক্ষেত্রে সমঝোতার ভিত্তিতে সম্মতি থাকতে হবে। সাধারণ তাকাফুল তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ পুনঃতাকাফুল (Reinsurance) ব্যয় মেটানো, তাকাফুল অর্থ সংরক্ষণ (Technical Reserve) আনুমানিক সম্ভাব্য দাবি বিবেচনা সাপেক্ষে নিরূপিত হবে।

www.pathagar.com

স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রচলিত বীমার তুলনায় তাকাফুলের একটি প্রধান স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর মধ্যকার আইনগত সম্পর্ক। প্রচলিত বীমা পদ্ধতিতে বীমাকারক এবং বীমাগ্রহীতার মধ্যকার সম্পর্ক ক্রেতা ও বিক্রেতার। গ্রাহকের কাছে বীমা পলিসি বিক্রি করা হয় এবং বীমাকারী চান বীমার সেবা বিক্রি করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ পরিমাণে লাভ। কিন্তু তাকাফুলের ক্ষেত্রে কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণকারীর তহবিলের জিম্মাদার (Trustee) বা ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করে। ব্যবস্থাপক বা জিম্মাদার হিসেবে প্রতিষ্ঠান পারিশ্রমিক পাবে যা অংশগ্রহণকারীদের তাকাফুল/মুদারাবা তহবিলের লভ্যাংশ থেকে প্রদান করা হয়।

তাকাফুল এবং প্রচলিত বীমার মধ্যে আরেকটি মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে তাকাফুল পরিচালনায় বিধিবিধানের উৎস হচ্ছে মহানবী (সাঃ) এর কাছে অবতীর্ণ কুরআন, কুরআনী আইনের ব্যাখ্যা, মহানবী (সাঃ) এর সুন্নাহ, মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীদের অনুসৃত নীতি, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্য, ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের পূর্ববর্তী, মতামতের সামঞ্জস্যতা, প্রথা, মুসলিম সমাজের নজির ইত্যাদি। সনাতন বীমা পরিচালিত হচ্ছে মূলত চুক্তি আইন, দায় আইন, পার্লামেন্টের অধ্যাদেশ, সাধারণ আইন এবং প্রাথমিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিকশিত প্রথা ও রীতিনীতির দ্বারা। সনাতন বীমা ব্যবস্থার নিয়মকানুন ও বিধি-বিধান পাওয়া যায় বিধিবদ্ধ আইন, মোকদ্দমা আইন, আইনগত দৃষ্টান্ত, প্রথা এবং রীতিনীতি থেকে। অন্যদিকে তাকাফুলের নিয়মকানুন ও বিধিবিধান মূলত কুরআন এবং সুন্নাহ'র ওপর প্রতিষ্ঠিত ও এর দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে ইসলামী আইন তথা সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ মোকদ্দমা আইন, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং অবশ্যই শরীয়াহ ভিত্তিক বিধিবদ্ধ আইন, যদি থাকে।

সাধারণ আইন এবং পশ্চিমা আইনের আওতায় বীমা ব্যবস্থা সুদের উপাদান, মুনাফা সর্বোচ্চকরণ এবং সুযোগ গ্রহণকে কেন্দ্র করে পরিচালিত; অন্যদিকে ইসলামী আইনের আওতায় তাকাফুলের কার্যপ্রণালী সুদমুক্ত ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাকাফুলের কার্যপ্রণালী শরীয়াহ'র মূলনীতি ভিত্তিক। এটা পরিচালিত হয় পারস্পরিক সহযোগিতা, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের মূলনীতি অনুযায়ী। এটা মূলত বাস্তবায়ন করা হয় মুদারাবা (লাভ বা ক্ষতিতে অংশীদারিত্ব) ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে যা সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার বিকল্প। তাই প্রচলিত বীমা ব্যবসায়ে সৃষ্ট তহবিল বীমা কোম্পানী মালিকানায় থাকে, কিন্তু ইসলামী বীমা কোম্পানীর অংশগ্রহণকারীদের অর্থে সৃষ্ট তহবিলে অংশগ্রহণকারীদের (পলিসিহোল্ডার) মালিকানা থাকে। প্রচলিত বীমা কোম্পানীর তহবিল বীমা আইন এবং বিধি-বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন স্কীমের বিনিয়োগ করা হয়, কিন্তু তাকাফুল ব্যবসায়ের তহবিল শরীয়াহ'র বিধান মোতাবেক না হলে কোন স্কীমের

www.pathagar.com

বিনিয়োগ করা যায় না। পুরো প্রক্রিয়াটি শরীয়াহ বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে এবং তাতে কোন অনৈতিক/ অনৈসলামিক বিষয় থাকতে পারবে না।

তাকাফুল স্কীম এবং প্রচলিত বীমার মধ্যকার আরেকটি প্রধান পার্থক্য হচ্ছে বিনিয়োগের ধরন এবং উদ্বৃত্ত বন্টন। তাকাফুল কার্যক্রম 'মুদারাবা' অর্থনৈতিক পদ্ধতির নীতিমালা ভিত্তিক, যেখানে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলো সমঝোতা অনুযায়ী লভ্যাংশ বন্টন করে নেয়। এতে করে তাকাফুল কার্যক্রম সুদ-মুক্ত লেনদেনে হয়। মুসলমানরা বিশ্বাস করে অন্যায্যতার কারণে আল্লাহ সুদকে (রিবা) হারাম করেছেন। ইসলামী আইনজ্ঞগণ মনে করেন, মুদারাবা ভিত্তিক বন্টন পদ্ধতি ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত লেনদেন এবং এটি সুষম বাণিজ্যিক ব্যবস্থা উপহার দেয়। অন্যায় সুদ ভিত্তিক লেনদেনের বিরুদ্ধে 'মুদারাবাকে সেরা বিকল্প' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কোন বীমা কোম্পানীর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা করা। কোন বৈধ বীমার জন্য উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতা অপরিহার্য বিষয় নয়। কিন্তু তাকাফুলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি এবং অনুগ্রহ অর্জন করা। ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী, মানুষের কর্মফল তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের আলোকে আল্লাহপাক মূল্যায়ন করেন তাই, ঈমানদারদের প্রধান কর্তব্য হলো কুরআন এবং সুন্না'য় প্রদর্শিত পন্থায় সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে ভাল কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ অর্জনের দিকে সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা।

তাকাফুল কার্যক্রমকে প্রচলিত ব্যবস্থার কিছু উপাদান থেকে সংরক্ষণের জন্য তাকাফুল কার্যক্রমের সকল বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের একটি কাউন্সিল প্রয়োজন। শরীয়াহ্'র নীতিমালা অনুযায়ী তাকাফুল কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য এটা প্রয়োজন। 'শরীয়াহ্ তত্ত্বাবধায়ক কাউন্সিল' শরীয়াহ্'র বিধিবিধান অনুযায়ী তাকাফুল আইন, সংবিধিবদ্ধতা ও ব্যবস্থার উন্নয়নে তাকাফুল কার্যক্রমকে পরামর্শ দেবে।

ইসলামী জীবনবীমার ভিত্তি

এই পৃথিবীতে ভাল মন্দ যা কিছু ঘটে তা সবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে আমাদের জীবনে যেসব দুর্ঘটনা ঘটে, যেসব দুর্যোগ ও বিপত্তির মুখোমুখি আমরা হই তার সবকিছুই ভাগ্যের লিখন বা আল্লাহর ইচ্ছা এবং যদি তাই হয় তাহলে বীমা, জীবন বীমা, বা ইসলামী জীবন বীমার প্রয়োজনটা কোথায়? বিপদ যিনি দেন তিনিই আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। অতএব, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা করাটাই বিশ্বাসীদের বা মুমিনদের উচিত। তাহলে বীমা বা ইসলামী জীবন বীমার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি না সে বিষয়ে অহরহ প্রশ্ন তোলা হয়।

www.pathagar.com

প্রথমত আমাদের বুঝতে হবে যে আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ এই নয় যে বিপদ, আপদ ও ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষেত্রে সাবধানতা, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বা কোন কৌশল অবলম্বন করা যাবে না। জেহাদের ময়দানে শহীদী জীবন সবারই কাম্য। তার পরেও আল্লাহর পথের সৈনিকরা শত্রুর প্রতিটি আঘাতকে প্রতিহত করেছেন এবং যুদ্ধের ময়দানে বর্ম, ঢাল ও তরবারীর সাহায্যে নিজের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মরক্ষা করেছেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন তার সঙ্গী সাথীদেরকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে বললেন তখন সবাইকে এক সাথে হিযরত করতে না বলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পথে মদীনার পথে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং সেখানে 'ছাওর' গুহায় যখন আবু বকর (রাঃ) সাথে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন শত্রুরা খুব নিকটে চলে এসেছিল। তখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ভীত সন্ত্রস্ত আবু বকর (রাঃ) কে বললেন "ভয় পেও না আবু বকর, আল্লাহ আমাদের সংগে আছেন।"

এ ঘটনা থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারি যে, আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ ভরসা করা ও বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাবধানতা বা কৌশল অবলম্বন করা উভয়ই নবীজীর শিক্ষা বা আদর্শ। এ ছাড়া আমরা সেই বিখ্যাত হাদিসটির কথা স্মরণ করতে পারি, যখন তিনি এক বেদুইনকে উপদেশ দিয়ে বললেন "প্রথমে তোমার উটকে খুঁটায় বেঁধে রাখ এবং তারপর আল্লাহর উপর ভরসা কর।"

আমরা লক্ষ্য করি যে, ইসলামী হুকুমত কায়েম হবার পর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গড়ে তোলা হয়েছিল "বায়তুল মাল" বা গণ তহবিল এবং প্রবর্তন করা হয়েছিল 'যাকাত' ব্যবস্থা, যাতে করে সমাজের দুঃস্থ, অসহায় এবং সম্বলহীন মানুষদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হয়। সম্পদশালী ও সৌভাগ্যবানদের অর্থ থেকে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষা। একজনের বিপদে অন্যকে সহায়তা করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্যই করণীয় কাজ। আর এইজন্যই ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইসলামের মৌলিক শিক্ষা "ভাল কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা" ও সহমর্মীতার ভিত্তিতে সনাতন জীবন বীমা পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে গড়ে তুলেছেন শরীয়ত ভিত্তিক নতুন এক পদ্ধতি যাকে আমরা পারিবারিক "তাকাফুল" বা "ইসলামী জীবন বীমা" বলে অভিহিত করতে পারি।

বস্তুত: জীবনের কোন বীমা হয় না। কারণ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আর তাই জীবন বীমার বিকল্প হিসাবে গড়ে উঠেছে পারস্পরিক সহযোগিতা ভিত্তিক যৌথ নিশ্চয়তা (Joint guarantee) তাকাফুল পদ্ধতি অনুসারে পারিবারিক ইসলামী জীবন বীমা হচ্ছে এমন একটি স্কীম বা পদ্ধতি যেখানে এই ব্যবস্থার অধীনে স্বেচ্ছামূলকভাবে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী নিজের এবং অন্য সকল অংশগ্রহণকারীর সুবিধার্থে নিয়মিতভাবে একটি নির্দিষ্ট অংকের চাঁদা প্রদান করেন এবং এই মর্মে স্বীকৃত হন যে, প্রদেয় চাঁদার একটি অংশ অনুদান হিসাবে একটি তহবিলে জমা রাখা হবে। এই জমাকৃত অনুদানকে ইসলামী

www.pathagar.com

পরিভাষায় বলা হচ্ছে 'তাবাররু'। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সনাতন বীমা পদ্ধতি এবং তাকাফুল ব্যবস্থার মধ্যে যেমন কিছু পার্থক্য রয়েছে তেমনি পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে সনাতন জীবন বীমার সাথে ইসলামী জীবন বীমার বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এসব পার্থক্যের কারণেই সনাতন বীমা আইন বা বিধির সাহায্যে ইসলামী জীবন বীমা পরিচালনার ক্ষেত্রে অসঙ্গতি ও সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে বীমা কোম্পানীসমূহ পরিচালিত হয় বৃটিশ প্রবর্তিত আইন দ্বারা। এই আইন যখন প্রবর্তিত হয় তখন তাকাফুল বা ইসলামী জীবন বীমার ধ্যান ধারণা বাস্তবে রূপলাভ করেনি ফলে প্রায় সাত দশক আগের পুরানো আইন দিয়ে ইসলামী জীবন বীমা পরিচালনা অসংগতিপূর্ণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব ইসলামী জীবন বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনগত অসংগতি ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সনাতন বীমা বনাম ইসলামী বীমা

সনাতন বীমায় বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মধ্যে একটি বৈধ চুক্তি হয়ে থাকে। এই চুক্তির অধীনে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে আর্থিক সহায়তা বা ক্ষতি পূরণের অঙ্গীকার করেন। বীমাগ্রহীতার প্রদত্ত চাঁদা হতে সকল খরচ, ক্ষতিপূরণের অংক/আর্থিক প্রদানের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা বীমাকারীর লাভ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাকাফুল বীমা ব্যবস্থায় যে চাঁদা প্রদান করা হয় সেই চাঁদার অর্থ বীমাকারী বিনিয়োগ করেন মূলত এই স্কীমে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যদের মধ্যে বিতরণের জন্য। এখানে বীমাকারী বা তাকাফুল প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও পরিচালনা করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে স্কীমে অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত চাঁদার বিনিয়োগ হতে লাভের একটি অংশ নির্দিষ্ট হারে তাকাফুল প্রতিষ্ঠান (Takaful Operator) পেতে পারেন। এদিক থেকে বিবেচনা করলে তাকাফুল বীমার অংশগ্রহণকারী এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে চুক্তি হয় তা সনাতন বীমার অনুরূপ কোন বিনিময় চুক্তি নয় বরং এটি অংশীদারিত্বের চুক্তি যাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় মুদারাবা।

মুদারাবা চুক্তির ক্ষেত্রেও সনাতন চুক্তি আইনের মৌলিক বিষয় ও শর্তসমূহের শর্তাবলী পালিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ চুক্তি আইনের অধীনে একটি বৈধ চুক্তির জন্য যেসব শর্তের কথা বলা হয়েছে সেগুলি মুদারাবা চুক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সনাতন বীমার ক্ষেত্রে যে দুটি মৌলিক নীতি বৈধ চুক্তির জন্য অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয় তাকাফুলের ক্ষেত্রেও সেই নীতি দুটি একইভাবে প্রযোজ্য, কেননা "বীমাযোগ্য স্বার্থনীতি" (Insurable Interest) পালিত হওয়ার ফলে বীমা ব্যবস্থা ফটকাবাজারী চুক্তি বা জুয়ার অনুরূপ নয়। একইভাবে "চূড়ান্ত বিশ্বাসের" (Utmost Goodfaith) নীতি জীবনবীমা পদ্ধতিকে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

www.pathagar.com

অতএব, মুদারাবা ভিত্তিক তাকাফুল চুক্তির ক্ষেত্রেও বীমাযোগ্য স্বার্থ এবং চূড়ান্ত বিশ্বাসের নীতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। তবে বীমাযোগ্য স্বার্থের কারণে মনোনীত ব্যক্তি এককভাবে অর্থপ্রাপ্তির অধিকার রাখেন এবং তাকাফুল ব্যবস্থায় প্রদত্ত চাঁদা বাজেয়াপ্ত করা হয় না।

তাকাফুল বা ইসলামী জীবনবীমা ব্যবস্থার মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে স্কীমে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যদের পারস্পরিক কল্যাণ। এখানে সকল পক্ষ ন্যায়-নীতি ও পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন কিন্তু আধুনিক বীমা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে প্রধানত বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাকাফুল একটি ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা যা শরীয়তের আইন অনুসারে পরিচালিত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোক্তাগণ অঙ্গীকারবদ্ধ। অতএব, শরীয়া আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোন বিধি-বিধান তাকাফুলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে তা চূড়ান্ত সৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে চুক্তি করা হয়েছে তার লংঘন বলে গণ্য হবে।

একটি ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীর সংঘস্মারকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে যে, "পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতির ভিত্তিতে এহসান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী শরীয়াসম্মত ও অনুমোদিত পন্থায়" বীমা সংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালিত হতে হবে এবং বলা হয়েছে যে, দেশের প্রচলিত বীমা আইনের কোন ধারা বা বিধি ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী কিংবা অসংগতিপূর্ণ হলে শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য হবে। কিন্তু একই সাথে সংঘস্মারকে বলা হয়েছে যে, সংঘস্মারক ও সংঘ বিধিমালার কোন বিধান দেশের প্রচলিত আইন ও বিধির পরিপন্থী কিংবা অসংগতিপূর্ণ হলে দেশের প্রচলিত আইন ও বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে। প্রচলিত বীমা আইনের অনুসরণের কারণে বিপরীতমুখী বক্তব্যের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে হয়।

যেহেতু দেশের প্রচলিত বীমা আইনের সকল বিধি ও বিধান ইসলামী শরীয়ার সাথে পরিপূর্ণভাবে সংগতিশীল নয় তাই স্বাভাবিকভাবেই শরীয়া আইন ভিত্তিক বীমা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এ সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য সুদানে যখন প্রথম ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠান করা হয় তখন ইসলামী বীমা কোম্পানীর জন্য দেশের প্রচলিত বীমা আইন প্রযোজ্য হবে না এই মর্মে সরকারী নির্দেশ জারি করা হয়। মালয়েশিয়ায় তাকাফুল বা ইসলামী বীমা কোম্পানীকে অনুমতিদানের পূর্বে ইসলামী বীমার জন্য পৃথক তাকাফুল আইন প্রবর্তন করা হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে বেশ কয়েকটি ইসলামী বীমা কোম্পানী অনুমোদন লাভ করেছে এবং তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও অধিকাংশ জীবনবীমা কোম্পানী তাদের সংঘস্মারকে তাকাফুল বা ইসলামী বীমা প্রচলনের কোন বিধান না থাকা সত্ত্বেও তাকাফুল বা ইসলামী বীমা প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন বীমা পলিসি বিক্রয় শুরু করেছে। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী বীমার প্রতি প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করেই

www.pathagar.com

সনাতন জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ তাকাফুল বা ইসলামী বীমা প্রচলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। কিন্তু পুরোপুরি শরীয়া আইনের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে প্রচলিত বীমা আইনের অধীনে ব্যবসা পরিচালনার যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা নিরসনের লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আলোচনা ও চিন্তা ভাবনা করা হলেও বীমা নিয়ন্ত্রক বা সরকারের নিকট সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব বা সুপারিশ এখনও পেশ করা হয়নি। ফলে আইনগত জটিলতা ও সমস্যা নিরসনের কোন পদক্ষেপও নেয়া হয়নি।

ইসলামী বীমার উদ্ভব ও বিকাশ

ইসলামের ইতিহাসে বীমার যে রূপটি আমরা লক্ষ্য করি, তার উদ্ভব ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়নি। বরং একজনের দায়কে সবাই মিলে ভাগ করে নেবার সামাজিক প্রথাকে ইসলামী বীমা ব্যবস্থার আদি রূপ বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। প্রাক-ইসলামী যুগের "আকিলা" পদ্ধতিকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছিল। ইসলাম পূর্ব যুগে পরিবারের বা গোত্রের কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন কোন গোত্রের ব্যক্তিকে হত্যা করার দায়ে অপরাধী হিসেবে গণ্য হত, তখন নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদেরকে "রক্তপণের" (Blood Money) অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হত। অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়-স্বজনরা সম্মিলিতভাবে এই রক্তপণের (Blood Money) অর্থ বা 'দিয়াত' পরিশোধ করত। যে সব নিকট আত্মীয়রা এ অর্থ প্রদান করতেন তাদেরকে আকীলা বলা হত। এছাড়াও মক্কার ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন প্রথা প্রচলিত ছিল যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ব্যবসায়ী কাফেলার একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঐ কাফেলার সকল সদস্যদের অনুদান গঠিত তহবিল হতে অর্থ সাহায্য করা হত। বর্তমানের ইসলামী জীবনবীমা ব্যবস্থা প্রাক-ইসলামী যুগের পারস্পরিক সহযোগিতার নীতির (যা পরবর্তীতে ইসলাম অনুমোদন করেছে) ভিত্তিতে আধুনিক বীমা ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

আধুনিক বীমা ব্যবস্থা সম্পর্কে মুসলিম সমাজে প্রথম থেকেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মত-বিরোধ ছিল এবং আছে। অনেকে আধুনিক বীমাকে ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য, কেউ কেউ সাধারণ বীমাকে গ্রহণযোগ্য মনে করলেও জীবনবীমা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। তৃতীয় একটি মতের অনুসারীরা মনে করেন যে, পারস্পরিক সহযোগিতার নীতির ভিত্তিতে, সুদমুক্ত বিনিয়োগ ও মুদারাবা (অংশীদারিত্বের) চুক্তির মাধ্যমে জীবন ও সাধারণ এই উভয় বীমার শরীয়ত ভিত্তিক বিকল্প ব্যবস্থা প্রচলন করা সম্ভব। তৃতীয় এই মতের অনুসারীদের চিন্তা, গবেষণা ও মতামতের ভিত্তিতে আজকের ইসলামী বীমা বা 'তাকাফুল' ব্যবস্থার উদ্ভব। ইসলামী বীমা ব্যবস্থার বিকাশ শুরু হয়েছে প্রায় দুই যুগ আগে এবং বাংলাদেশে ইসলামী বীমার

www.pathagar.com

প্রচলন হয়েছে প্রায় দুই বছর আগে হতে। বিলম্বে হলেও পৃথিবীর অন্যতম মুসলিম প্রধান দেশে ইসলামী বীমার প্রচলন, এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে এক নতুন আশা ও ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অতি সফল বাস্তবায়নের পর ইসলামী বীমা ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকে তরান্বিত করবে বলে অনেকে আশাবাদী হয়েছেন। ব্যবসা, বাণিজ্য ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথা বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থ ব্যবস্থায় 'তাকাফুল' একটি ইতিবাচক ও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

মৌলিক পার্থক্য ও সমস্যাবলী

'তাকাফুল' শব্দের আভিধানিক অর্থ যৌথ নিশ্চয়তা। ভাল কাজে পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার যে নির্দেশ পবিত্র কুরআনে দেয়া হয়েছে, সেই নির্দেশের আলোকেই বীমা ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে তাকাফুল বা ইসলামী বীমার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। যদি একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে কেউ সুনির্দিষ্ট কিছু বিপত্তির (Perils) কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন তখন গোষ্ঠীর সকল সদস্যের অনুদান বা চাঁদার ভিত্তিতে গঠিত তহবিল হতে ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক সহায়তা প্রদানের যৌথ নিশ্চয়তার ব্যবস্থাকেই 'তাকাফুল' বা ইসলামী বীমা নামে অভিহিত করা হয়।

মালয়েশিয়ায় ১৯৮৪ সালে 'তাকাফুল' আইন প্রবর্তিত হয়। তাকাফুলকে বলা হয়েছে "A scheme based on brotherhood, solidarity and mutual assistance" ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যে পরিকল্প তাকেই বলা হয়েছে তাকাফুল। এই আইনে বলা হয়েছে Takaful, "Provides for mutual financial aid and assistance to the participants in case of need where by the participants mutually agree to contribute for the purpose."

তাকাফুল ব্যবস্থা হতে হবে সম্পূর্ণ শরীয়া আইনের ভিত্তিতে। মালয়েশিয়ার তাকাফুল আইনে বলা হয়েছে Takaful business means business of takaful whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the Shariah" অন্যদিকে বাংলাদেশের বীমা আইনে (Insurance Act 1938) insurance এর কোন সংজ্ঞা নেই তবে Life Insurance Business এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে "Life insurance business means the business of effecting contracts of insruance upon human life, including any contract whereby policies of death by accident only or the happening of any contingency

www.pathagar.com

dependent on human life or which is subject to payment of premiums for a term dependent on human life। কিন্তু ইসলামী জীবনবীমাকে মালয়েশিয়ায় তাকাফুল আইনে বলা হয়েছে "Family solidarity" means takaful for the benefit of the individual and his family" সনাতন জীবনবীমার সাথে ইসলামী জীবনবীমার মৌলিক পার্থক্য এই দুটি সংজ্ঞার মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

ইসলামী জীবনবীমা হচ্ছে ব্যক্তি বা পরিবারের সদস্যদের উপকারার্থে একটি স্কীম বা পরিকল্প, যেখানে স্কীমের সদস্যগণ পারস্পরিক সাহায্যের জন্য একটি সমঝোতায় উপনীত হন এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে তহবিল গঠন করেন। ইসলামী জীবনবীমা ব্যবস্থায় বীমা কোম্পানী কোন বীমাকারী নয় বরং তারা স্কীমের অধীনে গঠিত তহবিল বা ফান্ড এর ব্যবস্থাপক ও প্রশাসক। স্কীমের সদস্যগণ পরস্পরের বীমাকারী।

এই মৌলিক পার্থক্য ছাড়াও তাকাফুল ব্যবসা পরিচালিত হতে হবে শরীয়ার আইন অনুযায়ী এবং মুদারাবার ভিত্তিতে। তাকাফুল ব্যবসা পরিচালিত হবে সুদমুক্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে। একটি তাকাফুল কোম্পানীকে যাকাত দিতে হবে। একটি তাকাফুল ব্যবস্থাপককে নিশ্চিত করতে হবে যে শরীয়ার আইন অনুসারে যেন তাকাফুল স্কীমের অর্থ সাহায্য ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন হয়। দেশের প্রচলিত বীমা আইনে এসবের নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি। তাকাফুল ব্যবস্থায় স্কীমের অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত অর্থ ও শেয়ারমালিকদের অর্থ পৃথকভাবে বিনিয়োগের এবং পৃথকভাবে হিসাব সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। প্রচলিত বীমা আইনে এ ধরনের কোন বিধি বিধান নেই। একটি তাকাফুল কোম্পানীতে শরীয়াহ বোর্ড গঠন করতে হয়। সনাতন বীমা আইনে শরীয়া বোর্ড গঠনের কোন ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি।

অতএব, আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, তাকাফুল বা ইসলামী জীবনবীমা ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করতে হলে তাকাফুল কোম্পানীসমূহের জন্য একটি পৃথক আইন প্রবর্তন করা প্রয়োজন। যেহেতু বাংলাদেশে পৃথক ইসলামী বীমা নিয়ন্ত্রক আইন প্রবর্তন করা হয়নি, কিন্তু ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহ শরীয়াহ আইনের ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেহেতু বর্তমান অবস্থায় কয়েকটি আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ঃ

১. ইসলামী বীমা ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশ ও আইনগত অসঙ্গতিসমূহ দূর করার জন্য পৃথক ইসলামী (তাকাফুল) বীমা আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন।

২. বর্তমান বীমা আইনের যে সব ধারা ইসলামী বীমা ব্যবস্থা প্রচলনের ক্ষেত্রে সরাসরি সংঘর্ষশীল বা বিপরীত সে সব ধারার প্রয়োগ ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে রহিতকরণ।

www.pathagar.com

৩. ইসলামী বীমা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা এবং শরীয়া আইনের আলোকে তাকাফুল ব্যবস্থাপনার একটি আদর্শ মডেল প্রণয়নের লক্ষ্যে ইসলামী চিন্তাবিদ ও আইনবিদদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠন।

ইসলামী জীবনবীমার পদ্ধতিগত ও আইনগত বৈশিষ্ট্য

তাকাফুল স্কীমের পারিবারিক সংহতি (Family Solidarity) বা ইসলামী জীবনবীমার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করলে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ইসলামী জীবনবীমা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা হচ্ছে তা চিহ্নিত করা সহজতর হবে।

ক) ইসলামী জীবনবীমার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর স্বচ্ছতা। ইসলামী বীমা কোম্পানী তাকাফুল স্কীমে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যদের প্রদত্ত অর্থের জিম্মাদার (Trustee)। স্বভাবতই জমাকৃত অর্থ কিভাবে বিনিয়োগ করা হবে, কত অংশ জমাকারীর নিজস্ব হিসাবে জমা থাকবে, কত অংশ অনুদান (Tabarru) হিসেবে জমা করা হবে; অংশগ্রহণকারীর নিজস্ব হিসাবের লভ্যাংশের কত ভাগ বীমা কোম্পানী গ্রহণ করবে, কতভাগ নিজস্ব হিসেবে জমা হবে, এসব ব্যাপারে খোলাসা করে চুক্তির সময় অর্থাৎ পলিসিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ করতে হয়। সনাতন জীবনবীমা পলিসিতে এ ধরনের কোন বিষয় উল্লেখ করতে হয় না।

খ) প্রতি বছর নিজস্ব হিসাবের জমা, লভ্যাংশের জমা ইত্যাদি পারিবারিক তাকাফুল স্কীমের প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে প্রেরণ করতে হয়। ফলে ইসলামী জীবনবীমার হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সনাতন জীবনবীমার হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি হতে ভিন্নতর। এক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক যে সব হিসাব বিবরণী জীবনবীমা কোম্পানীকে প্রস্তুত করতে হয় ইসলামী জীবনবীমার হিসাব পদ্ধতি ভিন্নতর হওয়ার ফলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হবে।

গ) ইসলামী জীবনবীমার সমর্থন মূল্য (Surrender Value) নির্ণয় করা হয় সনাতন বীমার পদ্ধতি হতে ভিন্নতর পদ্ধতিতে। বীমা আইনে সমর্পণ/গ্যারান্টিকৃত সমর্পণ মূল্য নির্ণয়ের ফর্মুলা বীমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত হয়। ইসলামী জীবনবীমায় সমর্পণ মূল্য নির্ভর করবে অংশগ্রহণকারীর নিজস্ব হিসাবে লাভসহ কত জমা আছে তার ওপর।

ঘ) ইসলামী বীমায় স্কীমে অংশগ্রহণকারীর ভুল তথ্য/মিথ্যা তথ্য প্রদানের কারণে চুক্তি বাতিল হতে পারে, কিন্তু অংশগ্রহণকারীর প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা যায় না। সনাতন জীবনবীমা পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি অনুসারে যদি প্রিমিয়াম দেয়া না হয় তাহলে বীমাপত্রটি বাতিল হয় এবং যদি বীমাপত্রটি পরিশোধিত মূল্য প্রাপ্ত না হয় (Paid up Value) তাহলে জমা দেয়া টাকা ফেরত দেয়া হয় না।

www.pathagar.com

ইসলামী জীবনবীমা যে কোন অবস্থায় "নিজস্ব হিসেবে" জমাকৃত টাকা লাভসহ ফেরত দেয়া হবে। এমনকি বীমাগ্রাহক আত্মহত্যা করলেও নিজস্ব হিসেবে জমাকৃত টাকা লাভসহ প্রাপ্য হয়।

ঙ) সনাতন বীমা ব্যবস্থায় বীমাগ্রাহকের মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ পলিসির টাকা এককভাবে পাবার অধিকারী। কিন্তু ইসলামী জীবনবীমা ব্যবস্থায় মনোনীত ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলে তিনি বীমা কোম্পানী হতে যে অর্থ প্রাপ্য হন তা ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুসারে বন্টন করার নিশ্চয়তা বিধান করতে হয়।

চ) ইসলামী জীবনবীমা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীর নিজস্ব হিসেবে লভ্যাংশের অর্থ নিয়মিতভাবে জমা করার পাশাপাশি অনুদান হিসাবের নীট উদ্বৃত্তাংশ গাণিতিক মূল্যায়নের (Actuaal Valuation) ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুনঃবন্টন করতে হয়। সনাতন বীমায় লাভবিহীন পলিসি বিক্রয় করা যায়। কিন্তু ইসলামী জীবনবীমায় অংশগ্রহণকারী সবসময় লভ্যাংশের হকদার।

ইসলামী জীবনবীমা বা তাকাফুল ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ যদি এসব পদ্ধতি ও শর্তাবলী পালন না করেন তবে সেক্ষেত্রে সনাতন ও ইসলামী জীবনবীমার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় দুষ্কর হয়ে পড়বে। অধিকাংশ সনাতন জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ 'তাকাফুল প্রকল্প' নামে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। কিন্তু প্রচলিত বীমা আইনে তাকাফুল বা ইসলামী বীমার কোন সংজ্ঞা নেই। অতএব, এসব প্রকল্পসমূহের আইনগত অবস্থান কি, কিভাবে তাকাফুল প্রকল্পসমূহ নিয়ন্ত্রিত হবে, শরীয়া আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বীমা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা কি তা পরিষ্কার নয়।

এ ধরনের অস্পষ্টতা নিয়ে জীবনবীমা ব্যবসা পরিচালনা করা হলে বাস্তবে তা নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি করবে। সবচাইতে বড় যে সমস্যা হবে সেটি হচ্ছে, ইসলামী জীবনবীমা যারা ক্রয় করবেন বা তাকাফুল প্রকল্পসমূহে যারা অংশগ্রহণ করবেন তারা কেউ নিশ্চিত হবেন না যে, বাস্তবিক অর্থে তারা শরীয়াহ্ ভিত্তিক বীমা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন কি না। ফলে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না। গ্রাহকের বিশ্বাসের বিপরীত সেবা প্রদান করা হলে তা প্রতারণার পর্যায়ে পড়তে পারে।

আশু করণীয়

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ফলে এদেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ ইসলামী জীবনবীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের কল্যাণের লক্ষ্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আগ্রহী, শুধুমাত্র আইনগত সমস্যার কারণে যদি তা শরীয়া সম্মত না হয় তবে সত্যিকার অর্থে তারা প্রতারিত হবেন। আরো একটি উদাহরণ দেওয়া হলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সনাতন বীমা আইনে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের বিনিয়োগের খাতসমূহ সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। এই খাতসমূহের একটি বড় খাত হচ্ছে সুদভিত্তিক বিনিয়োগ। আইনগত বাধ্যবাধকতার

www.pathagar.com

কারণে যদি ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীসমূহকে সুদভিত্তিক বিনিয়োগ করতে হয় তাহলে শরীয়াহ আইনের সুনির্দিষ্ট লংঘন হবে অন্যথায় ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের তহবিল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চরম সংকট সৃষ্টি হবে এবং প্রচলিত বীমা আইনের লংঘন হিসেবে গণ্য হতে পারে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনগণের চাহিদা মোতাবেক যেহেতু একাধিক ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীর অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং যেহেতু সনাতন জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ জনগণের মধ্যে ইসলামী বীমা ও তাকাফুল প্রকল্পের নামে বিভিন্ন বীমাপত্র বিক্রয় করছেন এবং জনগণ এই সব বীমাপত্র সরল বিশ্বাসে ক্রয় করছেন, সেহেতু আইনগত এই সব সমস্যা ও জটিলতা নিরসন করা এবং আশু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এ লক্ষ্যে তাকাফুল বা ইসলামী বীমাসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য বীমা অধিপ্তরে একটি 'তাকাফুল সুপারভাইজারী সেল' (Takaful Supervisory Cell) গঠন করা যেতে পারে। এই সেল ইসলামী সাধারণ ও জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের এবং তাকাফুল প্রকল্পসমূহের যাবতীয় স্কীম ইসলামী শরীয়ার আলোকে প্রবর্তিত হচ্ছে কিনা এবং ইসলামী শরীয়ার বিধান মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

দেশের বীমাবিদ, আইনবিদ ও আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত এই সেল এর প্রধানতম কাজ হবে ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনগত সমস্যাসমূহকে চিহ্নিত করা এবং সকল অসঙ্গতিসমূহ দূর করার লক্ষ্যে ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহকে, সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ বোর্ডসমূহকে, বীমা অধিপ্তরকে এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা। এই সেলের পরামর্শ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও এজেন্সীসমূহ যদি আশু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে তবেই ইসলামী জীবনবীমার গ্রাহক সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী, কেননা ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ জনগণের সঞ্চিত অর্থের জিম্মাদার। শরীয়াহ্ আইন অনুসারে যে ব্যবস্থা প্রচলিত করার অঙ্গীকার করা হচ্ছে তা যদি বাস্তবিক শরীয়াহ আইন অনুযায়ী বাস্তবায়িত না হয় এবং আইনগত অসঙ্গতি, উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও কার্যকর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণে, আইনগত জটিলতা প্রকট হতে প্রকটতর হওয়ার আশংকা বিদ্যমান।

সর্বশেষ কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে তা হচ্ছে এই যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় সুস্পষ্ট বলা হয়েছে: 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।"

www.pathagar.com

সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বাংলাদেশের জনগণের পরিপূর্ণ বিশ্বাসের কথা শাসনতন্ত্রে খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কারণেই বাংলাদেশের জনগণ সুদমুক্ত ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং সরকার ইসলামী ব্যাংকের পাশাপাশি ইসলামী বীমার প্রবর্তন ও প্রচলনের অনুমোদন দিয়েছে। অতএব, আইনগত সমস্যা নিরসন একটি শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আইন মানুষের জন্য তথা মানুষের কল্যাণের জন্য। জনগণের মহৎ ও সুন্দর আশা-আকাঙ্ক্ষার সফল বাস্তবায়নের জন্যই আইন। ইসলামী বীমা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সনাতন বীমা ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে মানবকল্যাণের মহত্তম লক্ষ্যে।

ইসলামী বীমা তথা ইসলামী জীবনবীমা একটি আর্থ-সামাজিক জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহুদেশে প্রবর্তিত হয়েছে এবং বিকাশ লাভ করছে। ইসলামী জীবনবীমার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ করার সুযোগ পাবে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বীমা ব্যবস্থাকে যারা শরীয়াহ আইনসম্মত নয় মনে করে কোনদিন জীবনবীমা গ্রহণ করেননি সেই বৃহত্তম জনতার ক্রম অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে জীবনবীমা ব্যবসার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সুযোগ ও সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের বৃহত্তর কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনা করেও ইসলামী জীবনবীমার আইনগত সমস্যা দূর করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে দ্বিতীয় পরিচ্ছদে মৌলিক নীতিমালায় স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে : "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এইভাবে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।"

সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আমাদের সকল কাজের ভিত্তি। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গড়ে তোলা হয়েছে কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ভিত্তিক ইসলামী বীমা ব্যবস্থা। অতএব, ইসলামী জীবন বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সব আইনগত বাধা তা দূর করে জনকল্যাণমূলক একটি পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা নৈতিক বা ধর্মীয় দায়িত্বই নয় উপরন্তু একটি শাসনতান্ত্রিক অধিকার ও অঙ্গীকার।

www.pathagar.com

বার.

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী জীবনবীমার ভূমিকা

ইসলামী জীবনবীমা (পারিবারিক তাকাফুল) হলো একটি সঞ্চয় পরিকল্পনা। অবশ্য, মৃত্যু হলেও এটা নিশ্চিত করে যে, প্রত্যাশিত পরিমাণ সঞ্চয় কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজনে পাওয়া যাবে। এটা হচ্ছে, সম্পত্তি সৃষ্টির একটি উপায়। বীমাগ্রহীতা তার সঞ্চয়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই মারা যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে এটা রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। জীবনবীমাকে দেখা যেতে পারে পরের তারিখ দেয়া (Post Dated) চেক হিসাবে। বার্ধক্যে আয়ের উৎসরূপে ব্যবহারের জন্য অর্থ জমানোর একটা পন্থাও এটা। ইসলামী জীবনবীমা মানুষের দু'টি মূল লক্ষ্য পূরণ করে থাকে ঃ (ক) পোষ্যদের জন্য সম্পত্তি সৃষ্টির নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে রক্ষাকবচের ভূমিকা, (খ) ভবিষ্যৎ আয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য সম্পত্তি সৃষ্টির মাধ্যমে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা। বৃদ্ধ বয়সের সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজন সঞ্চয়। আর অল্প বয়সে প্রাণহানির বিপরীতে প্রয়োজন আর্থিক নিরাপত্তার। হঠাৎ মৃত্যুর ক্ষেত্রে অবিলম্বে সম্পত্তি সৃষ্টির অনন্য পন্থা হলো জীবনবীমা। এই বীমার প্রধান উদ্দেশ্য, আয়রোজগারকারীর মৃত্যুতে পোষ্যদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, কারো অবসর জীবনের জন্য কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে অর্থ সঞ্চিত করা।

জীবনবীমার আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব

জীবনবীমা মানব জীবনের আর্থ-সামাজিক মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যা উৎসারিত হয় ব্যক্তির উপার্জন ক্ষমতা এবং অন্যের প্রতি দায়-দায়িত্ব থেকে। মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকে কেবল তখনি যখন অন্য কোন ব্যক্তি বা সংগঠন তার কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারে। জীবনের অর্থনৈতিক মূল্যকে প্রাধান্য দিয়ে (জীবনবীমার মাধ্যমে) কোন ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের এমন অর্থনৈতিক অবস্থায় রেখে মারা যাওয়ার আশা করতে সক্ষম হন যেন, তিনি বেঁচে থাকলেও তারা যে অবস্থায় জীবনযাপন করতে পারতো তা নিশ্চিত করা যায়। জীবনবীমার বিকাশের অর্থ হলো, পরিবার প্রধানদের মাঝে দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

www.pathagar.com

সময়ের সাথে সাথে মানুষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কমে যায়। একেকটি বছর অতিক্রান্ত হয় আর ব্যক্তির উৎপাদনশীলতার বাকী মেয়াদ আরো কিছুটা কমে যায়। সম্ভাব্য আয় প্রকৃত আয়ে রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে ব্যক্তির অর্থনৈতিক মূল্য হ্রাস পায়। তাই বলা হয়ে থাকে, একজনের জীবনবীমা থাকা উচিত সেই পরিমাণে যা পুঁজি হিসাবে তার উপার্জনের গুরুত্বের সমান হয়। যেহেতু কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক গুরুত্ব পারিবারিক কিংবা ব্যবসায়িক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত, আমরা পরিবার ও ব্যবসায় উভয় ক্ষেত্রে জীবনবীমার প্রয়োজন ও প্রয়োগের বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

একটি পরিবারের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনবীমা অতি প্রয়োজন। কারণ পরিবার প্রধানের সর্বপ্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পরিবারের পরিচর্যা। পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত এবং যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে হয়। একইভাবে, ব্যবসার জগতে জীবনবীমার নানাবিধ প্রয়োজন ও প্রয়োগ রয়েছে। যেমন, কর্মচারীদের কল্যাণ, ব্যবসা অব্যাহত রাখা, জমা বৃদ্ধি, গুরুত্বপূর্ণ প্রধান ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি।

জীবনবীমার প্রধান কাজ হলো, মানবজীবনের মূল্য হ্রাসের কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট থেকে মানুষকে রক্ষা করা। বাস্তবে জীবনবীমা সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। জীবনবীমা প্রত্যেক পলিসিহোল্ডারের আর্থিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করে। পলিসিহোল্ডার ও তাদের বেনিফিশিয়ারীদেরকে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করে জীবনবীমা।

জীবনবীমার প্রয়োজন

স্মরণাতীতকাল থেকে মানুষ নিরাপত্তার জন্য সংগ্রাম করছে। যুগে যুগে বহু পন্থা অবলম্বন করছে তার নিরাপত্তার চাহিদা পূরণের জন্য। বিভিন্ন কালে মানুষের চারপাশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করেছে, সে মোতাবেক এসব পন্থা বিভিন্ন রকম ছিল। মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করে নিরাপত্তা চেয়েছে। জীবনের নানা সমস্যা থেকে বাঁচতে উদ্ভাবন করা হয়েছে যৌথপরিবার ব্যবস্থা। সময়ের পরিবর্তনে যৌথপরিবার গেছে ভেঙ্গে এবং একক পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে স্বামীর ওপর। অল্প কিছু ক্ষেত্রে যৌথভাবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ওপর। সাধারণত একজন পরিবার প্রধান তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিছক বেঁচে থাকার জন্য আয়ের কথা ভাবেন না। তিনি আশা করেন, তাঁর সন্তানরা সুশিক্ষিত হবে এবং ভাল বিয়ে হবে তাদের। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে সবাই। আরো আশা করেন, অবসর জীবন হবে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ। এসব আশা মেটাতে দেখা দেবে বিভিন্ন সময়ের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন যা তিনি মোটামুটি হিসাব করতে পারেন। যদি প্রয়োজন পূরণের মতো পর্যাপ্ত অর্থ তার না থাকে তাকে অবশ্যই নিয়মিত আয়ের ও সম্পদের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বেতনভোগী ব্যক্তিদের আয় বন্ধ হয়ে যায়

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট একটি বয়সে। তিনি অবসর গ্রহণের পর বেঁচে থাকলেও, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, সন্তানরা মাতা-পিতার ভরণপোষণ করার মতো অবস্থায় নাও থাকতে পারে। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সাধারণত অসহায় দম্পতিকে সাহায্য করতে চায় না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার দরুন তিনি চাকরি পাবেন না। আবার চাইলেও হঠাৎ করে তাদের ব্যয় হ্রাস করতে তারা পারবেন না। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাদের খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সময়।

মানুষ হিসাবে আমাদের সবার রয়েছে স্ত্রীর জন্য একই ভালবাসা, সন্তানের জন্য একই প্রত্যাশা ও পরিকল্পনা এবং অভিন্ন দায়িত্ব ও আকাঙ্ক্ষা। জীবনের অনিশ্চয়তার কারণে আমরা তাই একই রকম সংকটের সম্মুখীন হই। উপযুক্ত সঞ্চয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সংকট মোকাবেলা করা সম্ভব হতে পারে। যদিও আমাদের পরিকল্পনা থাকে, কিন্তু যথেষ্ট সঞ্চয় করার আগেই আমাদের মৃত্যু হতে পারে কিংবা দীর্ঘায়ু হওয়া সত্ত্বেও সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় হতে পারে অতি সামান্য। এই দুটো অবস্থার কোনটার ব্যাপারেই পূর্বাভাস দেয়া যায় না। কখন ও কত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে, তা আগেভাগেই কেউই বলতে পারেন না। কেবল আল্লাহ তা'লাই এটা নির্ধারণ করে থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, সঞ্চয়ের সাধারণ পরিকল্পনাসমূহ এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় না। শুধু যথাযথ জীবনবীমার সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমেই আমরা বেশ ভালোভাবে উভয় পরিস্থিতির উত্তরণ করতে পারি। জীবনবীমা কিভাবে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক চাহিদা মেটায় এবং সবধরনের সাধারণ সঞ্চয় পরিকল্পনাকে অতিক্রম করে যায়, আসুন তা আমরা যাচাই করে দেখি।

অন্যান্য যে কোন সঞ্চয় পরিকল্পনার বিপরীতে জীবনবীমা ব্যবস্থা আর্থিক তহবিল সৃষ্টির পদ্ধতি হিসাবে অনন্য। এর মূল কারণ হলো বাধ্যবাধকতা। পলিসিহোল্ডার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রিমিয়াম দিতে ব্যর্থ হলে তিনি জীবনবীমার সুফল থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। এটা সত্য, যে জীবনবীমার সঞ্চয় পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম দিকে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের সমপরিমাণে অর্থ ফেরত দেয় না। আমাদেরকে অবশ্যই সহযাত্রী পলিসিহোল্ডারদের রক্ষা করার জন্য একটি তহবিল গঠন করা প্রয়োজন হয়। আকস্মিক মৃত্যুর ফলে প্রয়োজনীয় প্রিমিয়ামের সবক'টি যারা জমা দিতে পারেন না তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া সম্ভব হয়।

আমরা সবাই জানি, বার্ধক্য একটা সমস্যা। কারণ, অনেকেই তখন কাজ ও আয় ছাড়াই জীবন কাটান। অথচ খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের জন্য তাদের অর্থের প্রয়োজন। আজীবন এসব চাহিদা মেটানোর মতো আয়ুর গ্যারান্টি দিতে পারে জীবনবীমার পদ্ধতি। কেননা, এর মাধ্যমে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ সারাজীবন ধরে প্রদান করার ব্যবস্থা করা সম্ভব। একইভাবে বলা যায়, জীবনবীমা ব্যতিরেকে আর কোন সঞ্চয় পরিকল্পনা পঙ্গুত্বের মতো বিপদে সহায়ক হয় না। পলিসিসিহোল্ডার পুরোপুরি ও

www.pathagar.com

স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করলে তার প্রিমিয়াম মওকুফ হয়ে যায় এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক জীবনবীমার বিপরীতে আর্থিক সহায়তা তিনি ভোগ করতে থাকেন। পলিসিহোল্ডারের মৃত্যু ঘটলে তাঁর পোষ্যদের জন্য অর্থ যোগানোর একমাত্র এ নিশ্চিত পন্থা হলো জীবনবীমা। জীবনবীমার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, চুক্তি করার পরপরই সম্পত্তি সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন পলিসি হোল্ডারকে সময় দেয়া হয় ক্রমান্বয়ে সঞ্চয় করার জন্য। নির্ধারিত মেয়াদের আগেই মৃত্যু হলে পলিসিহোল্ডারকে আর অর্থ প্রদান করতে হয় না। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত অন্যান্য ধরনের সম্পদের ক্ষেত্রে, আমাদেরকে প্রথমে সঞ্চয় করতে হয় সেগুলো কেনার জন্য। তাই, আমাদের জন্য সঞ্চয়ের অন্য যে কোন পদ্ধতির চেয়ে জীবনবীমার মাধ্যমে সঞ্চয় বেশী উপযোগী।

জীবনবীমার প্রয়োগ

জীবনবীমা পলিসির চুক্তি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনার আওতায় এসব পলিসির ভিত্তি তৈরি হয়। শুধু মৃত্যুর ফলে প্রাপ্য হয়, এমন অর্থ পরিশোধ করা সাময়িক বীমায়। তবে শর্ত হলো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মৃত্যু সংঘটিত হতে হবে। এটা ব্যবসায়িক ভ্রমণের জন্য সুবিধাজনক। একই সাথে, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত তরুণ দম্পতির জন্যও এ ধরনের বীমা উপযোগী। স্বামী তার মৃত্যুর সময়ের স্ত্রীর জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ রেখে যেতে চাইলে জীবনবীমা খুবই সহায়ক হয়ে থাকে এবং পোষ্যদের সারা জীবনের ভরণপোষণের জন্য বেশ কার্যকর। চাকুরিজীবীরা অবসর গ্রহণ পর্যন্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে পারেন এবং বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরই কেবল পলিসির অর্থ পরিশোধ করা হবে। অন্যদিকে 'মেয়াদী বীমা' (এনডাওমেন্ট ইন্সুরেন্স) ভবিষ্যতের জন্য অতিরিক্ত আকর্ষণমুক্ত একটি সঞ্চয় পরিকল্পনা। যারা আশা করেন যে, মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত তারা বাঁচবেন এবং অর্জিত মুনাফা নিজে কিংবা সুনির্দিষ্ট কোন কাজে ব্যয় করবেন, তাদের জন্য মেয়াদী বীমা বেশ জনপ্রিয়। যখন কারো কাছে প্রচুর অর্থ থাকে এবং তিনি অবসর নেয়ার পর নিজের জন্য আয়ের ব্যবস্থা করতে চান, তিনি বার্ষিক আয়ের উদ্যোগ নিতে পারেন। একক প্রিমিয়াম বীমার মাধ্যমে এই বীমার আওতায় তিনি একসাথে প্রদত্ত বেশকিছু পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মেয়াদান্তে একটি নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাবেন। কর্মচারীদের জীবনের ঝুঁকি, দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যহানির আশংকা, প্রভৃতির প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য গ্রুপবীমা, পঙ্গু বা প্রতিবন্ধী বীমা, কঠিন অসুস্থতা বীমা, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খরচ মেটানোর বীমা প্রভৃতি গ্রহণ করতে পারেন। অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের মানুষ মাসিকভিত্তিতে প্রিমিয়াম দিয়ে ক্ষুদ্রবীমা গ্রহণের সুযোগ নিতে পারেন।

জীবনবীমা কেবল একটি পরিবারকেই রক্ষণাবেক্ষণ করে না, ব্যবসাকে বাঁচানোর জন্যও জীবনবীমার ব্যবহার করা যায়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের মৃত্যু কিংবা পঙ্গুত্বের কারণে সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে ব্যবসাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

ঐ ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমূহের জীবনবীমার ব্যবস্থা রয়েছে। কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তি হচ্ছেন ঐসব কর্মচারী যারা পঙ্গুত্ব বা মৃত্যুবরণ করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির শিকার হতে হয়। শীর্ষস্থানীয় নির্বাহী, গবেষক, বিক্রয় ব্যবস্থাপক, প্রধান হিসাবরক্ষক প্রভৃতি পদে নতুন লোক নিয়োগ ব্যয়বহুল। কারণ নতুন কাউকে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে একই পদে অধিষ্ঠিত আগের লোকের মতো যোগ্য করে তুলতে সময় ও অর্থের দরকার। পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রে, গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পদটি যে শূন্য হয়ে যায়, শুধু তা-ই নয়, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার বেতন অব্যাহত রাখতে হয়। 'কী ম্যান ইন্স্যুরেন্স' ঐ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচায় আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি থেকে। এ ধরনের বীমা বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক, কেননা, তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত শক্তি যুগিয়ে থাকে।

জীবনবীমা রক্ষা করে স্বত্বাধিকারীর উত্তরাধিকারীদেরকেও। মালিকের মৃত্যু বা পঙ্গুত্বের কারণে ব্যবসার মূল্যহ্রাস এবং ব্যবসায়িক বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে গিয়ে মালিকের অন্যান্য সম্পদও নিঃশেষ হয়ে যাবে– এহেন আশঙ্কার বিরুদ্ধে জীবনবীমা রক্ষাকবচ। অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসাতে অংশীদারদের জীবনবীমা তাদের কোন একজনের পঙ্গুত্বের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির হাত থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বাঁচায় এবং কোন একজন অংশীদারের মৃত্যু সত্ত্বেও ব্যবসাটি অব্যাহত থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করে। অংশীদার মালিকের মৃত্যুর ফলে ব্যবসায় চালানো সম্ভব না হলে এবং প্রতিষ্ঠানটির অবলুপ্তি ঘটাতে হলে যে ক্ষতি হবে, জীবনবীমা তা থেকে রক্ষা করে ঐ মৃত অংশীদারের উত্তরাধিকারীদেরকে। জীবনবীমার পলিসিকে ঋণের জামানত হিসাবে ব্যবহার করা যায়। গ্রুপভিত্তিক জীবনবীমা ও পেনশন পরিকল্পনা অভিজ্ঞ ও মূল্যবান কর্মচারীদের আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে বেশ ফলপ্রসূ উপাদান হিসাবে গণ্য।

বীমা এবং মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য

সাধারণতঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বীমার ভূমিকা ও গুরুত্ব কমই অনুধাবন করা হয়। নীতিনির্ধারকরা বিষয়টি তেমন উপলব্ধি করেন না। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বীমার বিকাশ খুব বেশী উৎসাহব্যঞ্জক নয়। বীমা শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি বৈশিষ্ট্য নয় বরং এটা ব্যক্তি ও সার্বিকভাবে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বীমার পরিকল্পনা করা হয় ব্যক্তি, পরিবার ও সংগঠনের সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক অবস্থাকে স্থিতিশীল হতে সাহায্য করার জন্য। জীবনের নানা বিপর্যয়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার মধ্যদিয়ে বীমা এই দায়িত্ব পালন করে। তদুপরি বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে– বিপুল সংখ্যক জীবনবীমা পলিসি কেনা হয় এবং এগুলো নিঃসন্দেহে সরকারের জন্য সমাজকল্যাণ কার্যক্রমকে সহজ করে দেয়। সরকারের ঘাড় থেকে সমাজকল্যাণ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের বোঝা নামাতে ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

www.pathagar.com

পালন করে জীবনবীমাকারীরা। শুধু তাই নয়, তারা ব্যবসা ও অন্যান্য উদ্যোগের ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করে এবং সাহায্য করে পুঁজিবাজারের প্রসারে। জনগণের সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বীমার ভূমিকা বিরাট। তাছাড়া, বীমার মাধ্যমে সৃষ্ট তহবিল পলিসির মালিক (বীমাগ্রহীতা) এবং গোটা জাতি উভয়ের সর্বোত্তম স্বার্থে নিয়োগ করা যায়। সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণে বীমা কোম্পানীগুলোর উদ্বৃত্ত অর্থ সামাজিকভাবে বাঞ্ছিত প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ দ্বারা এটা নিশ্চিত হতে পারে।

সম্ভাব্য আপদকালীন প্রয়োজন মেটানোর জন্য কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজনীয় সঞ্চিত রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণকে বীমা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হ্রাসকরণ সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপদ কালীন তহবিলের জন্য অর্থ আলাদা করে জমা রাখতে হতো তবে বীমার প্রিমিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ তার দরকার হবে। কারণ, ভবিষ্যতে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে না জানার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ ক্ষেত্রে 'রক্ষণশীল' হতে হবে। জীবনবীমার মাধ্যমে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তিকে ক্ষতির হাত হতে রক্ষা করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মানসিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। কোন ব্যবসাকে রক্ষা করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকলে এর একক স্বত্বাধিকারী, অংশীদার কিংবা মূল কর্মকর্তার মৃত্যু বা পঙ্গুত্বের কারণে ঐ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটার আশংকা থাকে না।

যেহেতু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বীমার প্রয়োগ বহুবিদ সেহেতু, সমাজের সর্বাধিক সুবিধার স্বার্থে বীমার সেবা কার্যক্রম সবার মাঝে সম্প্রসারিত করা আবশ্যক। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান। অতএব ইসলামী সমাজের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। ইসলামী সমাজে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসই হচ্ছে মূলকথা। এটা মানুষের অহংকার ও হতাশা, দুটোই দূরীভূত করে দেয়। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ এই নয় যে, সমাজের মানুষগুলো স্রষ্টার হাতের পুতুল মাত্র। মানুষকে বেঁচে থাকার তাগিদে তার জীবিকা নির্বাহের উদ্যোগ নিতেই হবে। অবশ্যই তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে হবে। যুক্তিযুক্তভাবে, দায়িত্বশীলতার সাথে তাদেরকে আচরণ করতে হবে। "যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে, আল্লাহ সাহায্য করে থাকেন তাদেরকেই"। রাসূল (সাঃ) জনৈক অভাবী ব্যক্তিকে জীবিকা নির্বাহের জন্য কুড়াল কিনতে এবং তা দিয়ে বন থেকে কাঠ কেটে আনতে উপদেশ দিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে জনগণের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে ফসল ভালো হবার মওসুমে তা সঞ্চয় করে রাখার জন্য ইউসুফ (আঃ) রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এসব দৃষ্টান্ত এই ইঙ্গিতই দেয় যে, আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি হিসাবে জীবনবীমা ইসলামের ও ঈমানের মূলনীতির পরিপন্থী নয়। রাসূল (সাঃ) একলোককে উপদেশ দিয়েছিলেন, কেবল উট বেঁধে রাখার পরই আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে। সুতরাং আল্লাহতে বিশ্বাসস্থাপন করার মানে এই নয় মানুষ জঙ্গলের মধ্যে সন্ন্যাসীর মতো জীবন যাপন করবে এবং তার নিজের ও পরিবার-পোষ্যের জন্য কোন কাজ করবে না।

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং গোটাসমাজের উন্নয়ন। কাঙ্ক্ষিত শোষণমুক্ত সমাজের জন্য প্রয়োজন রয়েছে পর্যাপ্ত পুঁজিগঠনের। 'তাকাফুল' ব্যবস্থা (ইসলামীবীমা) আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকে পরিবারের পুঁজিগঠনের সহায়ক হবে। পারিবারিক তাকাফুল ব্যবস্থার মাধ্যমে সঞ্চয় করতে প্রতিটি মুসলমান উদ্বুদ্ধ হবে এবং সামষ্টিক উদ্বৃত্ত তহবিল পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা হবে। এর ফলে সম্পদের আরো ব্যবহার এবং অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ইসলামী সমাজে বস্তুগত উন্নতি কাঙ্ক্ষিত হলেও তা নিশ্চয়ই অন্যদেরকে শোষণ ও বঞ্চিত করার মধ্যদিয়ে নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ভিত্তিক আর্থসামাজিক পন্থার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হলো তাকাফুল। এই প্রক্রিয়া মুদারাবা বা সীমিত অংশীদারিত্ব পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে থাকে। ব্যক্তি, পরিবার ও সংগঠনের আর্থিক সহায়তা ও স্থিতির উদ্দেশ্যে পারিবারিক তাকাফুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সময়ে তাকাফুল প্রতিষ্ঠান বৃহৎ প্রকল্পসমূহের অর্থায়ন এবং সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করে থাকে।

উন্নত বিশ্বে বীমাকারীরা অনেক ধরনের স্কীম চালু করে থাকেন। এভাবে অব্যাহত পরিবর্তনশীল এবং বৈচিত্র্যময় সমাজের চাহিদা পূরণ করা হয়। শক্তিশালী ও গতিশীল অর্থনীতির উপাদান এবং ব্যক্তি ও সংগঠনের রক্ষাকবচ হিসাবে বীমা সব দেশে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। মুসলিম দেশগুলো তাদের জনগণের জীবনযাত্রার মান টেকসইভাবে ও যথেষ্ট বাড়াতে সক্ষম হয়নি। এর অন্যতম কারণ হলো, বীমা পর্যাপ্ত ও যথাযথ প্রসার না হওয়া। এখন পর্যন্ত মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রসমূহে বীমার প্রসার ঘটেছে খুব কম। তাকাফুল ব্যবস্থা এসব দেশের বীমাবাজার সম্প্রসারণের পথ খুলে দিয়েছে। তাকাফুল ও পুনঃতাকাফুলের ক্রমবর্ধমান বাজার মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আমরা যদি উন্নত বিশ্বের জীবনবীমার 'ঘনত্বের' সাথে মুসলিম দেশগুলোর তুলনা করি অর্থনীতিতে এর বিরাট সম্ভাবনা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবো। জাপানে জীবনবীমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ মাথাপিছু প্রায় চার হাজার ডলার। অন্যদিকে মালয়েশিয়ায় এর পরিমাণ ১শ' ডলারের মতো। আর আমাদের বাংলাদেশে তা মাত্র ১ ডলার। এর থেকে প্রমাণিত হয়, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে তাকাফুল বা ইসলামী বীমা প্রসারের বহু সুযোগ বিদ্যমান। অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে তাকাফুল বাজার এগিয়ে যেতে বাধ্য। তাকাফুল শিল্পের বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল। পারিবারিক তাকাফুলের চাহিদার মধ্য দিয়ে জনগণের আয় ও সম্পদ প্রতিফলিত হয়। তবুও এটা উল্লেখ করা দরকার যে, মুসলিম দেশগুলোতে ঝুঁকির ব্যাপারে সচেতনতা একেবারেই নগণ্য। এসব দেশের বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত সমাজ ও নীতিনির্ধারকদের মাঝে তাকাফুল বাজার এগিয়ে যেতে বাধ্য। তাকাফুল শিল্পের বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর

www.pathagar.com

নির্ভরশীল। পারিবারিক তাকাফুলের চাহিদার মধ্য দিয়ে জনগণের আয় ও সম্পদ প্রতিফলিত হয়। তবুও এটা উল্লেখ করা দরকার যে, মুসলিম দেশগুলোতে ঝুঁকির ব্যাপারে সচেতনতা একেবারেই নগণ্য। এসব দেশের বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত সমাজ ও নীতিনির্ধারকদের মাঝে তাকাফুল সম্পর্কে আরো উন্নত ও আরো গভীর উপলব্ধি সৃষ্টি করা জরুরি। তাদেরকে একথা বুঝতে হবে যে, তাকাফুল ব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহর জীবনমান ও কল্যাণ বৃদ্ধি করতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

তাকাফুল কীভাবে মুসলিম সমাজের উপযোগী?

ইসলামীবীমা (তাকাফুল) হলো প্রচলিত গতানুগতিক বীমার বিকল্প। ইসলামের অনুসারীদের বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় এই বীমা ট্রাস্টীশিপ ('অছি' হিসাবে দায়িত্ব পালন) এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা পরস্পরকে সহায়তা করার জন্য আর্থিক দায়দায়িত্ব ভাগ করে নেয়ার নিজস্ব উপায় হিসাবে তাকাফুল পদ্ধতির প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করছে। তাকাফুল এমন একটি সামাজিক পরিকল্পনা যার মূলনীতি হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব, একাত্মতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা। এই ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা একে অন্যকে আর্থিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে সক্ষম হন। তারা এ জন্য স্বেচ্ছায় নির্ধারিত পরিমাণে অর্থ প্রদান করতে সম্মত হন অনুদান হিসেবে। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতিকে সামষ্টিকভাবে ভাগ করে নেয়ার মূলনীতি থেকে এর উৎসারণ। ইসলামের শিক্ষা, তথা কুরআন ও সুন্নাহ'র ভিত্তিতে তাকাফুল পদ্ধতির উদ্ভব। আল কুরআন বলে, 'সৎকর্ম ও ইবাদতের ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য করো।' (সূরা মায়েদা ৫ঃ২) রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, ঈমানদার বা বিশ্বাসীরা তাদের একের জন্য অন্যের ভালোবাসা, করুণা ও সহানুভূতির কারণে এক দেহের সমতুল্য। আর এই গোটা দেহ অনিদ্রায় ও জ্বরে একইভাবে সাড়া দেয়।" (মুসলিম)

সাধারণত তাকাফুল বলতে বুঝায় 'যৌথ নিশ্চয়তা'। এটা একদল মানুষের ('অংশীদার') পারস্পরিক সমঝোতা। যারা কোন ঘটনা (ঝুঁকি মোকাবেলা চুক্তির শর্তানুসারে) ঘটলে একে অন্যকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার নিশ্চয়তা দিতে সম্মত হন। তাকাফুল চুক্তির মূল লক্ষ্য হচ্ছে অংশীদারদের গঠিত অভিন্ন তহবিল থেকে সাহায্য প্রদান করা। আর তাকাফুলের মূল ভিত্তি হলো– শরীয়াহ সম্মত নয়, এমন কোন কিছুতে সম্পৃক্ত না হওয়া। অর্থাৎ, এটা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত শরীয়াহ তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড বা পরিষদ তাকাফুল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে থাকেন স্বাধীনভাবে। শরীয়াহর মূলনীতি অনুমোদন করে না, এমন কোন কিছু তাকাফুল পরিচালনাকারীরা করছেন না– এটা নিশ্চিত করা এই বোর্ডের দায়িত্ব।

তাকাফুল ব্যবসায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাভের অংশীদারিত্ব। স্বচ্ছতা

www.pathagar.com

তাকাফুল চুক্তিতে একান্ত অপরিহার্য। উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবসা পরিচালনাকারী ও অংশীদারদেরকে চুক্তির নির্ধারিত হার অনুপাতে বন্টনের ব্যবস্থা করা জরুরি। তহবিল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং বন্টন করার মতো উদ্বৃত্ত অর্থ রয়েছে– এটা নিশ্চিত করার জন্য তাকাফুল কার্যক্রম পরিচালনাকারীদেরকে বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও ন্যায়নীতির সাথে কাজ করতে হয়। এটা সুবিচার ও সুষ্ঠু বন্টনে সহায়ক। এভাবে অংশীদারদের অধিকার সংরক্ষিত হয় সর্বাধিক।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন মোতাবেক লভ্যাংশ বন্টনের জন্য তাকাফুল প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের কোন একজনকে মনোনীত করতে হয়। মনোনীত ব্যক্তি কেবল ট্রাস্টী বা অছি হিসাবে তাকাফুলের লাভটা গ্রহণ করেন। একইভাবে, তাকাফুলের বিধিবিধান ইসলামী আইনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের উৎসগুলোর ভিত্তিতেই প্রণয়ন করা উচিত। তাকাফুল পরিচালিত হয় মুদারাবা অর্থায়ন পদ্ধতির অনুসরণে। ফলে তাকাফুল রিবা (সুদ) থেকে মুক্ত।

অধিকন্তু, ইসলামী বীমার চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে হবে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি। ইসলামী ব্যবস্থায় বীমা করার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অসহায় মানুষকে ভবিষ্যতের অপ্রত্যাশিত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো, কষ্ট ও দুর্ভোগ লাঘব এবং আরামদায়ক জীবন নিশ্চিত করা। আল কুরআনে বলা হয়েছে "আল্লাহ চান তোমরা সহজ জীবন উপভোগ কর। তোমরা দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হও– এটা তিনি কামনা করেন না।" (২ঃ১৮৫)

দৈনন্দিন জীবনের আচরণ প্রসঙ্গে মুসলমানদের যে বিশ্বাস, তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমানতদারী ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত সামাজিক একাত্মতা বা সংহতির একটি পদ্ধতি হিসাবে তাকাফুল ব্যবস্থার ব্যবহার করা হচ্ছে। জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর তরুণ বয়সে আম (সর্ব সাধারণ) সাহায্য তহবিল গঠন করেছিলেন। পথিমধ্যে হামলাসহ নানান ঝুঁকির কারণে ব্যবসায়ীদের লোকসান হতো। তাদেরকে সাহায্য ও রক্ষা করাই ছিল এই তহবিলের উদ্দেশ্য। রাসূল (সাঃ) নিজে ছিলেন ইয়াতিম। প্রথমে পিতামাতা ও পরে পিতৃব্য তাঁকে লালন-পালন করেছেন। পারস্পরিক সহায়তায় তহবিল গড়ে তুলে তার অর্থে অসহায় ও ইয়াতিমদের সাহায্য করা যে প্রয়োজন, তা মুসলমানদের জানা আছে। এসব মূলনীতির ভিত্তিতে মুসলিম মনীষীগণ প্রাণহানি, অসুস্থতা ও অন্যান্য সম্ভাব্য ও অজানা বিপদ মোকাবিলায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক রক্ষাকবচের ইসলামী পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। মানবজাতির কল্যাণই ইসলামের লক্ষ্য। ইসলাম চায়, মহান স্রষ্টার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী মানুষ জীবন পরিচালনা করুক। সর্বদাই মানবিক সম্পর্কের মাঝে নৈতিকতা প্রবিষ্ট করতে চায় ইসলাম। ইসলামী সমাজের মহান আদর্শের সাথে তাকাফুল ব্যবস্থা তাই পুরোপুরিই খাপ খেয়ে যায়।

www.pathagar.com

তাকাফুল পদ্ধতি ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপযোগী কিভাবে?

ইসলামে বস্তুগত দিকের চেয়ে মানবিক বিষয় বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী অর্থনীতির এটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "যদি কেউ নিজে পেট পুরে খায়, অথচ তার প্রতিবেশী থাকে অভুক্ত, তাহলে ঐ ব্যক্তি মুমিন না"। প্রতিবেশী, আত্মীয় পরিজন এবং দুঃস্থ-দরিদ্রকে সাহায্য করা ভ্রাতৃত্বভিত্তিক ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে অবদান রাখে। পারিবারিক তাকাফুল হলো এমন এক ব্যবস্থা যা ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূল নীতির ভিত্তিতে একে অপরকে সাহায্য করার পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে। তাকাফুলের প্রবর্তন ঘটেছে সহযোগিতা ও যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে দুঃস্থজনকে সাহায্য করার জন্য। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন সম্পদের স্থানান্তর ও বন্টনের জন্য এমন বিধান করেছে যা অন্যান্য আইনগত ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নেই। ইসলামে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি অনেকের (বেনিফিশিয়ারী) মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে কেবল একজন মাত্র উত্তরাধিকারীকে পুরো সম্পত্তি দিয়ে দেয়া হয় না। তাকাফুল প্রকল্পে একজন অংশগ্রহণকারীকে অন্য একজন 'অছি' নিযুক্ত করতে হয় যিনি ইসলামী আইন মোতাবেক প্রাপ্ত অর্থ বন্টন করে দেবেন।

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে, সম্পদকে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা। তাকাফুল ব্যবস্থায় কেবল এর অংশগ্রহণকারীদের পোষ্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না বরং একই সাথে সমাজের অভাবী মানুষকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে থাকে। তাকাফুল প্রক্রিয়ার মধ্যে যাকাত কার্যকর করায় অর্থনীতির আরো উন্নতি ঘটে।

ইসলামের লক্ষ্য, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধে পরিবর্তন আনা এবং তা লালন করা। ফলে অর্থনৈতিক বিষয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। শুধু আইন প্রয়োগ করে এটা সম্ভব নয়। বরং এজন্য দরকার হয় স্বেচ্ছামূলক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাও। পারিবারিক তাকাফুল এমন এক অর্থ-সামাজিক পদ্ধতি যা ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে। রাসূল (সাঃ) মদিনায় হিযরতের পর মুহাজির ও আনসার-উভয়কেই উৎসাহ দিতেন সীমিতভাবে অংশীদারিত্বমূলক কাজ করতে। আবাদী জমির মালিক ছিলেন আনসারগণ। কোন স্বত্বাধিকার লাভ করা ছাড়াই মুহাজিররা যাতে তাদের ক্ষেতে চাষবাস করতে পারেন, সে জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন। পারিবারিক তাকাফুল এ ধরনের সীমিত অংশীদারিত্বের বিনিয়োগের পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে থাকে।

ইসলামী অর্থনৈতিতক ব্যবস্থার একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন। তার ঈমান বা বিশ্বাস, জীবন, ভবিষ্যত প্রভৃতি নিরাপদ করেই তা সম্ভব। এগুলো নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে তাকাফুল অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে জনগণের সেবা নিশ্চিত করে। বিশ্বাসীদের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর ইসলাম জোর দিয়েছে। রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন,

www.pathagar.com

"আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন যদি তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে সাহায্য করে থাকো।"

ইসলাম যে শোষণমুক্ত সমাজের কথা বলে, সেখানে পর্যাপ্ত পুঁজি গঠনের সুযোগ রয়েছে। ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ভিক্ষা করার অনুমতি দেননি। বরং উদ্বুদ্ধ করেছেন পুঁজি গঠনে। জনৈক দরিদ্র ব্যক্তিকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন, তার সব কিছু বিক্রি করে একটি কুড়াল কেনার জন্য। পারিবারিক তাকাফুল প্রত্যেক পরিবারের পুঁজি গঠনের পথ সুগম করে দেয়। তাছাড়া উদ্বৃত্ত তহবিল পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ করা হবে। এতে সম্পদের অধিকতর সদ্ব্যবহার করা সহজ হবে। সেই সাথে নিশ্চিত হবে আরো বেশি কর্মসংস্থান। ব্যক্তি, পরিবার ও সংগঠনের আর্থিক সহায়তা ও স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য পারিবারিক তাকাফুলের প্রবর্তন করা হয়েছে।

শেষ কথা (যদিও এর গুরুত্ব কম নয়), ইসলাম পরিবারের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়। কারণ ইসলাম মনে করে, পরিবার হলো সমাজের সর্বোত্তম একক যা মাতা-পিতা ও সন্তানদের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে। আমাদের অপরিকল্পিত ও খামখেয়ালী জীবনধারার দরুন পরিবার ধ্বংস হয়ে গেলে আমরা ভবিষ্যতের আশা-ভরসা হারিয়ে ফেলবো। ইসলামী জীবনবীমা পরিবারকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে।

উম্মাহ'র আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী জীবনবীমার প্রয়োজন ও চমৎকার ভূমিকা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত বহু ভুল ধারণা রয়েছে এ বিষয়ে। জ্ঞানী-গুণী, আলেম-ওলামা ও নীতি নির্ধারকগণ ইসলামী জীবনবীমার প্রচারে যথাসাধ্য প্রয়াস চালানোর এটাই উপযুক্ত সময়। সর্বপ্রথমে আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, ইসলামী জীবনবীমা পদ্ধতি আল্লাহ'র ইচ্ছাকে অতিক্রম করে যেতে চায় না। এই বীমার অর্থ এটা নয় যে, বীমাকৃত ব্যক্তি তার ভবিষ্যত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বীমাকারীর উপর আস্থা রাখছে। এটা বীমাকৃত ব্যক্তি ও তার পোষ্যদের কল্যাণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা মাত্র। অধিকন্তু, এমন চুক্তিতে রিবা, 'গারার', জুয়া কিংবা বাজি ধরার স্থান নেই। জীবনের নানা দুর্যোগের বিপক্ষে, ইয়াতিম, বিধবা, পোষ্য ও নিজের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য এই চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে।

নিরাপত্তার ধারণা ইসলামী মূলনীতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। কারণ জীবনের বাধা-বিপর্যয় ডিঙ্গাতে কঠিন সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে ইসলাম উম্মাহকে অনুপ্রেরণা যোগায়। এই প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের পার্থিব কষ্ট মোচন করবে, আল্লাহর তার পরকালের একটি কষ্ট লাঘব করে দেবেন। যেই অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাত, দু'টোতেই সাহায্য করবেন।" (মুসলিম)

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন, "তোমার সন্তানকে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষি দরিদ্র হিসেবে রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে সম্পদশালী রেখে যাওয়া উত্তম।" তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি একজন বিধবা ও একজন দরিদ্র মানুষের দেখাশোনা ও তাদের জন্য কাজ করে সে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুজাহিদ কিংবা দিনে রোযা রেখে রাতে ইবাদতকারীর মতো।" (বুখারী)

এসব তথ্যের ভিত্তিতে ফকিহ ও আলেমগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দায়িত্ব ভাগ করে নেয়া, যৌথ গ্যারান্টি ও একাত্মতা এসব উপাদান থাকলে জীবনবীমা শরীয়ার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। ১৯৭৯ সালে সর্বপ্রথম তাকাফুল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর মাত্র আড়াই দশকে বাংলাদেশসহ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামী জীবনবীমার দ্রুত প্রসার ঘটেছে। তাকাফুলের মূলনীতিসমূহ এবং উম্মাহর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকার বিষয়ে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা নিশ্চিতভাবেই এই শিল্পের অধিকতর প্রসারে সাহায্য করবে।

www.pathagar.com

তের.

বাংলাদেশে জীবনবীমা
কতিপয় মৌলিক সমস্যা ও সুপারিশ

জীবনবীমা শিল্পের মৌলিক সমস্যা সমূহকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ সমস্যা এবং বিশেষ সমস্যা। সাধারণ সমস্যাসমূহ সকল বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য কম-বেশি প্রযোজ্য। সাধারণভাবে বীমার ভোক্তা বা গ্রাহক, সম্ভাব্য গ্রাহক এবং বীমা শিল্পের সার্বিক কল্যাণ যে সমস্ত কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বা হতে পারে সেগুলিকে আমরা সাধারণ মৌলিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছি। বিশেষ সমস্যা হিসাবে আমরা সেই সব সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেছি যা বীমা শিল্পের অগ্রগতির সাথে সাথে উদ্ভব হয়েছে মূলত পূর্ব পরিকল্পনার অভাবে এবং অব্যবস্থাপনার কারণে। সাধারণ সমস্যা ও বিশেষ সমস্যার বিভাজন গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে করা হয়নি। উভয় প্রকার সমস্যা গুরুত্বের দিক থেকে একই পর্যায়ের।

মৌলিক সমস্যাসমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে জীবন বীমা শিল্পের বর্তমান অগ্রযাত্রাকে টেকসই ও অধিকতর গতিশীল করবার উপায় ও পদ্ধতি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। এই নিবন্ধে যে সব সুপারিশসমূহ পেশ করা হয়েছে তা কোন গবেষণালব্ধ অনুসিদ্ধান্ত নয়। বরং সমস্যাসমূহকে দূর করার উপায় হিসাবে সাধারণ পর্যবেক্ষক হিসেবে কতিপয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বীমা বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের আলোকে এইসব দিক নির্দেশনা সমূহকে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার পর তা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে খোলা-মেলা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জীবনবীমা শিল্পের সাধারণ সমস্যাসমূহকে আমরা কয়েক ভাগ করেছি যেমন :

ক) জীবনবীমার আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে নীতি-নির্ধারকদের উদাসীনতা বা অসাবধানতা।

খ) বীমা পেশাজীবীদের পেশাদারী মনোভাবের অভাব।

গ) বীমা নিয়ন্ত্রক দফতরের দুর্বলতা।

ঘ) পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া।

www.pathagar.com

জীবনবীমা শিল্পের বিশেষ সমস্যাসমূহকে আমরা চার ভাগ করেছি। এগুলো হচ্ছে :

ক) তাকাফুল বা ইসলামী বীমার সমস্যা,

খ) ক্ষুদ্র বীমার সমস্যা,

গ) এজেন্সি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ও ত্রুটি এবং

ঘ) গ্রাহকের বিভ্রান্তি ও জটিলতা।

ক. নীতি নির্ধারকদের উদাসীনতা

যে কোন শিল্পের অগ্রযাত্রা রাষ্ট্রীয় নীতি, পরিকল্পনা ও কৌশলের উপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা, চেতনা এবং গুরুত্বের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের বিষয়টি জড়িত। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জীবনবীমা শিল্পের অবদান যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হলে এ শিল্পের অগ্রযাত্রা অধিকতর সুগম হবে এ কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। জীবনবীমা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বৈশিষ্ট্য শুধু নয় বরং উন্নয়নের অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু এ উপলব্ধি আমাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। জীবনবীমা ব্যক্তি, পরিবার এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছলতা, স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য রক্ষায় অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

জীবনবীমা মূলত একটি সমাজ কল্যাণমূলক পদ্ধতি। জীবনবীমার প্রসার যত ঘটবে দু:স্থ ও অসহায় মানুষের জন্য সরকারের সাহায্য ও অনুদানের প্রয়োজন তত কম হবে। মানুষ যত বেশি জীবনবীমার দ্বারা আবৃত হবে, সরকার তার সীমিত রাষ্ট্রীয় তহবিল অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করতে সক্ষম হবে। জীবনবীমা প্রসারের ফলে জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ পুঁজি প্রবাহের সৃষ্টি করা সম্ভব। ফলশ্রুতিতে দেশ ও জাতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং বিদেশী ঋণের উপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব। বাংলাদেশের জাতীয় মোট উৎপাদনে (জিডিপি) জীবনবীমার অবদান ১/৪% মাত্র। অথচ পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশে তা ৫% থেকে ৭%। বাংলাদেশে জনপ্রতি জীবনবীমার প্রিমিয়াম গড়ে বার্ষিক মাত্র দু'শত টাকা কিন্তু জাপানে তা দু'লক্ষ টাকারও অধিক।

বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ গড়ে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ কোটি টাকা জীবনবীমার প্রিমিয়াম দিয়ে থাকে। পনের কোটি মানুষের দেশে এই প্রিমিয়াম অতি নগণ্য। প্রতিদিন যদি গড়ে প্রতিটি মানুষকে মাত্র দুই টাকা জীবনবীমা খাতে সঞ্চয়ের অভ্যাস করানো যায় তবে বাৎসরিক মোট জীবনবীমার প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াবে বর্তমানে দু'হাজার কোটি টাকার বিপরীতে ১১,০০০ কোটি টাকায়। জীবনবীমা কোম্পানী সমূহ সাধারণ মানুষের এই সব সঞ্চয়কে পুঞ্জিভূত করে পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হবে প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকা। মৃত্যু দাবি হিসেবে বছরে পরিশোধিত হবে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশের বর্তমানে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভারত বা শ্রীলংকার অনুরূপ জনপ্রতি

www.pathagar.com

প্রিমিয়ামের হার উন্নীত করা সম্ভব হলেই এই বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন করা সম্ভব।

জীবনবীমার আর্থ-সামাজিক অবদানের বিষয়টি অনুধাবন করে নীতি নির্ধারকদের উচিত এই শিল্পের অগ্রগতিতে উপযুক্ত নীতিমালা ও কৌশলসমূহ প্রণয়ন করা। জীবনবীমাকে উৎসাহিত করার জন্য গণ সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগে ব্যাপক প্রচার করা প্রয়োজন। জীবনবীমা কোম্পানী সমূহকে উৎসাহিত করার জন্য জীবনবীমা কোম্পানীর উপর আরোপিত কর্পোরেট ট্যাক্স যৌক্তিক পর্যায়ে আনা প্রয়োজন। প্রতিবেশী দেশ ভারতে সারচার্জসহ কর্পোরেট ট্যাক্স মাত্র ১৫% কিন্তু বাংলাদেশে তা ৪৫%। জীবনবীমা কোম্পানী সমূহকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে পুঁজি বাজারকে উৎসাহিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে আমরা মনে করি। পুঁজি বাজারে জীবনবীমার অবদানকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন; কিন্তু বাস্তবে জীবনবীমা কোম্পানীর ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ট্যাক্স রেয়াত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানী সমূহের জন্য ২০% এর অধিক লাভ ঘোষণাকারীদেরকে ১০% আয়কর রেয়াত দেয়া হয় কিন্তু জীবনবীমা কোম্পানীর জন্য অনুরূপ রেয়াত প্রত্যাহার করা হয়েছে।

জীবনবীমা মূলত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু এটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক। নীতিগতভাবে এটি একটি বড় ধরনের অসংগতি। কিন্তু প্রায় শতাব্দী ধরে বিষয়টি এভাবেই চলে আসছে। সরকারী আমলা বা আইন প্রণেতারা বীমা শিল্পকে গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলেই এ অসংগতি দূর করবার কোন প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে না। প্রতিবেশী দেশ সমূহসহ প্রায় সব দেশেই বীমা শিল্প অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত রয়েছে। বাংলাদেশে সেখানে এটি একটি অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম।

খ. পেশাদারী মনোভাবের অভাব

জীবনবীমাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবার মন-মানসিকতা আমাদের দেশের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে খুব কম লক্ষ্য করা যায়। এর একটি বড় কারণ বীমা সম্পর্কে বিশেষ করে জীবনবীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের নেতিবাচক ধারণা। জীবনবীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এবং শিক্ষিত মানুষের নেতিবাচক ধারণার প্রধান কারণ এ শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবীদের ব্যর্থতা। যে কোন পেশার সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় সেই পেশায় জড়িত পেশাজীবীদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার উপর। অধিকতর কমযোগ্য ব্যক্তিরা সাধারণত এই পেশার সাথে জড়িত হওয়ার কারণে জীবনবীমা পেশার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়নি। উপরন্তু বীমা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একশ্রেণীর বীমা প্রতিনিধিদের অসাধুতা ও প্রতারণা ভুক্তভোগী মানুষকে এই শিল্পের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদক্ষ ও অনৈতিক মানসম্পন্ন কর্মীদের দাপটে অপেক্ষাকৃত ভালোদের স্থান করে নেয়া এবং গুণগতমান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। জীবনবীমা শিল্পের গুরুত্ব ও

www.pathagar.com

তাৎপর্যের বিষয়টি লক্ষ্য করে এই পেশায় অধিকতর শিক্ষিত ও দক্ষ পেশাজীবী গঠনের কোন বিকল্প নেই এবং এ কারণেই প্রয়োজন ব্যাপক প্রশিক্ষণ। শিক্ষিত ও উপযুক্ত বীমা কর্মী নির্বাচন এবং তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই জীবনবীমার মাঠকর্মীদের নিয়োগ দেয়ার পূর্বে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন করে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এ পেশায় সম্পৃক্ত করার দায়িত্ব মূলত পেশাজীবীদের। যেহেতু এই পেশার মর্যাদা বৃদ্ধি করা জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন, সেহেতু প্রস্তাবিত নতুন বীমা আইনে প্রশিক্ষণকে বাধ্যতামূলক করার বিধান সংযোজন করা জরুরী।

জীবনবীমা শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন বীমা বিশেষজ্ঞ ও এ্যাকচুয়ারী। সমগ্র বাংলাদেশে হাতে গোনা ২/৩ জন মাত্র এ্যাকচুয়ারী এর মধ্যে পেশাদারী প্রতিষ্ঠান মাত্র দু'টি বা একটি। বীমা শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবীরা এদেশে এ্যাকচুয়ারী গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। প্রতিটি জীবনবীমা কোম্পানীতে এক বা একাধিক এ্যাকচুয়ারীর ছাত্রকে নিয়োগদান বাধ্যতামূলক করা না হলে বর্তমান বন্ধ্যাত্ব কাটানো সম্ভব নয়। প্রস্তাবিত নতুন বীমা আইনে এ বিষয়ে উপযুক্ত বিধি প্রণয়ন প্রয়োজন।

গ. বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের জনবলের অপর্যাপ্ততা

জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ ব্যাংকের মত জনগণের অর্থের জিম্মাদার হিসেবে কাজ করে থাকে। জীবনবীমার ক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে কোম্পানীর দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি করা হয়। চুক্তির মেয়াদ শেষে গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ অংগীকার মোতাবেক যেন জীবনবীমা কোম্পানী সমূহ ফেরত দিতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করবার লক্ষ্যেই বীমা নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধান অতীব জরুরি। বীমা অধিদপ্তর অভিজ্ঞ ও পর্যাপ্ত জনবলের প্রকট অভাব রয়েছে। ফলে জীবনবীমার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর যথার্থ নিয়ন্ত্রণ রাখা বীমা অধিদপ্তরের জন্য খুব কষ্টকর ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি কম গুরুত্বহীন ও অবহেলিত বিভাগ হিসেবে বীমা অধিদপ্তরের অবস্থান। বীমা পেশাজীবীদের মধ্যে হতে উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্ব-শাসিত বীমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা এখন সময়ের দাবি। গ্রাহক সাধারণের স্বার্থে এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে বর্তমান বীমা অধিদপ্তরের ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।

বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর লেভি ধার্য করে স্বায়ত্ব-শাসিত বীমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা হলে জীবনবীমা শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ অধিকতর টেকসই হবে বলে আশা করা যায়। স্বায়ত্ব-শাসিত স্বাধীন বীমা কর্তৃপক্ষের জনবলের বেতন কাঠামো ব্যক্তি মালিকানাধীন বীমা কোম্পানীসমূহের সমতুল্য বা কাছাকাছি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঘ. পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

জীবনবীমা শিল্পকে ফুলে, ফলে সুশোভিত করার জন্য ব্যবসায়িক পরিবেশ আরো স্বচ্ছ

www.pathagar.com

ও সহজ হওয়া প্রয়োজন। পরিবেশগত বাধা সমূহকে চিহ্নিত করে সংস্কারের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে জীবনবীমা খাতের অগ্রগতি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের জীবনবীমা কোম্পানী সমূহের মোট বিনিয়োগ প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে শতকরা ত্রিশ ভাগ সরকারী ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশের পুঁজিবাজার স্থিতিশীল না হওয়ার কারণে বীমা প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ তাদের বিনিয়োগ মূলত: ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে রেখে থাকেন। পুঁজি বাজারকে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে এ যাবত গৃহীত কার্যক্রম উৎসাহব্যঞ্জক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে। বিকল্প হিসেবে লিজ ফাইনান্সিং, হায়ার পার্চেজ ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হলে জীবনবীমার লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বীমা আইনে পরিবর্তনের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিধিকে বিস্তারিত করা প্রয়োজন।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে ঋণ গ্রহীতা বিশেষ করে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণগ্রহীতাগণ মৃত্যু বা অসুস্থ্যতাজনিত কারণে ঋণ পরিশোধে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন এবং ঋণ খেলাফিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গৃহ ও ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক জীবনবীমা ক্রয় বীমা বাজারকে যেমন সম্প্রসারিত করবে তেমনি ঋণ খেলাফির হার হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। ব্যাংকিং আইনে উপযোগী পরিবর্তন এ ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনবে।

বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে আমাদেরকে যেমন বাইরের জন্য দরজা খুলে দিতে হবে তেমনি আমাদেরও অন্যান্য দেশে বিনিয়োগের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে যৌথ উদ্যোগে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ইকুইটিতে অংশগ্রহণের ফলে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হব।

এ কারণে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান সমূহকে দেশের বাইরে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ দেয়া উচিত। গ্রেট ব্রিটেনের বীমা কোম্পানী সমূহের মোট প্রিমিয়াম আয়ের সিংহভাগ আসে দেশের বাইরে থেকে। ভারতের রাষ্ট্রীয় বীমা কোম্পানী প্রায় ত্রিশটি দেশে তাদের এজেন্সী, শাখা, সাব-সিডিয়ারী বা এসোসিয়েট কোম্পানীর সহায়তার ব্যবসা পরিচালনা করে প্রভূত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। এ সমস্ত উদাহরণ আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য। বাংলাদেশের যে সব কর্মজীবী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন বাংলাদেশী জীবনবীমা কোম্পানী সমূহের সেবা তাদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এটি করতে হলে জীবনবীমা কোম্পানী সমূহকে দেশের বাইরে বীমা সেবা বিতরণের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। বীমা কোম্পানী সমূহ যেন দেশের বাইরে শাখা, কোম্পানী বা সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে সে জন্য সংশ্লিষ্ট বিধি সংস্কার প্রয়োজন এবং দেশের বাইরের বিনিয়োগকেও উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

কেউ কেউ মনে করেন বর্তমানে বাংলাদেশের জীবনবীমা শিল্পে একটি ধীর বিষক্রিয়া কাজ করে যাচ্ছে। ধীর বিষক্রিয়ার ফলে শিল্পের প্রবৃদ্ধি বার্ষিক ২০% এর অধিক

www.pathagar.com

প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ মেয়াদী দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের দুই/একটি প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম আয়ের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত সংগ্রহ ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়, তামাদি পলিসির সংখ্যাধিক্য, দলবদ্ধভাবে এজেন্ট ও এমপ্লয়ার অফ এজেন্টদের ঘন ঘন কোম্পানী পরিবর্তন, দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের প্রকট অভাব, কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে ব্যর্থতা এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রতারণা ও শঠতার পৌণ:পুনিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের বীমা শিল্পকে ক্রম পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতির মৌলিক কারণ হিসেবে এক সাথে অনেকগুলি জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের বাজারে আগমনকে চিহ্নিত করা যায়। বিগত বছরসমূহে জাতীয় নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে একসাথে অনেকগুলি বীমা কোম্পানীর অনুমোদন দেয়ার যে অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা রোধ করা সম্ভব না হলে বীমা শিল্পে ব্যাপক অরাজকতা ও গহ্বরে পতিত হবার আশংকা থেকেই যাবে। একসাথে এক ডজন বা দুই ডজন কোম্পানী বাজারে প্রবেশ করলে কি ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা আমরা ইতোমধ্যে তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছি।

জীবনবীমা শিল্পের প্রধান চালিকা শক্তি মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও দক্ষ জন সম্পদ। রাতারাতি লক্ষ লক্ষ দক্ষকর্মী তৈরী করা সম্ভব নয়। এ কারণে প্রতিবছর সর্বাধিক কতগুলো জীবনবীমা কোম্পানীকে অনুমোদন দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে তার নীতিমালা প্রণীত হওয়া উচিত। এই নীতিমালার আলোকে প্রতিবছর এক বা একাধিক জীবনবীমা কোম্পানী বাজারে আসলে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবেনা বরং মুক্ত বাজার অর্থনীতির বিকাশে সহায়ক হবে।

এছাড়া কোম্পানী অনুমোদনের পূর্বে উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে কর্ম পরিকল্পনা ও সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যাচাই/বাছাই ও নিরীক্ষা করা উচিত। যোগ্যতাসম্পন্ন ও গুণগতমানসম্পন্ন বীমা প্রতিষ্ঠানের বাজারে ক্রম অন্তর্ভুক্তি বীমা শিল্পকে অগ্রগামী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিশেষ মৌলিক সমস্যা

বিশেষ সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানী সমূহের সমস্যাবলীকে। শুধু ইসলামী বীমার সমস্যা হলেও এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সমগ্র বীমা শিল্পে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে বীমা শিল্প ইসলামী জীবন দ্রুততর বিকাশের চালিকা শক্তি যেন হ্যামিলনের বংশী বাদকের কথা মনে করিয়ে দেয়। ইসলামী জীবনবীমার প্রতি উদ্যোক্তাগণ যেমনভাবে উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন তা ইসলামের জন্য যেমন এক আদর্শিক বিজয় হতে পারে, তেমনি তা ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধা সৃষ্টির এক উর্বর ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে পারে। ইসলামী বীমা সম্পর্কে পেশাজীবিদের, কর্মীবাহিনীর, বীমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের ও উদ্যোক্তাদের পরিপূর্ণ ধারণা না থাকার ফলে এর যথেচ্ছ ব্যবহার এবং

www.pathagar.com

অপব্যবহার হওয়ার সমূহ আশংকা বিদ্যমান। ইতোমধ্যে তিনটি ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানী সরকারী অনুমোদন পেয়েছে (এর মধ্যে একটি আদালতে বিচারাধীন)। কিন্তু অন্যদিকে প্রায় ১৪টি সনাতন জীবনবীমা কোম্পানী এক থেকে চার/পাঁচটি ইসলামী বীমার পরিকল্প বা প্রকল্প চালু করেছে এবং ৬০টি অধিক প্রস্তাবিত জীবনবীমা কোম্পানী ইসলামী বীমা কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য ইতোমধ্যে বীমা অধিদপ্তরে আবেদন করেছে। ইসলামী জীবনবীমার প্রতি সাধারণ গ্রাহকদের আগ্রহ এর প্রধান কারণ বলে প্রতীয়মান। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, ইসলামী জীবনবীমা প্রচলনের আইনগত কোন ভিত্তি বর্তমান বীমা আইনে নেই। এই অরাজক অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এবং ইসলামী বীমার রূপরেখা ও ধারণা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের জন্য অনতিবিলম্বে সরকারের উচিত হবে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে (বীমাবিদ, আইনবিদ, ফকিহ) উচ্চপর্যায়ের কমিটি ও টাস্কফোর্স গঠন করা। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে (মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যে) ইসলামী বীমার অগ্রগতি, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিসমূহ পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের জন্য একটি উপযোগী আইন এবং কর্ম প্রণালী নির্ণয় করা হবে বিশেষজ্ঞদের কাজ।

ইসলাম একটি মহৎ আদর্শের নাম। ইসলামী চিন্তা, চেতনা এবং মূল্যবোধকে যদি সঠিকভাবে উপলব্ধি করে এর যথার্থ প্রয়োগ করা যায়, তবে তা হবে বিশ্ব মানবতার জন্য একটি সুন্দরতম উদাহরণ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ইসলাম সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা না করেই আমরা আবেগতাড়িত হই কিংবা ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে থাকি। বর্তমানে ইসলামকে বিতর্কিত করা যে প্রবণতা সমগ্র বিশ্বে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার প্রধান কারণ আমরা নিজেরা, যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান আহরণ না করেই আমরা বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ ঘটাতে চাচ্ছি, কিংবা এর অপব্যাখ্যা করে নিজেদেরকে কলংকিত করছি। ইসলামকে হেনস্থা করবার কোন অধিকার আমাদের নেই। নিজেদেরকে ইহকাল ও পরকালে অপদস্থ, অপমানিত ও ঘৃণিত হবার পথ রুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন সকলের পক্ষপাতহীন সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

সনাতন বীমা ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইসলামী জীবনবীমা বা তাকাফুল ব্যবস্থার যে নব সংযোজন করা হয়েছে তাকে সঠিকভাবে বিকশিত ও প্রবাহিত করতে পারলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা যায়। কারণ এর ফলে লক্ষ লক্ষ/কোটি কোটি মুসলমানদেরকে জীবনবীমার আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং এর ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা সামগ্রিকভাবে সবাই উপকৃত হবে। ইসলামী জীবনবীমা মূলত: মিউচিয়াল ইনসিওরেন্স এর ধ্যান ধারণার সাথে সাযুয্যপূর্ণ। মিউচিয়াল ইনসিওরেন্সে গ্রাহক স্বার্থ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। পারস্পরিক সুবিধার জন্য যৌথ সহযোগিতার ভিত্তিতে ইসলামী বীমার ধ্যান ধারণাকে আরো গণমুখী ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা করা সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং পর্যাপ্ত গবেষণা। বাংলাদেশের মানুষের আবেগকে যৌক্তিক মানদণ্ডে উন্নীত করার জন্য ইসলামী

www.pathagar.com

বীমার প্রবর্তক ও উদ্যোক্তা গোষ্ঠী যদি সম্মিলিতভাবে একটি গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তবে ইসলামী জীবনবীমার সম্ভাব্য বাজার হবে উজ্জ্বলতর থেকে উজ্জ্বলতম। এর ফলে পুঁজি বাজার হবে সমৃদ্ধ, শিল্পায়ন হবে দ্রুত জীবনবীমার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা দ্রুততর ও সঠিক লক্ষ্যে চালানো সহজ হবে।

ক্ষুদ্র বীমার সমস্যা

পরীক্ষামূলকভাবে ডেল্টা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী একটি প্রকল্প হিসেবে গ্রামীণ বীমা চালু করবার পর বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বীমা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মাসিক ভিত্তিতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহের মাধ্যমে জীবনবীমাকে সাধারণ মানুষের দোর গোড়ায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানী আমেরিকান লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী এবং রাষ্ট্রীয় খাতে জীবনবীমা কর্পোরেশন ব্যতীত সকল জীবনবীমা কোম্পানী এক বা একাধিক ক্ষুদ্র বীমার প্রকল্প চালু করেছে। মাসভিত্তিক স্বল্প অংকের প্রিমিয়াম হওয়ার কারণে এই প্রকল্পগুলোর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে।

বীমা কোম্পানীসমূহ ক্ষুদ্র বীমা প্রকল্পের প্রিমিয়াম সংগ্রহের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত এজেন্ট নিয়োগ না করে কালেক্টর নিয়োগ করেছে, এবং সুপারভাইজারী এজেন্ট নিয়োগ না করে বেতনভুক্ত (বাস্তবে যদিও প্রিমিয়াম আয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ) কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে। বীমা আইনে সর্বাধিক কমিশন এদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হচ্ছে না। লাইসেন্স না নেয়ার ফলে বীমা অধিদপ্তরের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকছে না এইসব বীমা বিক্রেতাদের উপর এবং সরকার রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রথম বর্ষ ও নবায়ন প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে কমিশনের যে তারতম্য বর্তমান আইনে রয়েছে ক্ষুদ্র বীমার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ না থাকলে দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প সমূহের ব্যয়ভার কোম্পানীর দায়ের তুলনায় অনেক বেশী হবার আশংকা থাকছে। ক্ষুদ্র বীমার ব্যবস্থাপনা ব্যয় নিয়ন্ত্রণে না রাখা হলে গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ বীমা গ্রাহকের মেয়াদ পূর্তি দায় মেটানো দু:সাধ্য বা অসাধ্য হবার আশংকা রয়েছে। যদি বাস্তবে একটি মাত্র বীমা কোম্পানীর ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটে তবে তার প্রভাব পড়বে সমগ্র বীমা শিল্পে। এহেন অনভিপ্রেত অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য ক্ষুদ্র বীমার আয়-ব্যয় সমূহের উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র বীমার প্রতিনিধিদের জন্য স্বল্প ফি ধার্য করে, লাইসেন্স প্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং দলিলের বিকল্প হিসাবে পাস-বইয়ের পাশাপাশি বার্ষিক জমার বিবরণী পেশ করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র বীমার গ্রাহকরা যদি কোন কারণে প্রতারিত হন তবে গ্রাম বাংলার সরল-সহজ মানুষরা শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং বীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের নেতিবাচক ধারণা আরো ঘনীভূত হবে।

www.pathagar.com

এজেন্সি ব্যবস্থাপনার জটিলতা

আমরা সবাই জানি জীবনবীমা সাধারণত কেউ কিনতে আগ্রহী হন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে কেউ উদ্বুদ্ধ করে। উদ্বুদ্ধকরণের এই কাজটি খুব সহজ নয়। জীবনবীমা ক্রয় না করার পেছনে সম্ভাব্য গ্রাহকদের নানা রকম অজুহাত বা যুক্তি থাকে। সম্ভাব্য গ্রাহকদের সকল যুক্তিকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করবার পর বীমার একজন মাঠ কর্মী বা প্রতিনিধি নিজের যুক্তি উপস্থাপন করেন এমনভাবে যেন গ্রাহক তার সকল প্রশ্নের বা অজুহাতের একটি সন্তোষজনক জবাব বা সমাধান পেয়ে যান। বাংলাদেশে জীবনবীমার মাঠকর্মী হিসেবে কম-বেশী আনুমানিক দশ লক্ষ মানুষ নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। এদের মধ্যে লাইসেন্সপ্রাপ্তদের সংখ্যা অর্ধেক বা অর্ধেকের কম।

বীমা আইন অনুসারে লাইসেন্স বিহীন কোন বীমা প্রতিনিধি বীমা বিক্রয় করতে পারবেনা। কিন্তু বাস্তবতার কারণে বীমা কোম্পানীসমূহ বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের বীমা কোম্পানীগুলো বীমা প্রতিনিধিদের নিয়োগকারী হিসেবে (Employer of Agents) যাদের কাজ করবার অনুমতি দিয়ে থাকে তাদের অধিকাংশের পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু আইনে রয়েছে বীমা প্রতিনিধি হিসাবে পাঁচ বছর অভিজ্ঞতা থাকলেই নিয়োগকারী হিসেবে লাইসেন্স পাবার যোগ্যতা অর্জন করে। রাতারাতি এক ডজন কোম্পানীর জন্য লক্ষ লক্ষ পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বীমা প্রতিনিধি পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু বিগত এক দশকেও আইনের এই বিধান পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। বাস্তবতার কারণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কিংবা নামমাত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের Employer of Agents হিসেবে (লাইসেন্স বিহীন) নিয়োগ দেয়া হয়। অতএব, আইনের পরিবর্তন অপরিহার্য। কিন্তু বিষয়টি অবহেলিত। বর্তমান বিধানে এমপ্লয়ার অফ এজেন্টদের ধাপ কয়টি হবে এর যেমন সীমা রেখা নেই। তেমনি উপরের দশ, এগারো, বারো ধাপ পর্যন্ত কথিত নিয়োগকারী প্রতিনিধিদের কমিশন (overriding commission) কত হবে তাও বর্তমানে বীমা আইনে স্পষ্ট নয়। প্রথম বর্ষ প্রিমিয়ামের ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের যে সীমারেখা নির্ধারিত আছে তাও বীমা কোম্পানী সমূহ অতিক্রম করে থাকে এবং এর জন্য বিধি অনুসারে প্রায় প্রতিবছর জরিমানা দিয়ে থাকে। একসাথে অনেক কোম্পানী সমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যয় প্রথম বর্ষ প্রিমিয়ামের ১১৫% থেকে ১২০% পর্যন্ত হয়ে থাকে। অন্যদিকে পলিসি তামাদির পরিমাণ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। উপরন্তু বর্তমানে মাঠ কর্মীরা দল বেঁধে এক কোম্পানী থেকে অন্য কোম্পানীতে যোগদান করার সাথে সাথে পূর্বের কোম্পানীর অনেক গ্রাহককে প্রতারণার মাধ্যমে নতুন কোম্পানীতে নিয়ে গিয়ে নতুনভাবে পলিসি ইস্যু করছে। গ্রাহকদের দলবদল (migration) ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বীমা কোম্পানী সমূহ এবং জীবনবীমা শিল্প। তামাদির পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পাবার এটি একটি প্রধান কারণ। বাজারে এই অসুস্থ ও অনৈতিক প্রতিযোগিতা দীর্ঘ

www.pathagar.com

মেয়াদে জীবনবীমা শিল্পকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দেবে, অধিকাংশ পেশাজীবী এ আশংকা প্রকাশ করলেও বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করে সমাধানের পথ বের করতে তারা আগ্রহী নন। এটি এক ধরনের আত্মপ্রতারণা ও আত্মঘাতি মানসিকতা।

এজেন্সি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আর একটি বড় সমস্যা হচ্ছে যে এখানে ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতিমালা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। অধিকাংশ এমপ্লয়ার অফ এজেন্ট লাইসেন্স বিহীন হিসেবে কাজ করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য অনেক অর্থ (ব্যবসা উন্নয়নের তাগিদে) অগ্রিম হিসেবে প্রদান করে থাকে। প্রায় ক্ষেত্রে অগ্রিম টাকা পরিশোধ না করে তারা অন্য কোম্পানীতে যোগদান করে। এসব টাকা প্রায় অনাদায়ী থেকে যায়। আবার এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে যাবার পর তাদের উচ্চতর পদ-মর্যাদা ও অধিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। মাঠ কর্মীদের (এমপ্লয়ার এজেন্টদের) নৈতিক মান ও যোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনা না করে কে অন্য কোম্পানীর কর্মী ও পলিসি থেকে কত ছিল তাই বা জমা করতে পারবে সে বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। কোম্পানী পরিবর্তনের এই অবারিত সুযোগ থাকার ফলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, যখন কোন মাঠ কর্মীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক বা আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকেন তখনই তারা গ্রাহকদের নিকট থেকে সংগৃহীত পলিসি/প্রিমিয়াম দেয়া বন্ধ করে দেন এবং বাজারের অন্য সব বীমা কোম্পানী সমূহের সাথে দর কষাকষি করতে থাকেন। কোন জীবনবীমা কোম্পানী ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে উচু পদ-মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা দিবে তা নিয়ে। এসব দর কষাকষির ফলে পূর্বোক্ত নিয়োগকারীর অভিযোগ প্রমাণ করা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অকার্যকর হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ কোম্পানীর অর্থ ব্যয় হয়। কয়েকদিনের জন্য কেউ কেউ জেল-হাজতে থাকেন, কিন্তু এসব কোন কিছুই অভিযুক্তের পেশাগত জীবনে কোন প্রভাব ফেলে না। অনেক ক্ষেত্রেই তারা তাদের সমমানের, সম অভিজ্ঞতার পেশাজীবীদের নিকট থেকে এ ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপের নৈতিক সমর্থন পেয়ে থাকেন। "মানিকে মানিক চিনে" বিধায় তাদের আদর-আপ্যায়নের বা নিয়োগের কোন অভাব হয় না। এ ধরনের অসহায় পরিস্থিতি শুধুমাত্র মাঠ-কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে হয়ে থাকে না নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে ডেস্ক কর্মকর্তাদের যোগ-সাজসে এবং আশ্রয়ে মাঠ কর্মীরা নানা ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা সুবিধা প্রাপ্ত হন। উর্ধ্বতন কর্মীদের দ্বারা নিম্নস্তরের কর্মীদের কমিশন না প্রদানের অবিযোগ প্রায়শ:ই পাওয়া যায়। এলাকা বন্টনে স্বজন-প্রীতি, সংযুক্তি-বিযুক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারো ক্ষতি, কারো লাভ, মধ্যস্তরের এক বা একাধিক শূন্য পদের বিপরীতে কমিশন প্রাপ্তি কিংবা বেনামী এজেন্ট সৃষ্টির মাধ্যমে সুবিধা প্রাপ্তিতে ডেস্ক কর্মকর্তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। এজেন্সী ব্যবস্থাপনায় এসব প্রবণতা বর্তমানে এত বেশী প্রচলিত যে এগুলিকে এখন আর কেউ অনিয়ম মনে করেন না।

www.pathagar.com

এসব ঘটনায় কেউ আর বিস্মিত হন না বা এসব প্রবণতা দূর করবার জন্য কোন আগ্রহ বোধ করেন না। এর প্রধান কারণ এই যে এককভাবে এসব অনিয়ম দূর করা সম্ভব নয়। সুষ্ঠু নীতিমালার আলোকে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় Code of Conduct প্রণয়নের মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধান সম্ভব। কিন্তু Code of Conduct মেনে চলার ক্ষেত্রে বীমা নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত না করা হলে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব না হলে শুধু আচরণগত নীতিমালা প্রণয়ন করে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

ঘ. গ্রাহকের বিভ্রান্তি ও জটিলতা

যে কোন শিল্পের বিকাশের জন্য গ্রাহকের চাহিদা হচ্ছে মৌলিক চালিকাশক্তি। সে কারণে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রাহকের আস্থা অর্জন অত্যন্ত জরুরি। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশের জীবনবীমা শিল্পে সোনালী সূর্যের নতুন আলো দেখা দিয়েছে। জীবনবীমার প্রভূত সম্ভাবনা বিদ্যমান আর তাই বিকাশমান এই শিল্পের মৌলিক সমস্যাসমূহকে দূর করবার এখনই প্রকৃত সময়। এ কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সব ভ্রান্তি, বিভ্রান্তি ও নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে তা দূর করা প্রয়োজন।

এমন কোন পরিবার নেই এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যাদের জীবনবীমার প্রয়োজন নেই। মূলত: জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ব্যক্তির জীবনবীমার প্রয়োজন। কিন্তু তার পরেও অধিকাংশ মানুষ জীবনবীমা ক্রয় করেন না। শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষ জীবনবীমার গ্রাহক নন। যেসব কারণে সাধারণ মানুষ বীমা ক্রয় করতে আগ্রহী নন, তার অনেকগুলি মনস্তাত্ত্বিক এবং কিছু পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ফলে সৃষ্ট। মৃত্যু, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, বার্ধক্য জীবনের এক চরম বাস্তবতা, ক্ষুধার তাড়নায় মানুষকে জীবীকা গ্রহণ করতে হয়। সেই সাথে তাদেরকে জীবনের মৌলিক চাহিদাসমূহ মেটাতে হয়। এসব মৌলিক চাহিদার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মৃত্যু, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও বার্ধক্যের কারণে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা আমাদের মোকাবেলা করতে হয়। জীবনের এইসব বাস্তবতা আমাদের সাজানো স্বপ্নকে এলোমেলো করে দিতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এসব নিয়ে আমরা খুব কম চিন্তা করতে আগ্রহী হই। আমরা নিজেদের প্রয়োজনে বীমা ক্রয় করতে আগ্রহী হই না কারণ বিষয়টি আমাদের নিকট সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয় না।

জীবনের অসহায়ত্ব মোকাবেলার ক্ষেত্রেও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার তাগিদে জীবনবীমা ব্যবস্থার অপরিহার্যতা সাধারণ মানুষের নিকট পরিষ্কার নয়। একইভাবে জীবনবীমার প্রতি মানুষের রয়েছে অনীহা নানা কারণে। যেমন-

www.pathagar.com

ক) দারিদ্র্য

খ) অনেক বেশী আনুষ্ঠানিকতা

গ) বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনাস্থা

ঘ) দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত গরীব। তাদের সঞ্চয়ের পরামর্শ না দিয়ে ঋণের প্রস্তাব দিলে তারা আকৃষ্ট হয় বেশী। অনেক ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ঋণ দরিদ্র মানুষের দরিদ্রতা বাড়াতে সাহায্য করে এটি প্রমাণিত সত্য। কিন্তু তার পরেও নগদ অর্থ প্রাপ্তির আকর্ষণ অনেক বেশী। ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। বর্তমানে মাসে ৪০/৫০ টাকা সঞ্চয় করেও বীমা সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব। যারা ঋণ গ্রহণ করছেন, তাদের ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্যও মৃত্যু, দুর্ঘটনা কিংবা অসুস্থতা ঝুঁকির বিপরীতে জীবনবীমা আরো বেশী প্রয়োজন।

বাধ্যতামূলক নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাস আমাদের অনেকের নেই। ফলে নিয়ম মাফিক নিয়মিত কিস্তির টাকা দেয়া অনেকে বিড়ম্বনা মনে করেন। ব্যাংকের মত প্রয়োজনেটাকা ওঠানো যায়না বা কিস্তি দেয়া বন্ধ করলে পলিসি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকার কারণেও অনেকে বীমার প্রতি অনাগ্রহী। ডাক্তারি পরীক্ষাকে অনেকে ঝামেলা মনে করেন। এসব ক্ষেত্রে "সাধারণ সঞ্চয়" ও "ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক নিরাপত্তা" নিশ্চিত করার তুলনামূলক সুবিধা/অসুবিধাসমূহ সঠিকভাবে না জানার ফলে মানুষ বিষয়টি বুঝতে পারেনা। জীবনবীমা মূলত: সম্পত্তি ক্রয়ের মত; যেখানে সম্পদের মালিকানা প্রথম কিস্তির টাকা জমা দেয়ার সাথে সাথেই সৃষ্টি হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পরে কিংবা ঝুঁকির বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যই তা ব্যবহার করা যায়। এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য ঝুঁকি নিরসন। বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের নিকট খুব পরিষ্কার নয় বলেই তারা জীবনবীমার প্রতি আগ্রহী হন না।

বীমা প্রতিষ্ঠানকে অনেকে বিশ্বাস করেন না। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে "হায়, হায় কোম্পানীর" শিকার অনেকে হয়েছেন। বীমা প্রতিষ্ঠানের অসৎ কর্মীর কারণেও কেউ কেউ প্রতারিত হয়ে থাকতে পারেন।

জীবনবীমা কোম্পানী সমূহ মৃত্যু দাবি পূরণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের ভুল ধারণাসমূহ দূর করার ব্যাপারে অনেকটা উদ্যোগী হয়েছে। এ ব্যাপারে আরো বেশি তৎপর হলে মানুষের ভুল ধারণা দূর করা সম্ভব। বীমা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়েছে বাংলাদেশে এমন নজীর নেই। বিধায় "হায় হায়" কোম্পানীর ধারণাটি অমূলক তা মানুষের নিকট তুলে ধরা প্রয়োজন। বীমার সুবিধা দুই, তিন চার বা পাঁচ কিস্তিতে প্রদানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানীসমূহ দীর্ঘমেয়াদ পর্যন্ত বীমার টাকা না পাওয়ার অভিযোগ নিরসনের চেষ্টা করে কিছুটা সফল হয়েছে। লক্ষ্য করা যায় যে, অধিকাংশ

www.pathagar.com

ক্রেতা এ ধরনের পলিসি ক্রয় করতে আগ্রহী হচ্ছেন। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ তাওয়াককুল পরিপন্থী, সুদের সংমিশ্রণ, জুয়ার নামান্তর ইত্যাদির অজুহাতে যারা জীবনবীমা থেকে দূরে ছিলেন বা আছেন তাদের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য "তাকাফুল" বা ইসলামী বীমার উদ্ভব হয়েছে। এর ফলে বীমা বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো হবে।

সর্বশেষ, কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জীবনবীমা মুলত: সেবামূলক এবং জনকল্যাণমুখী একটি ব্যবস্থা। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বীমা পেশাকে যদি এ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করা হয় এবং গ্রাহক সেবার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয় তবে বাংলাদেশে জীবনবীমা শিল্প সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে একটি নীরব বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম। জীবনবীমা শিল্পের সাথে জড়িত সবাই এ বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম বলে আমরা আশা করব।

www.pathagar.com

চৌদ্দ.

ইসলামী বীমা-এক নবদিগন্তের সূচনা

ইসলামী অর্থব্যবস্থা এখন মুসলিম বিশ্বের ব্যবসায়িক সংস্কৃতির একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বীমা (তাকাফুল) অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিকশিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র বিকাশমান শিল্প হিসেবে বিবেচিত এই খাতটি এখন বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার একটি গতিশীল অংশে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছরই নতুন নতুন ইসলামী আর্থিক সেবা ও পদ্ধতি প্রবর্তিত হচ্ছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার অংশ হিসেবে ইসলামী বীমা মুসলিম উম্মাহ'র প্রয়োজন পূরণে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ইসলামী বীমা একদিকে ইসলামী দেশগুলোর নিজস্ব বাজারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, সেইসাথে বাজার অর্থব্যবস্থায় গতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা সৃষ্টি করায় মুসলিম দুনিয়ার বাইরেও এটি বেশ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। ইসলামী বীমার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আগ্রহে মাত্র ত্রিশ বছরের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত সময়কালে এই শিল্পটির সাফল্যই প্রতিফলিত হচ্ছে। বস্তুত, স্টেইকহোল্ডারদের আর্থিক মূল্য সংযোজন করায় এবং ক্ষতিকর ফটকাবাজি হতে মুক্ত থাকার কারণে আন্তর্জাতিকভাবে শরীয়াহ নীতিমালা ক্রমবর্ধমান হারে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে।

শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পণ্যের ব্যাপার ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পুনঃবীমা, ব্রোকিং, আইনজীবী, সালিসনিষ্পত্তিকারী, রেটিং এজেন্সি, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সহ বীমা বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেবা পণ্যরাজি অনুমোদনের লক্ষ্যে অনেক অমুসলিম দেশের বীমা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাদের বিধিব্যবস্থায় সংশোধনী এনেছে। এতে তাকাফুল এবং সেইসাথে ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভূমিকা বিশ্বব্যাপী জোরদার হয়েছে।

ইসলামী বীমার গ্রহণযোগ্যতা

ইসলামী আইনজ্ঞদের মতে, প্রচলিত বীমা ইসলামী আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই, বীমার বিকল্প মডেল হিসেবে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র তাকাফুল ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। এটা অত্যন্ত কঠিন বাস্তবতা যে, বিশ্বের ১৫০ কোটি মুসলমানের সম্পত্তি ও জীবনের নিরাপত্তার তীব্র প্রয়োজন মেটানোর কাজটি প্রচলিত বীমা করতে পারেনা কিন্তু তাকাফুল পারস্পরিক সহায়তা ভিত্তিক

www.pathagar.com

একটি আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা পলিসিহোল্ডারদের যৌথ ঝুঁকি বহনের মাধ্যমে তা করে থাকে। শরীয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা অনুমোদনযোগ্য।

মুসলমানদের জীবন শরীয়ার বিধি-বিধান অনুসারে পরিচালিত হতে হয়। শরীয়ার আইন এসেছে পবিত্র কুরআন ও মহানবীর (সা.) নিকট থেকে। পবিত্র কুরআন হলো সকল ইসলামী নীতির চূড়ান্ত উৎস এবং মহানবীর (সা.) কথা ও কাজ এর পরিপূরক। ফিকাহ-আল-মুয়ামালাতও ইসলামী শরীয়ার উৎস যা শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক লেনদেনের পদ্ধতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে থাকে। শরীয়ার মৌলিক নীতিমালা হলো একজনকে অন্যদের শোষণ থেকে রক্ষা করা। অন্যভাবে বলা যায়, শরীয়ার মৌলিক নীতিমালা হলো কেউ যাতে অন্যদের শোষণের শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করা।

ইসলামী শরীয়ায় তিন ধরনের আর্থিক লেনদেন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এগুলো হলো সুদ (রিবা), জুয়া (মাইসির) ও প্রতারণা (ঘারার)।এছাড়াও শুকর, জুয়া, পর্ণোগ্রাফি ইত্যাদির মতো নিষিদ্ধ (হারাম) বিষয়ে বিনিয়োগ শরীয়াহ নিষিদ্ধ করেছে। শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করা সাপেক্ষে পারস্পরিক সমঝোতামূলক বীমা (মিউচুয়াল ইন্স্যুরেন্স) ও সামাজিক বীমা (সোস্যাল ইন্স্যুরেন্স) ইসলামে অনুমোদনযোগ্য। শরীয়াহ নির্ধারিত পন্থায় পরিচালিত জীবনবীমাও (ফ্যামিলি তাকাফুল বা পারিবারিক বীমা) অনুমোদনযোগ্য।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় তাকাফুল কর্মপদ্ধতি

তাকাফুল শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বীমাব্যবস্থা, যাতে পলিসিহোল্ডারদের তহবিল আলাদা রাখা হয়। এটা পারস্পরিক সহযোগিতা (তায়ুন) ও স্বেচ্ছাদান (তাবাররু) ভিত্তিক যাতে নৌ, অগ্নি, জীবন, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মতো কোনো তাকাফুল স্কিমের ঝুঁকি যা অংশগ্রহণকারী একদল লোক সম্মিলিতভাবে ও স্বেচ্ছায় ভাগাভাগি করে নেয়। উক্ত তাকাফুল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকল লেনদেন স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হওয়ায় এতে কোনো ধরনের প্রতারণা বা জুয়ার অবকাশ থাকে না।

বর্তমানে অধিকাংশ তাকাফুল প্রতিষ্ঠান জয়েন্ট স্টক কোম্পানি। তাকাফুল কোম্পানিগুলো অনেকাংশেই প্রচলিত পারস্পরিক (মিউচুয়াল) বীমার মতোই। তবে প্রধান পার্থক্য হলো তাকাফুল কোম্পানিতে শরীয়াহ তত্ত্বাবধান বোর্ড থাকা বাধ্যতামূলক। তাকাফুল কোম্পনি ঋণের ওপর সুদ নিতে বা ধার্য করতে পারে না এবং অবশ্যই শরীয়ার অনুমোদিত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। তাকাফুল কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে পলিসিহোল্ডারদের তহবিল থেকে শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল পৃথক করা একটি অপরিহার্য শর্ত।

www.pathagar.com

তাকাফুল কার্যক্রমের অন্তত চারটি মডেল রয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

১. **মুদারাবা** : পলিসিহোল্ডার ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন পদ্ধতি।

২. **ওয়াকালা** : বীমা প্রতিষ্ঠান পলিসিহোল্ডারদের চাঁদা (প্রিমিয়াম) থেকে পূর্বনির্ধারিত ফি কেটে নেয় এবং লাভের কোনো অংশ পায় না।

৩. **ওয়াকালা ওয়াকফ** : ওয়াকালার মতো এখানেও বীমা প্রতিষ্ঠান ফি নেয়, তবে ওয়াক্ফ তহবিল সৃষ্টির জন্য শেয়ারহোল্ডারগণ স্বেচ্ছায় দান করে থাকেন।

৪. **ওয়াকালা ও মুদারাবার মিশ্রণ** : আন্ডাররাইটিংয়ের জন্য ফি নেয়া হয় এবং বিনিয়োগের লাভ শেয়ারহোল্ডার ও পলিসিহোল্ডাররা ভাগাভাগি করে নেয়।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। আর একারণেই তাকাফুল কোম্পানিগুলোর জন্য একাধিক মডেল রয়েছে। শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণ সাধারণভাবে কোনো গ্রহণযোগ্য তাকাফুল ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট কিছু মৌলিক উপাদানের ব্যাপারে একমত হন। মৌলিক ধর্মীয় বিধিবিধানের লঙ্ঘন না ঘটা পর্যন্ত এসব পার্থক্য গ্রহণযোগ্য।

তাকাফুল মূলত উম্মাহ'র কল্যাণের জন্য সহযোগিতামূলক ঝুঁকি-বণ্টনমূলক কার্যক্রম। এই ব্যবস্থায় শুধু লাভ করাই উদ্দেশ্য থাকে না, বরং একজনের বোঝা অন্যজনের বহন করার ইসলামী নীতিমালা সমুন্নত রাখা হয়। অর্থাৎ তাকাফুল পারস্পরিক সহযোগিতা, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাকাফুল ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীরা (পলিসিহোল্ডারগণ) আকস্মিক ঝুঁকি ও বিপদ মোকাবেলায় একে অন্যকে সহযোগিতা ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকে।

আন্ডাররাইটিং ও এ্যাকচুয়ারিয়াল পদ্ধতিগুলো প্রচলিত বীমার মতোই হয়ে থাকে। তাকাফুল প্রতিষ্ঠানগুলো সম্ভাব্য লোকসানের ঝুঁকি নির্ধারণ করে এবং সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের জন্য উক্ত গ্রুপের ওপর যথাযথ মাত্রায় চাঁদা (প্রিমিয়াম) ধার্য করে। অবশ্য, প্রচলিত জীবন বীমা কোম্পানির পলিসিহোল্ডারদের প্রদত্ত ঝুঁকিভিত্তিক প্রিমিয়ামের বিপরীতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিমালা অনুযায়ী অনুদান তহবিলে অর্থ প্রদান করে।

সংহতির নীতিমালার ভিত্তিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ তহবিল সংরক্ষণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তহবিল সংগ্রহ করা হয় যাতে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং আরো বিকাশে সহায়তা করা যায়। অনুরূপভাবে, প্রতিষ্ঠান যে ফি বা লাভ পায় তা ব্যবস্থাপনাগত ও মূলধন জাতীয় ব্যয় (ক্যাপিটাল কস্ট) সংকুলানের জন্য পর্যাপ্ত হতে হবে। কোম্পানি আর্থিক সঙ্কটে পড়লে, শেয়ারহোল্ডারগণ সুদমুক্ত ঋণ (কর্জে হাসানা) দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এর মাধ্যমে তারা অংশগ্রহণকারীদের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকে।

www.pathagar.com

উদ্বৃত্ত বণ্টন কাঠামো এমন সতর্ক ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনার দ্বারা করা হয় যাতে পলিসিহোল্ডার বা তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের কেউই অন্য পক্ষের স্বার্থহানি করে অতিরিক্ত লাভবান হতে না পারে। অবশ্য, আন্ডাররাইটিং ফলাফলে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং ঝুঁকি তহবিলের আকার সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে আপদ কালিন তহবিল গঠন একটি কাঙ্ক্ষিত বিষয়। তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের জন্য দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত তহবিল কোম্পানির মূলধন ও উদ্বৃত্তের অংশ হিসেবেই বিবেচিত হয়।

তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ নীতি অনুযায়ী পরিচালনা শুধু কোম্পানির কার্যক্রমগত কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিনিয়োগ নীতিও এর অন্তর্ভূক্ত। তাকাফুল প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সুদভিত্তিক বিনিয়োগ এড়িয়ে যেতে হবে। এর বদলে তারা 'সুকুক' কিংবা ইসলামী বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারে, যাতে কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্প থেকে লভ্যাংশ আকারে আয় করতে পারে। 'সুকুক' হলো সম্পদ সমর্থিত, বিনিময়যোগ্য, ট্রাস্ট সার্টিফিকেট যা অন্তর্নিহিত সম্পদ বন্ডের ধারকভিত্তিক। অনেক ইসলামী দেশে পুঁজিবাজারগুলো কাজ করতে শুরু করেছে এবং শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পণ্যরাজি বাজারে সহজলভ্য হওয়ায় বর্তমানে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি ঘটেছে।

তাকাফুল বাজার

প্রচলিত বীমা বাজারের তুলনায় তাকাফুল বাজার এখনো অনেক ছোট। অবশ্য, এটা দ্রুতগতিতে বিকশিত হচ্ছে এবং অনেক ভৌগলিক অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাকাফুলের সাফল্যের বেশ কিছু অপরিহার্য উপাদান শনাক্ত করা গেছে। বিভিন্ন বাজারের চাহিদা ও প্রত্যাশার মধ্যে পার্থক্য থাকায় মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলোর মধ্যে সাফল্যের হারে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, এগুলোর মধ্যে কতিপয় বিষয় অভিন্ন এবং সফলতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় :

১. সচেতনতা সৃষ্টি : তাকাফুল কার্যক্রম সম্পর্কে মানুষকে অবগত করানোর জন্য প্রচারকাজে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

২. দক্ষতা বৃদ্ধি : তাকাফুল প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগদান ও ধরে রাখা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩. বিস্তৃত বিতরণ পদ্ধতি : ব্যাপক বিতরণ নেটওয়ার্ক তাকাফুল প্রতিষ্ঠানকে সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে নিয়ে যায়। একটি ভালো বিতরণ নেটওয়ার্ক আরো বেশি প্রিমিয়াম প্রাপ্তি ও নিরাপদ মানসম্পন্ন ব্যবসা নিশ্চিত করে।

৪. আর্থিক শক্তি : ব্যবসাকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক শক্তি থাকা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

৫. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা : সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাহায্যে কোথায় ঝুঁকি আছে তা উপলব্ধি করতে এবং প্রয়োজনের সময় অংশগ্রহণকারীদের দাবি মেটাতে প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য প্রমাণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. কর্পোরেট গভর্ন্যান্স : ভালো কর্পোরেট গভর্ন্যান্স তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা আরো ভালোর দিকে নিয়ে যায়। কর্পোরেট গভর্ন্যান্স বিধি ও নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তাকাফুল প্রতিষ্ঠানকে বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং দক্ষতা ও কোম্পানির মূল্যায়নে আরো ভালো ফলাফল দেয়।

৭. আইনগত ও শরীয়াহ কাঠামো : তাকাফুল বাজার আর্থিকব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং ইসলামী আর্থিক খাতের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সফলভাবে একীভূত হয়েছে। তবে শিল্পটির সামনে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এর সুষ্ঠু ও সাবলীল বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আইনগত, বিধিবদ্ধ ও শরীয়াহ কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

তাকাফুল বাজারের ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো অনুকূল বিষয় রয়েছে। কিছু অনুকূল বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো :

১. মুসলিম দেশগুলোতে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে মুসলমানদের একটি অত্যন্ত বড় অংশই তুলনামূলকভাবে তরুণ (৬০%-এর বেশির বয়স ২৫ বছরের নিচে)।

২. ইসলাম সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধির ফলে মুসলমানরা প্রচলিত বীমার বদলে তাকাফুল ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে।

৩. অমুসলমানরা ক্রমবর্ধমান হারে তাকাফুলসহ শরীয়াহ অনুমোদিত অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

৪. অধিকাংশ মুসলিম দেশে ব্যক্তিগত ধরনের বীমা ব্যবসা নগন্য এবং জীবন বীমা একেবারেই বিকশিত হয়নি। তাকাফুল ব্যবস্থা বীমা সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫. গত ৩০ বছরে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাফল্য তাকাফুলের জন্য কল্যাণকর হবে বলে আশা করা হয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের শাখাগুলোর মাধ্যমে তাকাফুল পণ্যরাজি বিতরণের করার জন্য তাদের ব্যাপক সুখ্যাতি ব্যবহার করতে পারে।

৬. মাইক্রো-তাকাফুল পণ্যরাজি স্বল্প আয়ের গ্রুপগুলোর কাছে পৌঁছাতে পারে এবং বীমা সম্পর্কে তাদের সচেতনা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে।

৭. পুনঃতাকাফুল সামর্থ্য অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তাকাফুলের অধিকতর বিকাশ ঘটবে।

www.pathagar.com

কয়েকটি দেশে তাকাফুলের বর্তমান অবস্থা

অধিকাংশ মুসলমানরা বাস করে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায়। প্রায় ৯০ কোটি মুসলমান সংখ্যালঘু হিসেবে অন্যান্য দেশে বসবাস করে। বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যালঘু দেশগুলো হচ্ছে ভারত (১৬ কোটি), চীন (৪ কোটি) ও ইথিওপিয়া (৪ কোটি)। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে আনুমানিক আড়াই কোটি মুসলমান বাস করে।

২০০৭ সালে, তাকাফুল প্রিমিয়াম ছিল প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত পাঁচ বছরে প্রবৃদ্ধি ছিল অস্বাভাবিক বেশি (৩০%)। বর্তমান মন্দা ও আর্থিক সঙ্কট সত্ত্বেও দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধি সুসংহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত তাকাফুল প্রতি বছর ২০% থেকে ২৫% বৃদ্ধি পেয়ে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তাকাফুল বাজার মোট বিশ্ব বীমা বাজারের ১০%-এ পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে পাঁচটি দেশ তাকাফুলের জন্য রোল মডেল হিসেবে কাজ করছে। এ দেশগুলো হচ্ছে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন। এই পাঁচটি দেশের বাজার বর্তমানে বিকাশ ও আইনগত পরিবেশ উভয় দিক থেকেই একটি ভালো দৃশ্যপট সৃষ্টি করেছে।

মালয়েশিয়া

তাকাফুলকে উৎসাহিত করে এমন উন্নত বিধিবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে মালয়েশিয়া সবচেয়ে অগ্রসর তাকাফুল বাজারে পরিণত হয়েছে। বস্তুত মালয়েশিয়া ইসলামী অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করছে। মালয়েশিয়ার তাকাফুল বাজারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

১. তাকাফুল অ্যাক্ট ১৯৮৪ তাকাফুল বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং 'ব্যাংক নেগারা' মালয়েশিয়া (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) তাকাফুল এবং প্রচলিত বীমা বাজার নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

২. ইসলামী বীমার বিকাশকে সহায়তা করার লক্ষ্যে তাকাফুল কোম্পানির অন্তর্ভুক্তির প্রতিবন্ধকতা প্রচলিত বীমা কোম্পানির চেয়ে কম। প্রচলিত বীমার তুলনায় তাকাফুলে পরিশোধিত মুলধনের প্রয়োজন হয় মাত্র এক-দশমাংশ।

৩. মালয়েশিয়ার সরকার নতুন তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের জন্য সুবিধাজনক কর প্রণোদনার ব্যবস্থা রেখেছে। ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও লভ্যাংশ কর রেয়াত হিসেবে দাবি করা যায়।

www.pathagar.com

৪. মোট বীমা বাজারে তাকাফুল প্রিমিয়াম আনুমানিক ৬% এবং গত ১০ বছরে প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১৮%।

৫. অন্যান্য মুসলিম দেশের তুলনায় মালয়েশিয়ায় বীমা সচেতনতা অনেক বেশি। 'ব্যাংকাতাকাফুল' মালয়েশিয়ায় অনেক বেশি সম্ভাবনাময় বিবেচিত হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ। গত কয়েক বছর ধরে দেশটির অর্থনীতি স্থিতিশীল রয়েছে। তা সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ার বীমা বাজার তুলনামূলকভাবে ছোট। ইন্দোনেশিয়ার সার্বিক তাকাফুল পরিস্থিতি নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করা যায় :

১. বিদ্যমান কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রচলিত বীমা কোম্পানিগুলোও তাকাফুল বিক্রি করতে পারে।

২. তাকাফুল কোম্পানিগুলোকে কোনো ধরনের বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হয় না।

৩. তাকাফুল সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা ও গ্রহণযোগ্যতার ফলে ২০১৫ সাল নাগাদ তাকাফুল ব্যবসা ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে সম্প্রসারিত হতে পারে। ২০০৭ সালে যা ছিল আনুমানিক ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের।

৪. তাকাফুল প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য শরীয়াহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আছে এমন অন্তত একজন বোর্ড সদস্য রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৫. বীমা সম্পর্কে তুলনামূলক কম সচেতনতার কারণে ব্রোকার ও এজেন্টদের মাধ্যমে বীমা সেবা বাজারজাত করা হয়।

৬. তাকাফুল ইন্দোনেশিয়ায় তুলনামূলক ভাবে নতুন। ফলে তাকাফুল প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণভাবে প্রচলিত পলিসিসমূহ বিক্রয়ে আগ্রহী।

সৌদি আরব (কেএসএ)

সৌদি আরবের আইনব্যবস্থা শরীয়াহভিত্তিক। ১৯৮৫ সালের ফিকাহ একাডেমির রায়ে সমবায়ী বীমা প্রতিষ্ঠান অনুমোদনযোগ্য হয়। প্রথম সমবায়ী বীমা (তায়ুন) কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে। সৌদি তাকাফুল বাজারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

১. মোট বীমা বাজারে তাকাফুলের অংশ হচ্ছে আনুমানিক ২০%। মোট প্রিমিয়াম আনুমানিক ২৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২. ক্রেতা সচেতনতা স্বল্প। জনগণের একটি অংশ এখনো মনে করে বীমা (বিশেষ করে জীবন বীমা) শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

www.pathagar.com

৩. তাকাফুল কোম্পানিগুলোর বিপণন উদ্যোগ বীমা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪. তাকাফুল কোম্পানিগুলো বীমা বিক্রয় করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ধরণের পলিসি সমূহের (যেমন মোটর, পারিবারিক, দুর্ঘটনা ইত্যাদি) দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

৫. আশা করা হচ্ছে তাকাফুল ব্যবসার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। ২০১৫ সাল নাগাদ সৌদি তাকাফুল বাজার ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং মোট বীমা বাজারে তাদের অংশ হতে পারে ২৫%।

৬. 'ব্যাংকতাকাফুল' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)

সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থনীতি গত পাঁচ বছরে গড়ে বার্ষিক ৮.৫% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করার মাধ্যমে খুবই শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। ভবিষ্যতেও এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দৃঢ় থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। আমিরাতের বীমা বাজার দুভাগে বিভক্ত যথা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক, যা পরিচালনা করে থাকে দুবাই আন্তর্জাতিক অর্থকেন্দ্র (ডিআইএফসি)। প্রতিটি ব্যবস্থায় নিজস্ব নিয়ন্ত্রণকারী আছে এবং রয়েছে বিধিবিধান ও নিয়মনীতি। ডিআইএফসি'তে তাকাফুল প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট বিধান। ইউএই বাজারের সার্বিক অবস্থা এখানে দেয়া হলো :

১. সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ইউএই'র বীমা বাজারই বৃহত্তম। মোট প্রিমিয়াম প্রায় ৪০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২. সমগ্র বীমা বাজারে তাকাফুলের অংশ আনুমানিক ২%। অবশ্য ৪১% বাজার প্রবৃদ্ধির তুলনায় তাকাফুল প্রবৃদ্ধি অনেক বেশি (৭০%)।

৩. তাকাফুল কোম্পানিগুলো মোটর ও পারিবারিক তাকাফুলের দিকে বেশি নজর দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বাণিজ্যিক বাজারের দিকেও নজর দিয়েছে।

৪. অন্যান্য দেশের তুলনায় ইউএইতে জীবন বীমায় বিকাশ কম। অবশ্য ২০০৭ সালে জীবন বীমার প্রিমিয়াম এক লাফে ৪৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের জন্য শরীয়াহ ব্যবস্থা প্রয়োজন। দি ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস রুল বুক (আইএফএস) এই প্রক্রিয়ার সুপারিশ করেছে এবং পদ্ধতিটি চালু হবে।

৬. বিতরণে শেয়ারহোল্ডার, সম্বর ও কোম্পানিগুলোর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রাধান্য বিস্তার করে। তাকাফুল ব্যবসায় ব্যাংকতাকাফুল গতিশীলতা অর্জন করছে।

www.pathagar.com

বাহরাইন

পারস্য উপসাগরে বাহরাইন সবচেয়ে ছোট দেশ। গত কয়েক বছর ধরে অর্থনীতি দৃঢ়ভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং এই প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাহরাইনের বীমা বাজারের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাহরাইন (সিবিবি)। সিবিবি প্রচলিত বীমার তুলনায় তাকাফুলকে কোনো ধরনের বেশি সুবিধা দেয় না। বাজারটির সার্বিক অবস্থা নিচে দেয়া হলো :

১. বাহরাইনের মোট প্রিমিয়াম আনুমানিক ৩৭০ মিলিয়ন ডলার। জীবন বীমার অংশ হচ্ছে ২১% এবং তা অব্যাহতভাবে বাড়ছে।

২. মোট তাকাফুল প্রিমিয়াম প্রায় ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাকাফুলের বৃহত্তম ব্যবসা হচ্ছে মোটর, এরপর রয়েছে স্বাস্থ্য ও সম্পত্তি।

৩. ২০১৫ সাল নাগাদ তাকাফুল ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পেতে পারে, যা বার্ষিক ১৬% হারে বাড়ছে।

৪. তাকাফুল কোম্পানিগুলোকে লভ্যাংশ বণ্টনের পদ্ধতি এবং তহবিলের উদ্বৃত্ত বিতরণের নীতি সুনির্দিষ্ট করতে হয়।

৫. প্রতিটি বীমা শ্রেণীর জন্য তাকাফুল প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে পৃথক হিসাব রাখতে হয় যা একাউন্টিং এন্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটের (এ.ও.এ.আই.এফ.আই) মানদণ্ড অনুযায়ী হতে হয়।

বিশ্ব পরিস্থিতি

তাকাফুল শিল্প এখন প্রচলিত বীমার ইসলামী বিকল্প হিসেবে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে এবং তা আঞ্চলিক ব্যবসা থেকে বৈশ্বিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে অন্তত ১৩৫টি পূর্ণাঙ্গ (ও ৪৫টি উইন্ডোস) তাকাফুল প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান বাজারে আসছে।

মুসলিম দেশগুলোর লক্ষণীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বীমা না থাকায় তাকাফুলের বিশেষ করে ব্যক্তিগত ধারার ব্যবসা উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

অধিকাংশ মুসলিম দেশে প্রচলিত বীমা ও তাকাফুল কোম্পানিগুলো পাশাপাশি প্রতিযোগিতা করছে। অবশ্য সৌদি আরব, সুদান ও ইরানসহ কয়েকটি মুসলিম দেশে শুধু শরীয়াহ অনুমোদিত কোম্পানি বা তাকাফুল কার্যক্রম চালাতে পারে। তাকাফুল আরো প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে, যদি ইসলামী বিশ্বে শুধু তাকাফুল ব্যবসা পরিচালিত হয়।

www.pathagar.com

বর্তমানে, মধ্যপ্রাচ্যের (অনারব) দেশগুলো বিশ্বের তাকাফুল ব্যবসায় প্রায় ৪০% অবদান রাখছে। এরপর রয়েছে জিসিসি দেশগুলো (৩৫%)। তাকাফুল বাজারে দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর অবদান প্রায় ১২% এবং আফ্রিকার অবদান ৪%। তাকাফুল বাজারে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার অবদান মাত্র ২%।

বিশ্ব তাকাফুল ব্যবসায় ২০০৬ সালের তুলনায় ২০০৭ সালের সার্বিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২২%। আফ্রিকান দেশগুলোর (মিসর, মৌরিতানিয়া, সেনেগাল ও সুদান) প্রবৃদ্ধি প্রায় ১৫%, জিসিসি দেশগুলো (বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব ও ইউএই) এবং অন্য আরব ও অনারব দেশগুলোর প্রায় ২৩%। দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর তাকাফুলে প্রবৃদ্ধি আনুমানিক ২৫%, ভারতীয় উপমহাদেশের (বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা) ১৪%। ২০০৪ সালের তুলনায় ২০০৫ সালের তাকাফুল প্রবৃদ্ধি ছিল ৩২% এবং ২০০৭ সালে ছিল ২২%। ২০১২ সাল নাগাদ কয়েকটি দেশের তাকাফুল প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশিত পরিমাণ নিচে দেয়া হলো (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে) :

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য		মধ্যপ্রাচ্য		আফ্রিকা		ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা		সর্বমোট
মালয়েশিয়া	১২০০	কেএসএ	৯৫০	মিসর	৪৭০	যুক্তরাষ্ট্র	৮৫০	
ইন্দোনেশিয়া	১০০০	ইরান	৭৭৫	আলজেরিয়া	১৩০	যুক্তরাজ্য	২৬০	
সিঙ্গাপুর	৫৫	ইউএই	৪৮০	দ. আফ্রিকা	৪০	তুরস্ক	২০	
ফিলিপাইনস	১৫	কুয়েত	১৯০	তিউনিশিয়া	৩০	অন্যান্য	২০	
থাইল্যান্ড	৯০	কাতার	১৩০	লিবিয়া	২০			
পাকিস্তান	৭৫	জর্দান	১৩০	মরক্কো	১০			
বাংলাদেশ	৬০	ওমান	৬৫	অন্যান্য	৫০			
চীন	৯৫	লেবানন	৪০					
অন্যান্য	৭০	বাহরাইন	১৫০					
		সিরিয়া	১০					
মোট- ২৬৬০ মি:ড:		২৯২০ মি:ড:		৭৫০ মি: ড:		১১৫০ মি: ড:		৭৪৮০ মি: ড:

তাকাফুলের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বাজার হলো মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া। বর্তমানে মোট তাকাফুল প্রিমিয়ামের আনুমানিক ৮০% আসে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চল থেকে। অবশ্য, মধ্যপ্রাচ্যে মোট প্রিমিয়ামের মাত্র ২০% ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক ধারার। অন্যদিকে দূরপ্রাচ্যে মোট তাকাফুল প্রিমিয়ামের ৬৪% আসে পারিবারিক তাকাফুল থেকে। মোট তাকাফুল ব্যবসার আনুমানিক

www.pathagar.com

৫০% ইরান থেকে আসলেও দেশটির বীমাব্যবস্থা তাকাফুল পদ্ধতি অনুসরণ করে না। যদিও দেশটির পুরো ব্যবস্থাই ইসলামী আইন অনুযায়ী প্রণীত।

মালয়েশিয়া ও সুদান ছাড়া অন্য কোথাও তাকাফুলের পেছনে সরকারী পৃষ্টপাষকতা নেই। কাতার, ওমান, লেবানন, ইরাক, ইয়েমেন ও মিসরসহ অধিকাংশ মুসলিম দেশে তাকাফুলের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান নেই। সুদান অনুসরণ করে সমবায়ী মডেল, বাহরাইন অনুসরণ করে ওয়াকালা ও মুদারাবা মডেলের মিশ্রণ। বাহরাইন, সৌদি আরব, সুদান, মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোতে তাকাফুল আইন ও বিধিবিধান রয়েছে এবং ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশে তাকাফুলের জন্য সুস্পষ্ট কর্মকৌশলের ও বিধিবিধানের অভাব রয়েছে।

বিশ্বজুড়ে তাকাফুল কোম্পানিগুলোকে প্রচলিত বীমা প্রতিষ্ঠানগুলের সমৃদ্ধ ইতিহাস, অধিকতর সামর্থ্য, অধিকতর দক্ষতা, অপেক্ষাকৃত ভালো পণ্যরাজি ও অবকাঠামোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। অধিকন্তু প্রচলিত বীমা কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনেক বেশি ও ব্যাপকতর সুবিধা রয়েছে। ফলে তারা তাদের সেবা মূল্য অনেক কম রাখতে পারে। তারা ব্যাপক মাত্রার সুবিধাটিও পায়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, তাকাফুল ব্যবস্থাকে নৈতিক মানসম্পন্ন একটি বিকল্প হিসেবে তুলে ধরতে হবে এবং ক্রেতাদের কাছে একে বেশি মূল্য সংযোজিত সেবা হিসেবে গণ্য করতে হবে। প্রচলিত বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো যা করছে, তার সাথে তাল মেলানো তাকাফুলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাকাফুলের পণ্যরাজি ও সেবা প্রচলিত বীমার চেয়ে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এবিষয়টি তুলে ধরতে পারলে তাকাফুল কোম্পানিগুলো ধর্ম, বর্ণ, আদর্শ ও ভৌগলিক সীমানার উর্ধ্বে ওঠে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারবে এবং ইউরোপ, আফ্রিকা, ভারত, চীন, এশিয়া মাইনর ও আমেরিকায় তাকাফুল বাজার সপ্রসারণের বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হবে।

তাকাফুলের নয়া দিগন্ত

দুই কোটি মুসলমান সমৃদ্ধ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) স্বাভাবিকভাবেই তাকাফুল প্রবৃদ্ধির জন্য বিপুল সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র এবং সেখানে সহজেই প্রবেশ করা যায়। ইউরোপের আইনানুগ পরিবেশ ও মুসলমান জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি সেখানে তাকাফুলের উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য, ইইউ'র মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে তাকাফুল সম্পর্কে সচেতনতা বেশ কম। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, অধিকাংশ ব্রিটিশ মুসলমান 'তাকাফুল' প্রতিশব্দের সাথে পরিচিত নয় এবং বুঝতে পারে না। তাই, সম্ভাবনাময় ক্রেতাদের তাকাফুল

www.pathagar.com

সম্পর্কে এবং শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিভাবে সে সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

অমুসলিমদের কাছে তাকাফুল ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করতে পারে, কারণ অধিকতর নৈতিক মানসম্পন্ন ও স্বচ্ছ বীমা পণ্যরাজির প্রতি সহজাত চাহিদা রয়েছে। ইউরোপে তাকাফুল ব্যবসা মুসলিম ও অ-মুসলিম উভয় ধরনের ক্রেতাকে লক্ষ্য রেখে করা উচিত। তাকাফুল পদ্ধতি নৈতিক গুণসম্পন্ন পলিসি, স্বচ্ছ বীমা চুক্তি এবং একইসাথে এতে আন্ডাররাইটিং উদ্বৃত্ত কিংবা বিনিয়োগ লাভের মাধ্যমে প্রদত্ত চাঁদার অতিরিক্ত ফেরত পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্টসমূহ সচেতন গ্রাহকদের সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

ইইউ'র ২৭টি দেশের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও স্পেনকে তাকাফুল প্রবৃদ্ধির জন্য অধিকতর সম্ভাবনাময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সম্ভবত তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের জন্য মিউচুয়াল কোম্পানি হবে অধিকতর কার্যকর। ইউরোপে দুটি তাকাফুল কোম্পানি কাজ করছে, এর একটি যুক্তরাজ্যে অপরটি লুক্সেমবার্গে।

আফ্রিকায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশের ফলে জীবন ও সম্পত্তি বীমা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। অবশ্য, প্রচলিত ও তাকাফুল উভয় ধরনের বীমার সাফল্য সেখানে তুলনামূলক বেশ কম। গড় জীবন বীমা প্রিমিয়াম প্রায় ৪০ মার্কিন ডলার এবং অজীবন বীমা প্রায় ১৭ মার্কিন ডলার। আফ্রিকায় বীমার প্রবৃদ্ধি জীবন বীমায় ৩% এবং অজীবন বীমায় ১.৫%।

এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অন্তত আটটি আফ্রিকান দেশে প্রচলিত বীমার বিকল্প হিসেবে তাকাফুল কাজ করছে। এসব দেশ হচ্ছে আলজেরিয়া, মিসর, লিবিয়া, গাম্বিয়া, মৌরিতানিয়া, সেনেগাল, সুদান ও তিউনেশিয়া। এক সুদানেই রয়েছে ১৬টি তাকাফুল কোম্পানি। ১৯৭৯ সাল থেকেই সুদান ইসলামী বীমার পথিকৃত হিসেবে কাজ করছে।

বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনসংখ্যার (৪ কোটি) কারণে উত্তর এশিয়ায় চীন তাকাফুলের জন্য সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়। একটি উদীয়মান বাজার হিসেবে চীনের মর্যাদার কারণে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারটিতে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। চীনের অধিকাংশ মুসলমানের বাস দেশটির উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ জিজিয়াং, গাউসু ও নিংজিয়ায়, মধ্যাঞ্চলীয় প্রদেশ হুনানেও অনেক মুসলমান বাস করে। চীন ছাড়াও উত্তর এশিয়ান দেশ জাপান, কোরিয়া ও হংকংও তাকাফুলের সম্ভাবনাময় বাজার রয়েছে।

মিউচুয়াল ইন্স্যুরেন্সের উর্বরক্ষেত্র জাপানে তাকাফুলের ধারণাটি বীমাখাতের চমকপ্রদ উদ্ভাবন হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। উত্তর এশিয়ায় মিউচুয়ালিটি ও

মরালিটি একত্রিত হয়ে তাকাফুলকে সফল করে তুলতে পারে। এসব দেশে মুসলমান ও অমুসলমান সবার চাহিদার দিকে মনোযোগী হলে তাকাফুল তার শেকড় বিস্তার করতে পারবে। সংহতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতার নীতিমালাগুলো যখন প্রচলিত সমবায় ও মিউচুয়াল বীমার কাঠামোতে প্রবেশ করবে, তখন সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিরসনে নতুন যুগের সূচনা করবে। এ প্রেক্ষাপটে চীন এবং ভারতেও মাইক্রো-তাকাফুল প্রবর্তন করা যেতে পারে।

ক্ষুদ্র বীমা ভারতে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ভারতের বীমা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (আইআরএ) যদি এনজিওগুলোকে তাকাফুল পণ্যরাজি বিপণনের অনুমতি দেয়, তখন ভারতের ১৬ কোটি মুসলমানের বিরাট অংশ (ইন্দোনেশিয়ার পর সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম) এটাকে ধর্মীয় কারণে গ্রহণ করে নেবে। ভারত ইতোমধ্যে সরকারি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান "জিআইসিরি"কে তাকাফুল প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট থেকে পুন:তাকাফুল লগ্নির অনুমতি দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, তাকাফুল ভারতে তার অবস্থান মজবুত করতে পারবে। তাকাফুল বাজারে ভারতের যোগদানের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে তাকাফুল শিল্প বর্তমানের চেয়ে অনেক দ্রুত বিকশিত হবে।

আফ্রিকায় তাকাফুলের সম্ভাবনা

এশিয়ার পর আফ্রিকা হলো আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার মহাদেশ। সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জসহ এর আয়তন প্রায় ৩০.২ মিলিয়ন কিমি, পৃথিবীর মোট এলাকার ৬% এবং মোট ভূভাগের ২০.৪% এলাকা নিয়ে গঠিত। শতকোটি জনসংখ্যার মহাদেশটি বিশ্বের ১৫% মানুষের বাস। মাদাগাস্কার এবং আরো কিছু দ্বীপ ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসহ মহাদেশটিতে ৫৩টি দেশ রয়েছে।

উত্তর আফ্রিকার মানুষ দুটি গ্রুপে বিভক্ত : পশ্চিমদিকে বারবার ও আরবিভাষী জনগণ এবং পূর্বে মিসরীয়রা। আরবরা সপ্তম শতকে উত্তর আফ্রিকায় পৌঁছে সেখানে আরবি ভাষা ও ইসলাম প্রবর্তন করে। সুদান ও মৌরিতানিয়া মূলত আরব উত্তর ও আদিবাসী আফ্রিকান দক্ষিণে বিভক্ত। পূর্ব আফ্রিকার কোনো কোনো এলাকায় বিশেষ করে জানজিবার ও কেনিয়ার লামু দ্বীপে প্রাচীন ও মধ্যযুগে আরব মুসলমান বণিক এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ানরা বসতিস্থাপন করেছে।

১৯৯৫ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত আফ্রিকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেড়েছে ২০০৫ সালে প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ৫%। কয়েকটি দেশ বিশেষ করে অ্যাঙ্গোলা, সুদান ও ইকুয়েটোরিয়াল গিনি এখনো উচ্চতর প্রবৃদ্ধির হার উপভোগ করছে। উল্লেখিত তিনটি দেশই তাদের পেট্রোলিয়াম মজুত ব্যবহার করেছে কিংবা তাদের তেল

www.pathagar.com

আরোহণ ক্ষমতা সপ্রসারিত করেছে। সাপ্রতিকালে চীন আফ্রিকান দেশগুলোর সাথে ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। ২০০৭ সালে চীনা কোম্পানিগুলো আফ্রিকায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

গত ৪০ বছরে আফ্রিকার জনসংখ্যা দ্রুত বেড়েছে এবং তারা এখনো তুলনামূলকভাবে তরুণ। অনেক আফ্রিকান দেশে অর্ধেক কিংবা অধিকাংশ মানুষের বয়সই ২৫-এর কম।

আরব ও বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের সাথে ব্যাপক সম্পর্কের কারণে ধারণা করা হচ্ছে আফ্রিকায়, বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকান দেশগুলোতে তাকাফুল ব্যাপকভাবে সপ্রসারিত হবে। আফ্রিকায় তাকাফুল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তাকাফুল কার্যক্রমের প্রধান প্রধান বিষয় ও ঝুঁকি সম্পর্কে জানা উচিত। মধ্যপ্রাচ্য ও দুরপ্রাচ্যের মুসলিম অধ্যুষিত দেশ সমূহের তাকাফুল প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে উত্তর আফ্রিকার প্রতিষ্ঠান সমূহের যোগাযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামগ্রিক মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ

সমগ্রিকভাবে তাকাফুল ব্যবস্থার মূল্যায়ন করতে হলে চারটি প্রধান বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা যেখানেই হোকনা কেন, এগুলো অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে এবং তাকাফুল ব্যবস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।তাকাফুল বিকাশে যে বিষয়গুলি সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনতে হবে তা হচ্ছে :

১. সচেতনতার অভাব : তাকাফুল ও বীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা খুব কম বা নেই। বিভিন্ন বাজারে সচেতনতা বিভিন্ন মাত্রায় লক্ষ করা যায়। ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাকাফুলের বিকাশ তরান্বিত করা জরুরী।

২. দক্ষতা ও সামর্থ্যের অভাব :

   ক. বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে অভিজ্ঞতা ও অঙ্গিকারের অভাব।

   খ. কার্যক্রমগত পর্যায় ও কারিগরি দক্ষতায় তাকাফুল ব্যবস্থা অনগ্রসর, যেমন নতুন পণ্য উদ্ভাবনে ব্যর্থতা এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের দুর্বলতা।

   গ. ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্টে সনাতন পদ্ধতির অনুসরণ।

   ঘ. অধিকাংশ ক্ষেত্রে বীমা নিয়ন্ত্রণকারীর সামর্থ্য ও ব্যবস্থাপনা অত্যান্ত সীমিত ও দুর্বল।

৩. অসম প্রতিযোগীতা : প্রচলিত বীমা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ফলে অপেক্ষাকৃত বেশি সামর্থ্য, অপেক্ষাকৃত বেশি

www.pathagar.com

দক্ষতা, পণ্যরাজি ও অবকাঠামো, অপেক্ষাকৃত বেশি বিনিয়োগ সক্ষমতা এবং এর ফলে তাদের সেবা মূল্য অনেক কম। তাকাফুল ব্যবস্থায় সমপর্যায়ের সামর্থ কিছুটা সময় সাপেক্ষ।

৪. মানসিকতা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা : বিদ্যমান ধারণা রয়েছে, তাকাফুল শুধু মুসলমানদের জন্য এবং প্রচলিত বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম তাকাফুল হুবহু অনুসরণ করছে। প্রকৃত পক্ষে তাকাফুলকে একটি নৈতিক গুণসম্পন্ন সেবা হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে এবং তাকাফুলের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে হবে। তাকাফুল বিকাশের মৌলিক শর্ত হচ্ছে এর মৌলিকতা রক্ষা করা।

তাকাফুল কোম্পানিগুলোর জন্য কয়েকটি প্রধান ঝুঁকি এখানে তুলে ধরা হলো :

১. মুদারিব বা ওয়াকিল হিসেবে তাকাফুল কোম্পানি অবহেলা জনিত কারনে দায়ী হতে পারে যদি অপরিণামদর্শী বিনিয়োগ কৌশল গ্রহণ করা হয়।

২. শরিয়াহ বহির্ভূত হওয়ার অভিযোগ তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের ভাবমর্যাদা ধ্বংস করতে পারে।

৩. তাকাফুল ব্যবস্থায় সুদ ভিত্তিক বিনিয়োগ সম্ভব নয়। বর্তমানকালের পরিবেশে অপেক্ষাকৃত কম বিনিয়োগের সুযোগ তাকাফুল কোম্পনি সমূহের রয়েছে, ফলে ঝুকির পরিমান বেশী।

৪. বিনিয়োগ বিকল্প কম থাকায় তারল্য ঝুঁকি বেশি থাকে এবং ইক্যুইটি, রিয়েল এস্টেট ও সুকুকের দিকে বেশি ঝুকতে হয়।

৫. তাকাফুল ব্যবস্থায় বাজার ঝুঁকির প্রভাব বিভিন্নমূখী যেমন-

ক. কর্পোরেট গভারন্যান্স এর অভাব।

খ. দেশের আইনগত ব্যবস্থায় দূর্বলতা।

গ. সরকারি বিধিবিধান এর অপ্রতুলতা।

ঘ. কর ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ও অদুরদর্শীতা।

ঙ. অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব।

সাধারণ ভাবে তাকাফুল বাজার সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা হলে যে বিষয়গুলো প্রতিভাত হয় তা নিম্নরূপ–

১. তাকাফুল বাজার বিশ্বে খুব বেশি বিস্তৃত না হলেও প্রায় সকল মহাদেশেই বিপুল, সপ্রসারয়মান মুসলিম জনসংখ্যার অস্তিত্ব রয়েছে। ২০১২ সাল নাগাদ বৈশ্বিক তাকাফুল বাজার ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ২০১৫ এর মধ্যে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অনুমান

www.pathagar.com

করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী তাকাফুলের প্রবৃদ্ধি হবে প্রায় ২০%, যেখানে প্রচলিত বীমার ব্যবসা বৃদ্ধি হতে পারে প্রায় ২.৫%।

২. মোট তাকাফুল বাজারে পারিবারিক তাকাফুল (ইসলামী জীবন বীমা) এখন খুবই ছোট আকারে রয়েছে। এটাকে সম্প্রসারণ করা দরকার। এশিয়া ও আফ্রিকায় শতকোটি লোক রয়েছে। যথাযথ পণ্য উদ্ভাবন করে কার্যকরভাবে বাজারজাত করতে পারলে, সত্যিকার অর্থেই ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব। আমরা অ-মুসলমানদের কাছে পৌঁছাতে পারি তাকাফুল ব্যবস্থার বৈশিষ্টের কারনেই।

৩. তাকাফুল পণ্যরাজির বিকাশ ও উন্নতি করতে হলে আমাদের জনশক্তির পেশাগত উৎকর্ষতার দিকে তাকাতে হবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হলো অচিরেই বাহরাইন ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকিং এন্ড ফাইনান্স-এর সহযোগিতায় ইংল্যান্ডের চার্টার্ড ইন্স্যুরেন্স ইনস্টিটিউট তাকাফুলের ওপর কোর্স পরিচালনা করবে এবং তা চার্টার্ড ইনস্টিটিউটের পরীক্ষার অংশে পরিণত হবে।

৪. বিতরণ ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে আমাদের উচিত ব্যাংক, এনজিও, ক্ষুদ্র ঋণদাতা, প্রত্যক্ষ বিক্রি, কল সেন্টার ইত্যাদির মতো বিকল্প বিতরণ চ্যানেল অনুসন্ধান করা।

৫. ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আরো মাইক্রো-তাকাফুল সেবার উদ্ভাবন ও বিস্তৃতি করা প্রয়োজন। স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য স্বল্পমেয়াদের ব্যাপকভিত্তিক সেবা সরবরাহ করা সম্ভব হলে তাকাফুলের মাধ্যমে অধিকসংখ্যক জনগোষ্ঠির নিকট পৌঁছানো সহজতর হবে।

৬. তাকাফুল ব্যবস্থার জন্য একটি মানদণ্ড তৈরি করা, নীতি-নৈতিকতা এবং স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাদির জন্য তাকাফুল বিশেষজ্ঞদের নিয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি পেশাদার সমিতি গঠনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সমাপনী বক্তব্য

তাকাফুল শিল্প স্থিতিশীল ও ব্যাপক দক্ষতা অর্জন করা অব্যাহত রাখলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজার উদারিকরণ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও ক্রেতাদের প্রত্যাশা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক উপাদানগুলো শিল্পটিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কারণে কার্যক্রমগত প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন পণ্যের উদ্ভাবন, কার্যকর সেবা ও উন্নত দক্ষতার প্রয়োজন আরো বেড়েছে।

www.pathagar.com

বিতরণ চ্যানেলগুলোর কার্যকর ব্যবহার, গতিশীল বিনিয়োগ কৌশল ও তাকাফুলের ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধি তাকাফুল শিল্পটির আরো বিকাশে অবদান রাখবে। তাকাফুল শিল্পকে উন্নত করার কৌশল তথা প্রতিযোগিতা, গতিশীলতা ও আরো স্থিতিশীলতা হবে নিয়ন্ত্রণকারী, শিল্প ও বাজার অংশীদার অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিত প্রয়াস ও সহযোগিতার ফল। উম্মাহ'র জন্য শরীয়াহ ভিত্তিক একটি ন্যায়সঙ্গত ও সাবলীল আর্থিক ব্যবস্থা বিনির্মাণের জন্য লক্ষ্য হওয়া উচিত বিশ্বমানের প্রগতিশীল অনেক তাকাফুল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা।

বাজার বিশেষজ্ঞগণ ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, ইসলামী দেশগুলোর জনসংখ্যা অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি স্বচ্ছল হতে থাকায় এবং তারা শরীয়াহ অনুমোদিত পণ্যরাজির ব্যাপারে আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করায় তাকাফুল বীমার চাহিদা নাটকীয়ভাবে বাড়বে। অধিকন্তু, নৈতিকতা সমৃদ্ধ হওয়ায় তাকাফুল পণ্যরাজি মুসলমান ও অ-মুসলমান উভয়কেই আরো বেশি আকৃষ্ট করতে পারে। তাকাফুল পণ্যরাজির সম্ভাব্য চাহিদা অবশ্যই অনেক বেশি এবং তাকাফুল শিল্প এখন বিশ্বব্যাপী আরো বিস্তৃত হতে যাচ্ছে।

প্রচলিত বীমার তুলনায় বৈশ্বিক তাকাফুল শিল্প অনেক ছোট। তাই বাজারটির দরকার বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ড স্বীকৃতি ও প্রচলিত বীমা শিল্পের তৈরি করা দক্ষতার মানদণ্ড অতিক্রম করা। তবে এটা আনন্দের সাথে উল্লেখ করা যেতে পারে, তাকাফুল প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমবর্ধমান হারে উপলব্ধি করতে পারছে যে, তাদের পণ্যরাজির নৈতিক মান নির্দেশিকা ও স্বচ্ছতা মুসলমান এবং এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশাল পরিসরের অমুসলমান সম্প্রদায়ের কাছেও আবেদন সৃষ্টি করছে।

তাকাফুল শিল্প অত্যন্ত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন পর্বে প্রবেশ করছে। অবশ্য, এখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি জাতীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ শিল্পটির জন্য তাকাফুল অবকাঠামো প্রণয়ন করেছে। প্রগতিশীল তাকাফুল বিধি প্রণয়নের দিক থেকে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে মালয়েশিয়া ও বাহরাইন। সম্প্রতি, সৌদি আরব ও পাকিস্তান তাকাফুল ব্যবসার জন্য আইনগত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে। আশার কথা যে, বাংলাদেশ সরকারও পৃথক তাকাফুল অ্যাক্ট প্রণয়নের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। এটা অবশ্যই বাংলাদেশে সদ্য সৃষ্ট তাকাফুল শিল্পের বিকাশে সহায়তা করবে।

www.pathagar.com

পনের.

ইসলামী বীমার বর্তমান অবস্থা ও আমাদের করণীয় প্রেক্ষাপট

ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের সূচনা হিসেবে দুবাই ইসলামিক ব্যাংক এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিষ্ঠার পর সৌদি আরবের মহামান্য প্রিন্স মোহাম্মদ-আল-ফয়সাল-আল-সৌদ বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এ ধরনের একটি উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি মহামান্য জাফর নিমেরির (গণপ্রজাতান্ত্রিক সুদানের তদান্তিন প্রেসিডেন্ট) সালে আলোচনা করেন এবং সুদানে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি চান। সুদানি সরকারের সকল পর্যায়ের নির্বাহী ও আইন পরিষদ উক্ত প্রস্তাবের অনুকূলে সকল ধরনের উৎসাহ ও সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে।

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একটি সমবায় বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সাউব্যতা যাচাই জরিপে উদ্যোগী হয়। এ ব্যাপারে ব্যাংকের শরীয়াহ তত্ত্বাবধান বোর্ডের (এস.এস.বি) মতামত চাওয়া হয়। এস.এস.বি প্রথম সভায় স্কিমটি পর্যালোচনা করে। পর্যালোচনা অব্যাহত থাকে এবং কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এবং আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন তৈরি করে। এস.এস.বি কয়েকটি সংশোধনী দেয় এবং তা বাস্তবায়ন করা হয়। এস.এস.বি নিশ্চিত করে যে স্কিমটি শরীয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে যথাযথ এবং বাস্তবতার আলোকে যৌক্তিক। ফলে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে একটি সুদানি পাবলিক কোম্পানী হিসেবে (কোম্পানী অ্যাক্ট ১৯২৫ এর অধীনে) ইসলামিক ইন্সুরেন্স কোম্পানী লি. গঠিত হয়।

ইসলামী শরীয়ার আলোকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত এটাই বিশ্বে সর্বপ্রথম বীমা কোম্পানী। এই কোম্পানীর সম্পূর্ণ অনুমোদিত মূলধন প্রদান করে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক। কোম্পানীটিকে অনেকগুলো সুবিধা ও ছাড় দেওয়া হয়। এর সম্পদ ও লাভ সকল ধরনের কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অধিকন্তু কোম্পানীটির যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত, জাতীয়করণের আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কোম্পানীটিকে সুদানে বীমা নিয়ন্ত্রণ অ্যাক্ট থেকেও রেহাই দেওয়া হয়।

মালয়েশিয়ায়, একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে (কোম্পানী অ্যাক্ট ১৯৬৫ এর অধীনে) ইসলামী ইন্সুরেন্স কোম্পানী ১৯৮৪ সালের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হয় এবং ১৯৮৫ সালের আগস্টে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বীমা কোম্পানী হিসেবে এর কার্যক্রম শুরু হয়। মালয়েশিয়ান সরকার সেদেশে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠায় সম্ভাব্যতা জরিপের জন্য ১৯৮২ সালে 'টাস্ক ফোর্স' গঠনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এটা সম্ভব হয়। ইসলামিক ব্যাংক সংক্রান্ত ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে টাস্ক ফোর্সটি গঠিত হয়। এর রিপোর্টে ইসলামী বীমার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে মালয়েশিয়ান সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়।

টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে ধর্মীয় আলেম, আইন বিশেষজ্ঞ, অর্থনৈতিক ও বীমায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি নেওয়া হয়। টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা বেশ কয়েকটি ইসলামী দেশ সফর করে এবং ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠার অবস্থায় থাকা তিনটি ইসলামী বীমা কোম্পানীর সাথে আলোচনা করে। পরিশেষে, টাস্ক ফোর্স সরকারের কাছে পাঠানো তার রিপোর্টে যত দ্রুত সম্ভব মালয়েশিয়ায় একটি ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। মালয়েশিয়ান সরকার তখন ইসলামী বীমা অ্যাক্ট ১৯৮৪ নামে একটি বিধান জারি করে, যা মালয়েশিয়ার ইসলামী বীমা নিয়ন্ত্রণ করে। মজার ব্যাপার হলো, মালয়েশিয়ায় ইসলামী বীমা কোম্পানীটি (যা শিয়ারিকাত ইসলামী বীমা মালয়েশিয়া নামে পরিচিত) বাস্তবে ব্যাংক ইসলামী মালয়েশিয়া বেরহাদের একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান। ইসলামী বীমা কোম্পানীটির পরিশোধিত মূলধনের ৫১% ব্যাংকটির। শেয়ারের ৪৯% মালিকানা হচ্ছে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় কাউন্সিল ও রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় ফাউন্ডেশন।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলামী বীমার ভূমিকা

সাম্প্রতিক অতীত থেকে, মুসলিম বিশ্ব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে প্রকৃত আসন অধিকার ও মানবতার প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য বিরামহীন উদ্যোগ এবং প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী বীমা হলো মুসলিম উম্মাহর প্রতি একটি কল্যাণমূলক সেবা। ইসলামী বীমার প্রবর্তন ইসলামী শরীয়াহ কিভাবে ন্যায়সংগত, সুবিচার ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে একটি নতুন আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে, তার একটি উদাহরণ।

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সার্বিকভাবে পুরো সমাজের উন্নয়ন। মানবজাতির কল্যাণের জন্য কার্যকর ইসলামী বীমা ব্যবস্থা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ করা যার মধ্যে তাদের বিশ্বাস, তাদের জীবন, তাদের ভবিষ্যৎ এবং তাদের সম্পদের নিরাপত্তা নিহিত। জনগণের এসব উপাদান নিশ্চিত করা ও নিরাপত্তা দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামী বীমা জনস্বার্থ রক্ষা করতে পারে এবং এর ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

www.pathagar.com

ইসলাম প্রদর্শিত শোষণমুক্ত সমাজে পর্যাপ্ত মূলধন যোগানের ব্যবস্থা থাকে। মহানবী (সা:) ভিক্ষাবৃত্তি নিরুৎসাহিত এবং মূলধন গঠনকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি এক দরিদ্র সাহাবিকে একটি কুঠার কিনে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ ও সেগুলো বাজারে বিক্রি করার জন্য তার সবকিছু বিক্রি করার উপদেশ দিয়েছেন। ইসলামী বীমা ব্যবস্থা প্রতিটি পরিবার থেকে মূলধন যোগানের কাজটি করবে। এটা প্রতিটি ব্যক্তিকে ইসলামী জীবনবীমার মাধ্যমে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সংগৃহীত উদ্বৃত্ত মূলধন বাজারে বিনিয়োগ হবে। ফলে সম্পদের আরো বেশি ব্যবহার ও আরো অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

সোয়া শত কোটি অনুসারী নিয়ে ইসলাম পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। সার্বিকভাবে চল্লিশটি দেশে মুসলমানরা জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। ১৮৪টি দেশে বসবাসকারী মুসলমানরা বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ২০%। মুসলমান প্রধান দেশগুলোতে সাম্প্রতিক অতীতে ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বীমাসহ অর্থনৈতিক সার্ভিসগুলোতে ভূমিকা পালনে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। পরিণতিতে এক শত ত্রিশ এর বেশি ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীবন এবং অ-জীবন খাতে বীমা সুবিধা প্রদানের জন্য। ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান নামে পরিচিত এসব বীমাকারকরা শুধুমাত্র ইসলামী দেশগুলোতেই নয়, বরং ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এই বীমা পদ্ধতি মুসলিম সপ্রদায়ের মধ্যে বীমার চাহিদা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আরো বিকশিত হবে।

ইসলামী বীমা শুধুমাত্র একটি অভিনব অর্থনৈতিক পদ্ধতি হিসেবেই নয়, সেইসাথে ধর্মীয় নীতিমালা হিসেবেও বিকশিত হচ্ছে। ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতির কল্যাণ। একটি ধর্ম হিসেবে ইসলাম চায় স্রষ্টা যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে মানুষের জীবনকে পরিচালিত করা। ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়, বরং এটা এক অর্থে একটি আদর্শ যেখানে বিধান হিসেবে শরীয়াহ মুসলমানদের তাদের জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

শরীয়াহ একটি ব্যাপক বিষয়, এতে মানুষের সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আল্লাহ'র সাথে মানুষের এবং অন্যান্য মানুষের সাথে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। মুসলমানরা যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় পড়ে, তার সমাধানের জন্য কুরআন এবং হাদিসের আলোকে বৈধ আচরণবিধি প্রণয়নের প্রয়াসে শরীয়ার বিধিমালা রচিত হয়েছে। ইসলামের চিরন্তন লক্ষ্য হলো মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতা অন্তর্ভূক্ত করা। মানুষ কিভাবে তার জীবিকা উপার্জন করবে, কিভাবে সে তার সম্পদ ব্যয় করবে এবং তার মৃত্যুর পর কিভাবে তার সম্পদ ব্যয়িত হবে এসবই ইসলামের প্রাসঙ্গিক বিষয়। ইসলামে বস্তুগত বিষয়ের

www.pathagar.com

চেয়ে মানবিক বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুগত বিষয়ের চেয়ে এতে নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং মানবিক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

মহানবী (সা:) এ প্রসঙ্গে বলেন,

"যে পেটপুরে খাবার খায়, আর তার প্রতিবেশি ক্ষুধার্ত থাকে, সে মুমিন নয়।"

প্রতিবেশি, দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন এবং বঞ্চিতদের সহায়তার মাধ্যমে ভাতৃত্ববোধের নীতিমালা ভিত্তিক একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে অবদান রাখা ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের কর্তব্য।

ইসলামী জীবন বীমার ভূমিকা এবং ইসলামী অর্থনীতিতে এর স্থান আরো ভালভাবে অনুধাবনের জন্য ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইসলামে ব্যক্তি মালিকানার অধিকার নিরঙ্কুশ এবং শর্তহীন নয়। মালিকানা শুধুমাত্র এক ধরনের জিম্মাদারি। কোন ব্যক্তি হয়তো যে কোন পরিমাণের সম্পদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন না। তিনি শরীয়াহর বিধান অনুযায়ী তার সম্পদের ব্যবহার করতে বাধ্য। কোন ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভবান হতে পারেন। ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত বিনিয়োগের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং লাভ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তথা মূলধনের মালিকদের মধ্যে বণ্ঠিত হয়ে থাকে।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আরেকটি মৌলিক নীতি হচ্ছে সম্পদের ন্যায়সংগত বণ্টনের ব্যবস্থা। ইসলাম সহমর্মিতার অনুভূতি নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মানুষকে উৎসাহিত করে। ইসলামী বীমা এমন একটি ব্যবস্থা যাতে প্রয়োজনের সময়ে পারস্পরিক সহায়তার লক্ষ্যে অর্থ প্রদানের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। ইসলামী বীমা পারস্পরিক সহযোগিতা এবং যৌথ নিশ্চয়তার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থকে সাহায্য করার একটি পদ্ধতি।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অতিরিক্ত সম্পদ জমা করা এবং একটি ক্ষুদ্র অংশের হাতে পুঞ্জিভূত হওয়া সমর্থন করে না। সম্পদের বণ্টন সংক্রান্ত ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাছে অপরিচিত। এতে মৃত ব্যক্তির সম্পদ অন্যদের বঞ্চিত করে মাত্র একজনকে না দিয়ে ব্যাপক পরিসরে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। ইসলামী জীবন বীমা ব্যবস্থায় নমিনি শুধুমাত্র জিম্মাদার (ট্রাস্টি) হিসেবে কাজ করে এবং পলিসির অর্থ সকল উত্তরাধিকারীর মধ্যে বণ্টন করে দেয়।

www.pathagar.com

বঞ্চিত ও অভাবিদের জন্য ইসলাম বছরে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সম্পদের বিপরীতে প্রতিটি মুসলমানের জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করা বাধ্যতামূলক করেছে। একে বলা হয় যাকাত। এটা ইসলামে এতো গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে যাকাত প্রদানের নির্দেশনা সবসময়েই নামাজ (সালাত) পড়ার নির্দেশের পরপরই দেওয়া হয়েছে। মহানবী যাকাতকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জাকাত কোনক্রমেই আয়করের বিকল্প নয়। এটা মূলধনের উপর ধার্য হয়। বিনিয়োগ হোক আর নাই হোক, যাকাত প্রতিবছর দিতে হয়। তাই, ইসলামী বীমা তহবিলের ব্যবস্থাপকদের জন্য বিচক্ষণতার কাজ হলো উৎপাদনের জন্য তা বিনিয়োগ করা। এর ফলে সকল সম্পদ ও শক্তি অব্যাহতভাবে উৎপাদনশীল খাতে নিয়োজিত থাকতে উৎসাহিত হয়। ইসলামী বীমা পদ্ধতিতে যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়নের ফলে অর্থনীতির ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

ইসলামী বীমা শিল্পের সম্ভাবনা এবং প্রত্যাশা

সমসাময়িক ইসলামী দেশগুলোতে নীতিনির্ধারকগণ ইসলামী বীমার ভূমিকা এবং গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। এমনকি প্রচলিত বীমাও খুব সন্তোষজনক পর্যায়ে বিকশিত হয়নি।

আমরা যদি ইসলামী দেশগুলোর বীমার ঘনত্বের সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বীমা ঘনত্বের তুলনা করি, তবে আমাদের প্রকৃত অবস্থান বুঝতে পারবো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় জিডিপিতে বীমার প্রিমিয়ামের শেয়ার যেখানে ২০% এর বেশি, সেখানে নাইজেরিয়ায় ৩.৫%। বাংলাদেশে বীমার অন্তর্ভূক্তি ১% এর মত। জাপানে মাথাপিছু প্রিমিয়াম প্রায় ৩৯০০ মার্কিন ডলার এবং মালয়েশিয়ায় তা প্রায় ১৪০ মার্কিন ডলার ও বাংলাদেশে তা ২ (দুই) মার্কিন ডলারেরও কম। এর মানে দাঁড়াচ্ছে ইসলামী দেশগুলোতে বীমা এবং সেই সাথে ইসলামী বীমার বিকাশের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

ইসলামী বীমা বাজার অর্থনীতির গতির সাথে তাল মিলিয়ে বিকশিত হয়। যদিও ইসলামী বীমার চাহিদা আয় ও সম্পদের প্রতিফলন, তবুও লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ইসলামী দেশগুলোতে ঝুঁকি সচেতনা খুবই কম। উম্মাহ'র কল্যাণ এবং জীবনমানের উন্নয়নে ইসলামী বীমা কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে, সেব্যাপারে নীতিনির্ধারকদের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে আরো সমঝোতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

ইসলামী বীমা ব্যবস্থা ব্যক্তি, পরিবার এবং সংগঠনের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা ও স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে প্রণীত। একই সময়ে ইসলামী বীমা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানগুলো বিশালাকারের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, যার ফলে সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রকল্প ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উদ্যোক্তার ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ইসলামী বীমা সুনির্দিষ্টভাবে ইসলামী দেশগুলোতে মূলধন ও সম্পদের আরো সাবলীল বিকাশে সহায়তা করতে পারে। ক্রমবর্ধমান ইসলামী বীমা ও পুনঃইসলামী বীমা বাজার ইসলামী দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি হাতিয়ার। বাস্তবিকই, প্রচলিত বীমার একটি বিকল্প হিসেবে ইসলামী বীমার বিকাশ ইসলামী দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। অন্যদিকে, অর্থনীতির বিকাশ ও উন্নয়নে ইসলামী বীমা শিল্পও বিকশিত হবে।

এটা পুরোপুরি সত্য মুসলমানদের জন্য ইসলামী বীমা হলো প্রচলিত বীমার মানানসই বিকল্প। তবে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো উম্মাহ'র উন্নয়নে এটা কিভাবে সর্বাত্মক সহায়তা করতে পারে? সন্দেহ নেই যে তাকাফুলের বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে এবং আগামী বছরগুলোতে এর সম্ভাবনা অবশ্যই আরো বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য, ইসলামী বীমার ভবিষ্যত অনেকাংশেই নির্ভর করছে ইসলামী অর্থনীতির বিকাশ এবং ইসলামী দেশগুলোর অবস্থার আলোকে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা বিদ্যমান পরিস্থিতির কতটুকু ব্যবহার করতে পারবে তার ওপর।

মুসলমানদের ধর্ম এবং সংস্কৃতি ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি ইতিবাচক দিক। তবে, সেটাই সব নয়। ইসলামী দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারীদের পেশাগত দক্ষতা, যথার্থ পরিকল্প প্রণয়ন এবং বিতরণ ব্যয়সহ ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস ইসলামী জীবনবীমার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ইসলামী সাধারণ বীমার বিকাশে যেসব উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ এবং সেই সাথে ঝুঁকির আশংকা এবং মাত্রার হার। অবশ্যই ঝুঁকি সচেতনতা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ইসলামী জীবনবীমা এবং ইসলামী সাধারণ বীমা উভয়টির বিকাশ নির্ভর করে বিপনণ কৌশল, নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি এবং উন্নত তথ্য প্রযুক্তি গ্রহণের ওপর। ইসলামী দেশগুলোতে ইসলামী বীমার সরবরাহ অধিকাংশে নির্ভর করে নীতিনির্ধারকদের সমর্থন ও সহমর্মিতার ওপর। ইসলামী বীমার ধারণাটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা না গেলে, আইনপ্রণয়নকারীরা হয়তো ইসলামী বীমার বিকাশের সুপারিশ করবে না আর সেক্ষেত্রে প্রচলিত বীমা আইনের অধীনে ইসলামী কোম্পানীগুলো পরিচালিত হলে গ্রাহকদের মধ্যে স্রেফ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। যেহেতু কার্যকর বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা সরবরাহের গতিশীলতায় বিরাট

www.pathagar.com

ভূমিকা পালন করে তাই ইসলামী দেশগুলোর বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো সপ্রদায়ের কল্যাণ ও সার্বিকভাবে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামী বীমার বিকাশের জন্য যথাযথ আইন ও বিধান প্রণয়ন করা।

এটা সংশয়হীনভাবে বলা যায়, প্রয়োজন এবং সরবরাহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই ইসলামী বীমার গ্রহণযোগ্যতা নিরূপিত হবে। ইসলামী বীমার চাহিদার দিকে ঝোঁক সৃষ্টি হবে তখনই যখন ইসলামের ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নতুন পণ্যের উদ্ভাবন ঘটবে। অধিকন্তু, ইসলামী দেশগুলোতে ব্যক্তি ও সামষ্টিক উভয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিরও আশা করা যায়। উপরোন্তু, ইসলামী বীমার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপকতা বৃদ্ধি আসবে ইসলামী বীমার সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে। চাহিদা ইতিমধ্যেই বিদ্যমান। এর ব্যাপ্তি কতটুকু হবে তা নির্ভর করবে তার সরবরাহ রেখাটির গতিশীলতার ব্যাপ্তির ওপর।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ১৩৫টিরও অধিক 'তাকাফুল' বা ইসলামী বীমা কোম্পানী রয়েছে। বিগত ত্রিশ বছরে ইসলামী বীমা (তাকাফুল) প্রধানত সুদান, মিসর, সৌদি আরব, ইরান, কুয়েত, লেবানন, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, তিউনেশিয়া, বাহামা, বেলজিয়াম, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইটজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিকশিত হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, ইসলামী বীমা একই সাথে অ-মুসলিম দেশগুলোতেও দেখা যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সিঙ্গাপুরে মুসলমান জনসংখ্যা পাঁচ লাখেরও কম (মোট জনসংখ্যার ১৫%) কিন্তু সেখানে বর্তমানে অন্তত দুটি প্রতিষ্ঠান ইসলামী বীমা স্কিম পরিচালনা করছে। অ-মুসলমান দেশগুলোতে প্রচলিত বীমা পণ্যের তুলনায় তাদের মান ভাল প্রমাণ করতে পারলে স্কিমটি আরো বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। মুসলমান দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়াকে ইসলামী বীমার দিক থেকে এককভাবে সবচেয়ে সফল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সিঙ্গাপুরে বর্তমান ইসলামী বীমা পলিসি হোল্ডারদের উল্লেখযোগ্য অংশ হলো অ-মুসলমান। শ্রীলংকায় অমুসলিম গ্রাহক সেদেশের ইসলামী বীমা কোম্পানীর মোট গ্রাহকের ১৫%।

মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং বীমা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপক অ-সচেতনতা বিদ্যমান। বিশ্বের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিকাংশ দেশে বীমা এখনো সে দেশের জি.ডি.পি'র মাত্র এক শতাংশেরও কম। অবশ্য বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে মুসলিম দেশগুলো এবং যেসব দেশে মুসলমান জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার অন্তত ১০% থেকে ১৫% সেখানে সাধারণ বীমা ও জীবনবীমার

www.pathagar.com

বাজার অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। সেখানে প্রচলিত বীমার পাশাপাশি ইসলামী বীমার বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য এটা তখনই সম্ভব যখন বীমার নতুন ধরণটি বিদ্যমান প্রচলিত বীমা পলিসির তুলনায় অন্তত সমান এবং অপেক্ষাকৃত ভাল মূল্যমানের ব্যবস্থা করতে পারে।

তবে ইতোমধ্যেই ইসলামী ব্যাংকিং এর মতো ইসলামী বীমাও নির্ভরযোগ্য বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শরীয়ার নীতিমালা অনুসরণের কারণে ইসলামী বীমা ব্যবসায় আগামী দিনগুলোতে মুসলমান এবং অমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই অধিকতর আবেদন সৃষ্টিকারী হয়ে উঠবে।

অর্থনৈতিকভাবে সমর্থ এবং প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম বিকল্প বীমা ব্যবস্থা হিসেবে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী বীমার উজ্জ্বল সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ রয়েছে। কারণ অধিকাংশ মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকিং আছে এবং ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রয়োজনীয় পরিপূরক হিসেবে ইসলামী বীমাকে স্বাগত জানানো হয়। ইসলামী ব্যাংকিং পুরোপুরি শরীয়াহ ভিত্তিক হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের প্রয়োজনে ইসলামী বীমা গ্রহণ করবে। তাই, ইসলামী ব্যাংকিং এর মতো ইসলামী বীমাও গ্রহণযোগ্য বাস্তবতা হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে এবং প্রায় সকল মুসলিম দেশে দৃঢ়ভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি মুসলিম দেশগুলোর আস্থা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশ, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং তুরস্কের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা তাদের দেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত সহযোগিতামূলক প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ১-২ মার্চ ঢাকায় দ্বিতীয় ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাষ্ট্র প্রধানগণ ডি-৮ ভুক্ত দেশগুলোর প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার বিদ্যমান পুনঃইসলামী বীমা কোম্পানীর সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করে। এতে আরো সমঝোতা হয় যে ইসলামী বীমা ও পুনঃইসলামী বীমার বিকাশের জন্য কার্য-প্রণালী এবং যথাযথ কৌশল প্রণয়নের জন্য এসব দেশের বিশেষজ্ঞগণ সপ্রতি কায়রোতে মিলিত হবে। এটা আশাব্যঞ্জক ঘটনা যে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিতভাবে সেমিনার ও সম্মেলন আয়োজন করছে এবং ইসলামী বীমাকে নির্ভরযোগ্য করার জন্য তথ্য ও মতামত বিনিময় করছে।

২০০৪ সালের জুলাই মাসে ডি-৮ দেশগুলোর নিয়ন্ত্রকগণ মালয়েশিয়ায় মিলিত হন এবং সেখানে ইসলামী বীমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

অবকাঠামো উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রে দুটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হবে এবং তার নেতৃত্বে থাকবে যথাক্রমে মালয়েশিয়া ও মিসর। ২০০৪ সালের জুলাই মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে মালয়েশিয়ার ব্যাংক নেগারার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় এবং এতে অন্যান্য কিছুর সাথে ইসলামী সম্মেলন সংস্থাভুক্ত (ওআইসি) দেশগুলোর ইসলামী বীমা ও পুনঃইসলামী বীমা ব্যবসায়ের বিকাশ ও সম্প্রসারণের সহযোগিতার কথা বলা হয়। ২০০৫ সালের জুলাই মাসে ওআইসি সদস্য দেশগুলোর নিয়ন্ত্রক ও ইসলামী বীমা অনুশীলনকারীদের মধ্য থেকে ১২ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। সম্প্রতি কমিটিটি ইসলামী বীমা ও পুনঃইসলামী বীমা উন্নয়নের শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা দূরীকরণের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তাব করে। কর্মপরিকল্পনাটি নিম্নলিখিত ৮টি প্রধান ক্ষেত্রে বিভক্ত:

সম্ভাব্য এলাকায় ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।

সারা বিশ্বে ইসলামী বীমা কোম্পানীর দ্রুততর বিকাশের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ আইন, বিধান এবং শরীয়াহ কাঠামো প্রতিষ্ঠা।

১. দেশে দেশে বিদ্যমান ইসলামী বীমা বাজার ও বিনিয়োগের উন্নয়ন।

২. গ্রাহকদের ব্যাপকতর প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ইসলামী বীমা পণ্যের উন্নয়ন।

৩. ইসলামী বীমা কার্যক্রমে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জনশক্তির মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী বীমার সুবিধার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি।

৫. ওআইসি দেশগুলোর মধ্যে পুনঃইসলামী বীমা ব্যবস্থার সামর্থ্য ও সহায়তা বৃদ্ধি।

৬. ইসলামী বীমা শিল্পে শরীয়াহ এবং টেকনিক্যাল বিষয়াবলীতে বিদ্যমান বিতর্কিত বিষয়াদির সংশোধন।

সরকারের ভূমিকা

একটি দেশের বীমা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণে সরকার সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামীকরণ দুইভাবে করা যেতে পারে। প্রথম পন্থা হতে পারে, পুরো বীমা খাতকে ইসলাম ভিত্তিক নতুন কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় পন্থা হতে পারে, বর্তমান ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে নতুন কিছু ইসলামী বীমা কোম্পানীকে অনুমতি প্রদান বা কিছু পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী পদ্ধতিতে তাদের ব্যবসায় রূপান্তর করা। এই দুটি পন্থার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রথমটির ক্ষেত্রে, সরকার ইসলামী শরীয়ার আলোকে বীমা শিল্পকে পুনঃসংগঠিত করার জন্য ব্যাপকভিত্তিক সুবিন্যস্ত এবং সুনির্দিষ্ট আইন সম্বলিত অধ্যাদেশ জারি করতে পারে। এই আইনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহায়তার সত্যিকারের চেতনার প্রতিফলন থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই বীমা ব্যবস্থায় বিদ্যমান অনৈসলামিক উপাদান (সুদ, জুয়া, অস্পষ্টতা ইত্যাদি) অনুমোদিত হবে না। মালয়েশিয়া, বাহরাইন এবং সুদানের মতো কয়েকটি ইসলামী দেশে ইতিমধ্যেই অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে এ ধরনের আইন বা বিধি বলবৎ করেছে।

যদি সরকার দ্বিতীয় পন্থাটি গ্রহণ করে, তবে ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী নতুন নতুন কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিদ্যমান বীমা অ্যাক্টের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে এসব কোম্পানীকে কর-রেয়াতসহ কিছু কিছু উৎসাহমূলক সুযোগসুবিধা প্রদান করতে হবে। এতে করে বিদ্যমান প্রচলিত বীমা কোম্পানীগুলো ইসলামী পদ্ধতিতে তাদের ব্যবসা নতুন করে পরিচালিত করতে পারবে। প্রচলিত বীমা ব্যবসাকে ইসলামী বীমায় পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরের জন্য সরকার একটি সময়সীমাও বেঁধে দিতে পারে।

সরকার আরেকটি কাজ করতে পারে তা হলো পুনঃবীমা ব্যবস্থার যোগান দেওয়া। বর্তমানে বীমা কোম্পানীগুলো দু'প্রধরণের পুনঃবীমা ব্যবস্থায় জড়িত: ১. জাতীয় পুনঃবীমা কর্পোরেশনের সাথে এবং ২. বিদেশী বীমা কোম্পানীর সাথে। উভয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ও বীমা কোম্পানীর মধ্যকার ব্যবস্থার মতোই বীমা কোম্পানীকে পুনঃবীমা কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়, যাতে বীমার সকল অনৈসলামিক উপাদানের সম্পৃক্ততা থাকে। ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোর জন্য পুনঃবীমা সেবা সম্প্রসারণের জন্য সরকার একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা করতে পারে, এবং সকল ইসলামী বীমা কোম্পানী এই তহবিলে তাদের প্রিমিয়ামের একটি অংশ প্রদান করতে পারে। এই অংশটি বিভিন্ন পলিসির জন্য বিভিন্ন হতে পারে। এই তহবিলের লক্ষ্য হওয়া উচিত দাবি মেটানোর ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানীগুলোকে সহায়তা করা। এই তহবিলের একটি অংশ ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী লাভজনক খাতে বিনিয়োগ হতে পারে এবং লাভ তহবিল ও বীমা কোম্পানীর মধ্যে বণ্টিত হতে পারে।

ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাংকিং ও বীমা দুটি প্রধান খাত। ব্যাংকিং খাতটি সঞ্চয়কারীদের জমা গ্রহণ করে এবং উদ্বৃত্ত তহবিল অর্থায়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে বীমা ব্যবসা, দুর্ঘটনা, দুর্যোগ ও মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাংকিং ও বীমার সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে চলতে পারে না। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থা সুদ ভিত্তিক ও এর সাথে সম্পর্কিত থাকায় মুসলমানরা শরীয়ার সাথে তা সাংঘর্ষিক হওয়ায় সেটা গ্রহণ করতে পারে না।

ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বীমার মধ্যে একটি স্বাভাবিক ও সহজাত সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের সফলতার একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে ইসলামে অনুমোদিত কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে তার ঝুঁকি লাঘব করা। ইসলামী বীমা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এটা সম্ভব। অন্যদিকে ইসলামী বীমার অগ্রগতি ইসলামী ব্যাংকিং এর ব্যাপক বিকাশের উপর নির্ভরশীল।

সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শরীয়ার নীতিমালার অনুসারী হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বীমা ব্যবসা আগামী দিনগুলোতে মুসলমান এবং অ-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই অধিক আবেদন সৃষ্টি করবে। ইসলামী ব্যাংকিং এবং ইসলামী বীমা বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বীমা পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ও বাধা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. অধিকাংশ মুসলিম প্রধান দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথাযথ আইনগত কাঠামোর অভাব।
২. শরীয়ার বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য যোগ্য প্রশিক্ষিত জনশক্তির অভাব।
৩. শরীয়াহ ভিত্তিক নিরাপত্তার অভাব।
৪. সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের অভাব।
৫. ব্যবস্থাপনা, উদ্যোক্তা ও নিয়ন্ত্রক ও আইনগত কর্তৃপক্ষের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব।
৬. জনসচেতনতার অভাব।
৭. ব্যবসা ও বাণিজ্যে শরীয়ার নীতিমালার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা।
৮. ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপক প্রাধান্য।
৯. সরকারী সহায়তার অভাব।

ইসলামী ব্যাংকগুলো ইতোমধ্যেই ব্যাংকিং খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। অন্যদিকে ইসলামী বীমা ব্যবসা সবেমাত্র শুরু হয়েছে এবং আগামী দিনগুলোতে বীমা খাতে তা ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে বলে আশা করা যায়। ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা উভয়ের কাঙ্খিত পর্যায়ে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে সারা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমার মধ্যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া

www.pathagar.com

প্রয়োজন। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পারস্পরিক বিকাশের জন্য ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীগুলো যৌথভাবে নিম্নলিখিত কর্মকৌশল গ্রহণ করতে পারে:

১. ব্যাংকিং ও বীমা কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালনার জন্য আইনগত কাঠামো পরিবর্তনের জন্য প্রয়াস চালানো।
২. জনশক্তিকে প্রশিক্ষিত করার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।
৩. জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির আয়োজন।
৪. ইসলামী অর্থ ও মূলধন বাজার উন্নয়ন।
৫. ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বীমা উভয়ের জন্য কেন্দ্রীয় শরীয়াহ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা।
৬. মালয়েশিয়ার মতো, ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো একই বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের আওতায় করার উদ্যোগ।
৭. ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোর মধ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক থাকা উচিত।
৮. আরো বেশি সংখ্যক ইসলামী বীমা কোম্পানী ও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।

ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বীমা ব্যবস্থার বিশাল সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ রয়েছে। সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীগুলোর সফল সূচনা ও কার্যক্রমে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য, প্রতিযোগিতামূলক এবং টেকসই। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধাসমূহের ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পরিক্রমায় ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বীমার ক্রমবর্ধমান ও সফল বাস্তবায়ন প্রমাণ করেছে বর্তমান শতাব্দী হতে যাচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমার শতাব্দী। সেই সাথে সবার জন্য ন্যায়সংগত ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপক অর্থে সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য ইসলামী মূল্যবোধ সময়ের দাবি।

ইতোমধ্যেই ইসলামী ব্যাংকিং এর মতো ইসলামী বীমা যুক্তিসংগত বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শরীয়াহ নীতিমালার অনুসারী হিসেবে ইসলামী বীমা ব্যবসা আগামী দিনগুলোতে মুসলমান ও অ-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই অধিকতর আবেদন সৃষ্টিকারী হবে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ইসলামী বীমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এটা অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্যশীল এবং মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিকল্প বীমা। যেসব মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে, সেখানে ইসলামী

www.pathagar.com

ব্যাংকিং এর প্রয়োজনীয় পরিপূরক হিসেবে ইসলামী বীমাও সৃষ্টি করা হচ্ছে। কারণ ইসলামী বীমা যদি ইসলামী ব্যাংকগুলো বীমা ব্যবসায় গ্রহণ না করে তবে সেগুলো পুরোপুরি শরীয়াহ ভিত্তিক হতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকের মতো ইসলামী বীমাও নিজেকে যৌক্তিক বাস্তবতা হিসেবে প্রমাণ করেছে এবং প্রায় সকল মুসলিম দেশেই দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব দেশের সরকারের উচিত ইসলামী বীমার বিকাশ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

সুপারিশকৃত পদক্ষেপসমূহ

বিশ্বব্যাপী ২.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বীমা শিল্পের একটি অংশ হিসেবে তাকাফুল বা ইসলামী বীমার ব্যবসা আনুমানিক ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মাত্র। অবশ্য ইসলামী বীমা বিশ্ব বীমা বাজারে সবচেয়ে বিকাশমান ক্ষেত্র। বর্তমানে ইসলামী বীমার বিকাশের হার ২০% থেকে ২৫%, যেখানে বিশ্বে বীমা ব্যবসার গড় বিকাশ হচ্ছে বছরে ৫% থেকে ৬%। তাকাফুলের বৃদ্ধির এই উর্ধ্বগতি থাকতো না যদি না চাহিদার অভাব থাকতো এবং ইসলামী বীমার গ্রাহক ও উদ্যোক্তা উভয়ে সম্ভাব্য লাভের প্রত্যাশা না দেখতে পেত। ইসলামী বীমার সুযোগ এবং সম্ভাবনা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এখন যা প্রয়োজন তা হলো ইসলামী বীমা ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আরো বেশি সচেতনতা। এ কারণে ইসলামী বীমা শিল্পের প্রয়োজন বীমা ও শরীয়াহ উভয় দিক থেকে শক্তিশালী বিপনণ এবং কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় এর প্রয়োগের ব্যাপারে আলোকপাত করা।

ইসলামী বীমা শরীয়াহ ভিত্তিক, শুধুমাত্র এজন্যই ইসলামী বীমা ব্যবসায়ের দিকে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি, সেই সাথে এর উন্নত ও ন্যায়সংগত বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ধর্ম দিয়ে সূচিত হলেও এই বিষয়টি ধর্ম-নির্বিশেষে সবাইকে আকর্ষণ করে। যেহেতু সুযোগ কোনভাবেই হাতছাড়া করা উচিত নয়, তাই ইসলামী বীমার সাথে সম্পর্কিতদের উচিত হবে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া। কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১. গ্রাহকের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচি তৈরি করা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে স্বচ্ছতা বাড়াবে, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং গ্রাহকের দাবী পাওয়ার পথ সহজ হবে।

২. তাকাফুল শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বীমা এসোসিয়েশন গঠন, যার মাধ্যমে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো জরুরি ভিত্তিতে তাদের সমস্যা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

www.pathagar.com

৩. ইসলামী বীমা শিল্পকে আরো ব্যাপকভাবে বিকশিত করার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন অধিকতর উৎপাদনশীলতা। ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বাড়ানো।

৪. দ্রুত বিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিবেশে ইসলামী বীমা শিল্পের প্রয়োজন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নতুন নতুন ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত সুযোগগুলো কাজে লাগানো। ইসলামী ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে চমৎকার সহযোগিতা বা কৌশলগত মিত্রতা স্থাপন এবং গ্রাহকদের সাথে আরো গাঢ় সখ্যতা সৃষ্টি ও মজবুত করার ফলে এই লক্ষ্য পূরণে কার্যকর অবদান রাখবে।

৫. নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নীতিমালা প্রণয়নে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো অভ্যন্তরীণ কাঠামোর কার্যকারিতা, বিশেষ করে কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অনুশীলনের দিকে বেশি নজর দিতে হবে। বীমা শিল্পের সম্ভাব্য অবদান বৃদ্ধির জন্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের উচিত হবে কার্যক্রমগত দক্ষতা উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

যদিও ইসলামী বীমা শিল্প অত্যন্ত গতিশীলতার সাথে ব্যাপকভাবে বিকশিত হচ্ছে, কিন্তু তবুও সাপ্রতিক বছরগুলোতে বাজার উদারিকরণ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং গ্রাহকের প্রত্যাশা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক নানা উপাদান নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন, কার্যকর সার্ভিস ও আরো উন্নত দক্ষতার অনুঘটক হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

বিতরণ চ্যানেলগুলোর কার্যকর ব্যবহার, গতিশীল বিনিয়োগ কৌশল এবং ইসলামী বীমার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান জনসচেতনতা অবশ্যই ইসলামী বীমা বিকাশে গতিশীলতা প্রদান করবে। ইসলামী বীমা শিল্পের উন্নয়নের উদ্যোগ তথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, গতিশীলতা এবং আরো স্থিতিস্থাপকতা আসবে নিয়ন্ত্রণকারী, শিল্প ও বাজার সহযোগী তথা ইসলামী ব্যাংক ও অ-ব্যাংকিং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে। উম্মাহ'র কল্যাণের লক্ষ্যে ও শরীয়াহ ভিত্তিক ন্যায়সংগত ও কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের জন্য বিশ্বমানের প্রগতিশীল ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান একান্ত কাম্য।

ইসলামী দেশগুলোর জনসাধারণ শরীয়াহ ভিত্তিক কার্যক্রমে আরো বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আরো বেশি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হওয়ায় বাজার পর্যবেক্ষকরা ইসলামী বীমা শিল্পের নাটকীয় বিকাশের ভবিষদ্বাণী করছে। অধিকন্তু, নৈতিক প্রকৃতির প্রডাক্ট হওয়ায় ইসলামী বীমা মুসলমান ও অমুসলমান সবাইকে আকৃষ্ট করছে। তাই ইসলামী বীমা প্রডাক্টের সম্ভাবনাময় চাহিদা রয়েছে এবং ইসলামী বীমা শিল্প এখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে।

www.pathagar.com

ষোল.
তাকাফুল আইন ও বিধির প্রয়োজনীয়তা

তাকাফুল মূলত সহযোগিতার একটি চুক্তি। তাকাফুল প্রতিষ্ঠান মুদারিব বা ওয়াকিল হিসেবে আর্থিক সুবিধা পায়। তাকাফুল প্রতিষ্ঠান প্রশাসক হিসেবে কাজ করে এবং তাকাফুল তহবিল থেকে বীমার সুবিধাসমূহ (অর্থনৈতিক সহযোগিতা) পলিসি গ্রাহককে প্রদান করে। তাকাফুল তহবিলের ঘাটতির ক্ষেত্রে তাকাফুল প্রতিষ্ঠান হতে ঘাটতি পূরণের জন্য তাকাফুল তহবিলে সুদমুক্ত ঋণের যোগান দিতে হয়। শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল পলিসিহোল্ডারদের তহবিল থেকে আলাদা রাখতে হয় এবং শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত শুধুমাত্র শেয়ারহোল্ডারদের তহবিলে রাখতে হয়। তাকাফুল ও প্রচলিত বীমার এসব পার্থক্য স্পষ্টভাবেই বিধিব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। যে সব ক্ষেত্রে বীমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে তাকাফুল বা ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে তা নিম্নে বর্ননা করা হলো :

(ক) তাকাফুল তহবিলের সম্পদরাজি শরীয়াহ'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করা জরুরী। বীমা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বিষয়টি তা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা এবং তাকাফুলের সকল কার্যক্রম শরীয়াহ'র বিধান ও নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা। গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষা করা বীমা কর্তৃপক্ষের অত্যাবশ্যক কাজ। কারণ বীমা গ্রাহকগণ বিশ্বাস করে তাকাফুলের কার্যক্রম শরিয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। অতএব বীমা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে গ্রাহকদের এই আস্থা অটুট রাখা। এ কারণেই বীমা আইনে শরীয়াহর আলোকে ইসলামী বীমা ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে পথ ও পদ্ধতি সমুহের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন।

(খ) ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানিগুলো (পারিবারিক তাকাফুল প্রতিষ্ঠান) 'সুনির্দিষ্ট সুবিধার' পরিবর্তে 'সুনির্দিষ্ট চাঁদা'র ভিত্তিতে কাজ করে। এতে বোঝা যায়, ইসলামী জীবন বীমার পলিসি প্রচলিত জীবন বীমার চেয়ে ভিন্ন। এজন্য, মূলধনের পর্যাপ্ততা এবং উদ্বৃত্ত অর্থবন্টন উভয় ক্ষেত্রেই তাকাফুলের মানদন্ড ভিন্ন ভাবে নিরুপন করা প্রয়োজন। যেহেতু পলিসিহোল্ডারগণ (জীবন ও অ-জীবন উভয় ক্ষেত্রে) উদ্বৃত্ত ভাগাভাগি করে নেন, তাই কিভাবে এবং কত পরিমাণে ভাগাভগি হবে তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু, কোম্পানি সুদমুক্ত পদ্ধতি পালনে কতটা সমর্থ তারও মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। অতএব, বীমা কর্তৃপক্ষকে মূলধনের পর্যাপ্ততা বিবেচনার সময় তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক মানদন্ডে করতে হবে।

www.pathagar.com

(গ) র্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত বীমা কোম্পানীগুলোও তাকাফুল ব্যবসা পরিচালনা করছে এবং প্রস্তাবিত বীমা আইনে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সনাতন বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহ তাকাফুল শাখার মাধ্যমে বা প্রকল্পের মাধ্যমে তাকাফুল কার্যক্রম পরিচালনা করে। জীবন বীমার চুক্তি দীর্ঘমেয়াদী বিধায় এ যাবৎ বিক্রয়কৃত বীমা সমূহ পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় স্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। তাকাফুল কার্যক্রম অবশ্যই প্রচলিত বীমা থেকে ভিন্ন হতে হবে, সাধারণ মানুষ ইসলামের নামে যেন প্রতারিত না হয় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত বীমা আইনে এটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে এসব ক্ষেত্রে শরীয়ার বিধান কি ভাবে পরিচালিত হবে। তাদের পক্ষে ইসলামী বীমা পরিকল্প সমূহ পৃথক পরিচালনার জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিতে হবে। অন্যথায় গ্রাহকগণ বিভ্রান্তির শিকার হবেন।

(ঘ) তাকাফুল কোম্পানিতে "শরীয়াহ কাউন্সিল" পরিচালনা কাঠামোর অংশবিশেষ হিসেবে বিবেচিত হয়। বীমা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শরীয়াহ সদস্যদের উপযুক্ততা এবং আচরণবিধি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সদস্যরা যদি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন অবস্থানে সংশ্লিষ্ট থাকেন, তখন যেন কোন স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সদস্যদের দায়দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে তত্ত্বাবধায়ক (সুপারভাইজরি) কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত হবে কিনা সে বিষয়টিও স্পষ্ট করতে হবে। তাকাফুল কার্যক্রমে শরীয়াহ'র নিরীক্ষা (অডিট) একটি স্বাভাবিক বিষয়। শরীয়াহ্ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বীমা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কি হবে তার দিক নির্দেশনা প্রয়োজন। শরীয়াহ্ কাউন্সিলের গঠন, দায়িত্ব ও কার্যক্রম সম্পর্কে বীমা আইনে বা বিধিতে বিস্তারিত ভাবে সন্নিবেশ করা দরকার।

(ঙ) তাকাফুল কার্যক্রম শুরুর সময় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে যাতে শেয়ারহোল্ডারদের চলতি মূলধনের (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। যেহেতু পলিসিহোল্ডার ও শেয়ারহোল্ডারদের হিসাব আলাদা করতে হবে সেহেতু শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল থেকে কোন্ কোন্ খাতে কত খরচ করা হবে এবং পলিসিহোল্ডারদের তহবিল থেকে কত পরিমাণ ব্যবস্থাপনা ব্যয় করা হবে, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত করতে হবে। এটা অবশ্য তাকাফুল মডেলের (ওয়াকালা/মুদারাবা/ওয়াকালা ও মুদারাবার সমন্বিত) উপর নির্ভর করবে। বীমা কর্তৃপক্ষকে বিধির দ্বারা এসব ব্যয় সম্পর্কে নির্দেশনা দিতে হবে এবং শরীয়াহর আলোকে বিষয়গুলো নিরুপিত হতে হবে।

(চ) তাকাফুল প্রতিষ্ঠান তার সম্পদ কিভাবে বিনিয়োগ করবে, শরীয়াহ কাউন্সিল সে ব্যাপারে একটি নির্দেশনা দিয়ে থাকে। বীমা কর্তৃপক্ষের বিনিয়োগ সংক্রান্ত

www.pathagar.com

বিধিমালা তাকাফুলের জন্য তাই ভিন্ন হতে হবে। সার্বিকভাবে সম্পদের ঝুঁকি মূল্যায়ন ভিন্ন হওয়ায় সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিও ভিন্ন হতে পারে। তাকাফুলের এসেট প্রোফাইল প্রচলিত বীমার চেয়ে ভিন্ন। সুতরাং, বীমা কর্তৃপক্ষকে ইসলামি বিধিমালার আওতায় যথার্থ ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে। শরীয়াহ বিষয়ে পন্ডিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে এগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং উপযুক্ত প্রবিধান/ বিধি বা আইনের ধারার সাহায্যে এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া জরুরী।

(ছ) তাকাফুলের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বচ্ছতা। তাকাফুল প্রতিষ্ঠানকে তার কর্মপ্রণালী ও কার্যক্রম পলিসিহোল্ডারদের কাছে পুরোপুরি প্রকাশ করতে হবে। পলিসিতে কোন্ কোন্ ঝুঁকি কভার করবে, কী কী সুবিধা প্রদান করা হবে, পলিসিহোল্ডারদের উপর কোন্ কোন্ দায়দায়িত্ব বর্তাবে, পলিসিহোল্ডারদের তহবিল থেকে কোন্ কোন্ খরচ কেটে নেওয়া হবে, উদ্বৃত্ত বন্টনের বিধান কি হবে বা শেয়ারহোল্ডারদের কত হারে ব্যবস্থাপনা ব্যয় বহন করতে হবে, সেগুলো পলিসি দলিলে/প্রস্তাবপত্রে/ব্রুশিয়রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। প্রচলিত বীমা হতে তাকাফুলের ভিন্নতা কি এবং কতটুকু তা পলিসিহোল্ডারদের কাছে বিশদ ব্যাখ্যা করা জরুরী। বীমা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে এটা নিশ্চিত করতে হবে, যেন প্রচলিত বীমা কোম্পানি সমূহ কোন ভাবে নিজেকে তাকাফুল কোম্পানি হিসেবে পরিচিত করতে বা তাদের পণ্য শরীয়াহর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দাবি করতে না পারে।

(জ) তাকাফুলের অনেকগুলো মডেল রয়েছে। বীমা কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি মডেলের জন্য মানদণ্ড বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। এই মানদণ্ড অনুযায়ী পলিসিহোল্ডার ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে এবং প্রতিটি গ্রুপের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। একটি তাকাফুল প্রতিষ্ঠান যে মডেল অনুসরণ করছে, অংশগ্রহণকারীর কাছে কি ধরনের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করতে হবে অনেকাংশে সেই মডেলের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করবে। যেহেতু তাকাফুল ব্যবস্থায় একটিমাত্র মডেল থাকার সম্ভাবনা খুবই কম, তাই নিয়ন্ত্রণকারী বীমা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই বিভিন্ন মডেলের মধ্যে পার্থক্যরেখা টানতে হবে এবং মালয়েশিয়া ও অন্যান্য দেশের মতো সবগুলো শরীয়াহ ভিত্তিক মডেলের ভিত্তিতে কাজ করার সুযোগ রাখতে হবে। উপযুক্ত আইন, বিধি বা প্রবিধান সমুহ এই সমস্ত বিষয়ের আলোকে প্রণয়ন করা জরুরী।

প্রস্তাবিত তাকাফুল আইনের ভাগ্য

প্রচলিত বীমা কোম্পানি থেকে তাকাফুলের ভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বীমা নিয়ন্ত্রণকারী (রেগুলেটরি) কর্তৃপক্ষকে ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে যেসব কাজ করতে

www.pathagar.com

হবে আমরা শুধুমাত্র তার কয়েকটা উদাহরণ তুলে ধরেছি। প্রস্তাবিত নতুন বীমা আইনে বা এর অধীনে প্রণীতা প্রবিধান ও বিধিসমুহ তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র নির্বিচারে ব্যবহৃত হলে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ও জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাই বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত নতুন বীমা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি একটি প্রচলিত বীমার জন্য এবং অপরটি ইসলামি বীমার জন্য পৃথক খসড়া আইন প্রণয়ন করেছিল। বিশেষজ্ঞ কমিটি বীমা 'নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষে'র জন্য নতুন (ইন্সুরেন্স রেগুলেটরি অ্যাক্ট) খসড়াও দাখিল করেছিল এবং এতে প্রচলিত ও তাকাফুল উভয় ধরণের বীমা কোম্পানির জন্য একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সুপারিশ করেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে বীমা অধ্যাদেশ এবং রেগুলেটরি অথোরিটি অ্যাক্টটি গ্রহণের সবুজ সংকেত দেওয়া হয়। কিন্তু পরিষদ অত্যন্ত কাঙ্খিত প্রস্তাবিত তাকাফুল অ্যাক্টের দিকে যথার্থ নজর দেয়নি। অথচ বীমা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি নিশ্চিত করার জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। সব ক্ষেত্রে যবাবষ ঢ়ষধুরহম ভরবষফ এর কথা জোরেশোরে উচ্চারিত হলেও ইসলামী বীমার জন্য প্রণীত পৃথক আইনটি বর্তমানে হিমাগারে পাঠানো হয়েছে বলে প্রতীয়মান।

আমরা মনে করি বাংলাদেশে তাকাফুল ব্যবসায় বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের এটাই সবচেয়ে ভাল সময়। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, জনগণ তাকাফুল ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে আছে আগ্রহভরে এবং তারা উপযুক্ত আইন, তাকাফুল প্রবিধান ও বিধি সমূহের প্রতীক্ষায় আছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৭০ এরও বেশি উদ্যোক্তা তাকাফুল কোম্পানি হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছে। এটা স্পষ্টভাবে ইংগিত দেয়, আগামী দশকে তাকাফুল ব্যবস্থা প্রচলিত বীমা কোম্পানিগুলোকে ছাপিয়ে যাবে। তাই যৌক্তিক ভাবে বলা যায় তাকাফুল শিল্পকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিকাশের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা ও আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সুদান, মালয়েশিয়া, বাহরাইন, ইরান, পাকিস্তানের মতো মুসলিম দেশ ইতোমধ্যেই তাকাফুলের জন্য যথার্থ/উপযোগী বিধি ও বিধান চালু করেছে। বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং একই সাথে বীমা অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শন করেছে এবং খসড়া তাকাফুল আইনটি উপদেষ্টা কাউন্সিলে পাঠিয়েছিল কিন্তু এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। বিজ্ঞ নীতিনির্ধারকগণের জানা দরকার, তাকাফুল ইতোমধ্যেই প্রাগ্রসর পর্যায়ে ও বৈশ্বিক মানে উপনীত হয়েছে। দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যথা-দি ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড

www.pathagar.com

(আই,এফ,এস,বি) ও দি ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইন্সুরেন্স সুপারভাইজর্স (আই,এ,আই,এস) যৌথভাবে ইতোমধ্যে তাকাফুল মানদণ্ড প্রণয়ন করেছে যা আই,এ,আই,এসের মূল নীতিমালার (Core primci ples) সাথে সম্পর্কিত। তারা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বলেছে যে বীমা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই তাকাফুল মানদণ্ড তৈরি করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আইন ও নিয়মনীতির স্পষ্ট বিধান থাকতে হবে।

বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বে তাকাফুল ইতোমধ্যেই ক্রেতা, উদ্যোক্তা, পেশাদার ও আলেমদের নিকট থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। এ কারণেই নতুন বীমা আইন ও বীমা রেগুলেটরি অথোরিটি আইন প্রণয়নের পর তাকাফুল আইন/প্রবিধান ও বিধি প্রণয়নের বিষয়টি অতীব গুরুতপূর্ণ। প্রস্তাবিত তাকাফুল আইন বাংলাদেশের নতুন সৃষ্ট তাকাফুল বাজারের সুস্থ বিকাশে ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মতো বিষয়গুলো তত্ত্বাবধানে বীমা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক একটি মানদণ্ড নির্ধারণে এবং ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবে।

এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, বাংলাদেশের জনগণ অত্যন্ত ঈমানদার এবং বাংলাদেশের সংবিধানেও বিষয়টি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সরকার এবং তার সকল কার্যক্রমে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাসের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাকাফুল ব্যবসায় ইসলামি বিশ্বাস ও শিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সারাবিশ্বের মুসলমানরা বিশ্বাস করে, ইসলামি বিধান বা শরীয়াহ নীতিমালা মহান স্রষ্টার নিকট থেকে আসা ঐশীবাণীর ভিত্তিতে প্রণীত এবং তা মানুষের ইহকাল এবং পরকালের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারে। ইসলামী শরীয়াহর আলোকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দেশনা মেনে চলা ইসলামের অনুসারীদের জন্য সঠিক ও সর্বোত্তম পন্থা। জনগণ যখন প্রচলিত বীমার ইসলামী বিকল্পের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে, তখন কেন এর সাবলীল ও সহজ বিকাশকে থামানো বা বাধাগ্রস্থ করার চেষ্টা হচ্ছে তা বোধগম্য নয়।

এটা উপলব্ধি করতে হবে, ইসলাম শুধুমাত্র ধর্মীয় উপাসনা অনুশীলনের কোন ধর্ম নয়, বরং এতে মুসলমানরা কিভাবে তাদের জীবিকা অর্জন করবে, কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করবে এবং এই পৃথিবীর সব মানুষের উন্নতির জন্য আর্থসামাজিক কর্মকৌশল এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে যথার্থ ভূমিকা পালন করবে তার বিধানও ইসলামী শরীয়ায় দেয়া আছে। মনে রাখতে হবে, শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণ যতবেশী ইজতিহাদে মনোযাগী হবেন, ইসলামকে ততবেশী গতিশীল ও কার্যকর মনে হবে। সময়ের পরিক্রমায় মানবজাতিকে যেসব সমস্যায় পড়তে হয়, কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে তার সমাধানের অনন্য সাধারণ পদ্ধতি

www.pathagar.com

ইসলামে রয়েছে। তাকাফুল আইন যদি বীমা শিল্পের সংস্কারে সহায়ক হয়, তবে এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকত বা বাধা সৃষ্টি করার কোন হেতু থাকতে পারে না। একশ্রেনীর মানুষের ইসলাম সম্পর্কে বৈরী ধারণা বর্তমান অচলাবস্থার জন্য দায়ী বলে মনে হয়।

অব্যাহত অগ্রগতি

সমগ্র বিশ্বে তাকাফুল ব্যবসা আসন্ন দশকে প্রতি বছর ২০% থেকে ৩০% বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার মুসলিম ও অমুসলিম সবদেশেই তাকাফুলের সম্ভাব্য বিশাল বাজার সৃষ্টি হচ্ছে। ইতোমধ্যে তাকাফুল প্রচলিত বীমার একটি বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং মুসলিম ও অমুসলিম মিলিয়ে বিশাল ক্রেতা গোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শ্রীলংকা ও সিঙ্গাপুরে তাকাফুলের পলিসিহোল্ডারদের প্রায় ১৫% অমুসলমান। বাংলাদেশে শুধুমাত্র প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের পলিসিহোল্ডারদের প্রায় ৯% অমুসলমান। তথ্যটি আশাপ্রদ নিশ্চয়! আমাদের নীতিনির্ধারকদের অনেকেই হয়তো জানেন না তাকাফুল স্বল্প সময়ের ব্যবধানে কতটা বিকশিত হয়েছে। বর্তমানে শুধু এশিয়াতেই অন্তত ১৮টি দেশে তাকাফুল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ব্রুনেই, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্দান, লেবানন, ইয়েমেন, ওমান ও ইরান। ২০০৬ সালের শেষ নাগাদ তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল শতাধিক। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩০টিতে। তাকাফুল ও পুনঃতাকাফুল উভয় দিক থেকেই তাকাফুল ব্যবসা সঠিক দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। ইসলামী বীমার সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাকাফুল শিল্প এখন সারা বিশ্বে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। তাকাফুল বাজারের প্রাণবন্ত বিকাশের ফলে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ ঘটছে প্রতিমাসে। ফলে বিশ্বব্যাপী তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা অব্যাহতভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। বৈশ্বিক তাকাফুল মানচিত্রে সপ্রতি যে সব পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) ইতোমধ্যে তাকাফুল গ্রুপের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দুবাই ভিত্তিক সালামা'র অধীনে অন্তত ছয়টি ইসলামি বীমা সংস্থা রয়েছে।

(খ) তাকাফুল সংস্থাগুলো নিজ দেশের বাইরেও ইসলামী বীমায় বিনিয়োগ করছে বা শেয়ার সংগ্রহ করছে এবং দূরবর্তী অঞ্চলে নতুন নতুন উদ্যোগে

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সুদান ভিত্তিক শেইকেন ইন্সুরেন্স এন্ড রিইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ইক্যুইটি রয়েছে শ্রীলংকার 'সিলিনকো" তাকাফুলে।

(গ) তাকাফুল কোম্পানিগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সেবা এবং ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতা অন্য দেশে নিয়ে যাচ্ছে। এশিয়ান দেশসমূহে এর অনেক উদাহরণ আছে। তাকাফুল এখন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়ার মতো নতুন নতুন বাজারে বিকশিত হচ্ছে, যেখানে আগে তাদের কার্যক্রম ছিলনা।

(ঙ) এশিয়ার দেশগুলোর প্রচলিত বীমা কোম্পানিগুলো হয় তাকাফুল বিভাগ খুলছে কিংবা নিজেদেরকে পুরোপুরি ইসলামি বীমা কোম্পানিতে রূপান্তরিত করছে।

(চ) বহুজাতিক ব্যাংক, বীমা ও রেটিং এজেন্সিগুলো তাকাফুলের দিকে ঝুঁকছে এবং তাকাফুল ব্যবসা বিকাশে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

(ছ) ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড এবং ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইন্স্যুরেন্স সুপারইভাইজার্স যৌথভাবে তাকাফুল নিয়ন্ত্রণকারী মানদণ্ড বিকাশে কাজ করছে।

বর্তমানের এসব ইতিবাচক অগ্রগতি যখন আমাদেরকে অত্যন্ত আশাবাদী করেছে, তখন প্রস্তাবিত তাকাফুল আইনকে যে সব কারণে স্থগিত রাখা হয়েছে বলে বলা হয় তা আদৌ যৌক্তিক নয়। সরকার নিশ্চয় এটি উপলব্ধি করেছেন যে বাংলাদেশে ইসলামী বীমা ব্যবসা ক্রমসম্প্রসারনের প্রেক্ষিতে একটি পৃথক আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ইসলামী বীমার প্রচলন ঘটেনি এই যুক্তিতে ইসলামী বীমা ব্যবসা নিয়ন্ত্রনের জন্য পৃথক আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে যে যুক্তির অবতারনা করা হয়েছে তা অসার ও স্ববিরোধী। কেননা আমাদেরকে আইন রচনা করতে হবে আমাদের প্রয়োজনে ও আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে। বিশ্বের অন্য দেশে ইসলামী বীমা ব্যবসার প্রসার ঘটলে এদেশে তাকাফুল আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে এ যুক্তি সুবিবেচনা প্রসূত নয়। অনতিবিলম্বে নীতি নির্ধারককে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে।

আশু করণীয়

প্রস্তাবিত বীমা আইনে (২০০৯)- এ "ইসলামী বীমা ব্যবসা অর্থ ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত বীমা ব্যবসা" এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই আইনে শরীয়াহ অনুসারে কী ভাবে বীমা ব্যবসা পরিচালিত হবে তা স্পষ্ট করা হয়নি। সাধারণতঃ ইসলামী বীমা কোম্পানী সমূহ নিজস্ব বিবেচনায় শরীয়াহ কাউন্সিল গঠন করে

www.pathagar.com

থাকে। এই সমস্ত শরীয়াহ কাউন্সিলের সদস্যদের যোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, মেয়াদ, পরিতোষিক, দায়বদ্ধতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রস্তাবিত বীমা আইনে কিছুই বলা হয়নি। ইসলামী বীমার প্রধানতম মৌলিক বিষয় হচ্ছে পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। বীমা কর্তৃপক্ষ কী ভাবে শরীয়াহ কাউন্সিল সমূহের কাজের তত্বাবধান করবে, প্রস্তাবিত বীমা আইনে এ ব্যপারে কোন দিক নির্দেশনা নেই। এ ধরণের অস্পষ্টতার মধ্যে বীমা কর্তৃপক্ষ তাকাফুল বীমা কোম্পানি সমুহের প্রতি কতটুকু সুবিচার করতে পারবে তা অনুমান করা দুষ্কর। বীমা কর্তৃপক্ষের পক্ষে ইসলামী বীমা সম্পর্কে করণীয় কাজ সমুহ শুরু করা সম্ভব হবে যদি ইসলামী বীমা ব্যবসার জন্য উপযুক্ত প্রবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হয়। প্রস্তাবিত আইনে সরকার কর্তৃক বিধি প্রণয়নের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে, "সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ইসলামী বীমা ব্যবসায়সহ এই অধ্যাদেশের অধীন অন্যান্য বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে বিধি প্রনয়ন করিতে পারিবে"। যতক্ষন পর্যন্ত না সরকার ইসলামী বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে একটি উপযুক্ত ও বিস্তারিত বিধি প্রণয়ন না করেন অথবা প্রস্তাবিত "তাকাফুল আইন" অধ্যাদেশ আকারে/আইন আকারে জারি না করেন, ততদিন পর্যন্ত ইসলামী বীমা ব্যবসার দ্রুত বর্ধনশীল বাজারের সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

বাংলাদেশে এযাবত "ইসলামী বীমার" কোন বৈধ আইনগত স্বীকৃতি নেই বলে কেউ কেউ প্রচারনা চালিয়ে এসেছেন। প্রস্তাবিত বীমা আইনে ইসলামী বীমা ব্যবসার একটি আইনি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর অতিরিক্ত কিছু না করা হলে তাকাফুলের অগ্রযাত্রা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ার আশংকা দেখা দিতে পারে। প্রস্তাবিত বীমা অপূর্ণ বিভিন্ন ধারায় সুদের লেনদেন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। এই সব ধারায়, সুদ গ্রহন বা প্রদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে যা সরাসরি ইসলামী শরীয়াহর সাথে সম্পর্কিত নয়। এসব ক্ষেত্রে বীমা কর্তৃপক্ষ ইসলামী বীমা কোম্পানী সমূহকে কীভাবে অব্যাহতি বা ছাড় দিবে তা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া জরুরী।

প্রস্তাবিত তাকাফুল আইনে বীমা কর্তৃপক্ষকে প্রবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে শরীয়াহ উপদেষ্টা কমিটি গঠনের এবং প্রবিধানের আলোকে প্রতিটি ইসলামী বীমা কোম্পানিতে শরীয়াহ কাউন্সিল গঠনের কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। তাকাফুল আইনের এই ধারাটি প্রস্তাবিত বীমা আইন ২০০৯ এ সংযোজন করা হলে বীমা কর্তৃপক্ষের পক্ষে শরীয়াহ মোতাবেক ইসলামী বীমা কোম্পনী সমূহের তত্বাবধান করা অত্যন্ত সহজ হতো। যেহেতু তাকাফুল আইনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত হয়েছে, সেহেতু সংসদ তাকাফুল আইনের খসড়া পূনঃ বিবেচনার ও

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত গ্রহনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। লক্ষ্যনীয় যে প্রস্তাবিত বীমা আইন ২০০৯ এ চল্লিশটির ও অধিক বিষয়ে প্রবিধান বা বিধি প্রনয়নের নির্দেশ রয়েছে। বীমা কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক অবস্থায় এতগুলো বিষয়ে প্রবিধান ও বিধি তৈরীর ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে এগিয়ে যেতে হবে এবং ইসলামী বীমার বিকাশে যথার্থ ভূমিকা রাখতে হবে।

অতএব প্রস্তাবিত বীমা আইনের অধীনে প্রবিধান ও বিধি প্রণয়নের সময় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনের আলোকে ইসলামী বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে পৃথক ধারা রাখতে হবে। বীমা অধ্যাদেশে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে, "কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে এই অধ্যাদেশ এবং তদধীন প্রনীত কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ন না হওয়া সাপেক্ষে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবিধান প্রনয়ন করিতে পারিবে"। যেহেতু "ইসলামী বীমা ব্যবসায়" বীমা আইন এবং বীমা নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন একটি বিষয়, সেহেতু প্রনীতব্য সকল বিধি, ও প্রবিধানে ইসলামী বীমা ব্যবসায়কে, ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ধারা/উপধারা অবশ্যই সংযোজন করতে হবে।

ইসলামী বীমা ব্যবসায় 'ইসলামী শরীয়াহ' অনুযায়ী পরিচালিত হবে এ ব্যাপারে আর কোন দ্বিধা বা অস্পষ্টতা নেই। এতে সরকার এবং নবগঠিত বীমা নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষের উপর আইনগত বাধ্যবাধ্যকতা আরোপিত হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিধি ও প্রবিধান প্রনয়নের প্রক্রিয়া শুরু করা হলে ইসলামী বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে আইনগত স্বীকৃতির পর তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

পাকিস্তানে সম্প্রতি ইসলামী বীমা বিধিমালা প্রনয়ন করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহেও এ ধরণের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে বীমা নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ, ইসলামী ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড এবং ইন্টারন্যশনাল এ্যসোসিয়েশন অফ ইনসিওরেন্স সুপারভাইজারস এর সদস্য পদ লাভ করলে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বীমা শিল্প বিকাশের পথ অত্যন্ত সহজ হবে। সেই সাথে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত বীমা অপূর্ণ উল্লেখিত বিষয় সমূহের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন করতে হবে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে ইসলামী বীমা বিধি প্রণয়ন। এক্ষেত্রে সরকারের আশু সিদ্ধান্ত ও তা বাস্তবায়ন করা জরুরী।

মহান আল্লাহ আমাদের শুভ কাজে অবশ্যই সহায় হবেন বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

কাজী মোঃ মোরতুজা আলী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনায় সম্মানসহ স্নাতকোত্তর এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি ১৯৭০ সালে হাবিব ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার, পরবর্তীতে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক কর্মকর্তা এবং মহা-ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ হতে ২০০২ পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর তিনি বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমীর প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমানে তিনি প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

তিনি ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ফেলো। পেশাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, শিপিং এবং বীমার উপর উচ্চতর ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি নরওয়েজিয়ান শিপিং একাডেমীর (অসলো) একজন ফেলো এবং চার্টার্ড ইন্স্যুরেন্স ইনস্টিটিউট লন্ডন-এর এসোসিয়েট (ACII)। এশিয়া প্যাসিফিক রিস্ক এন্ড ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন সিংগাপুর এবং বাংলাদেশ সোসাইটি অব ট্রেনিং এণ্ড ডেভেলপমেন্টের সদস্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত বীমা আইন সংস্কার ও নতুন ইসলামী বীমা আইন প্রবর্তনে বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করছেন।

পেশাগত যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারতীয় ইন্স্যুরেন্স ইনস্টিটিউট-এর এস কে দেশাই এ্যাওয়ার্ড অর্জনসহ তিনি ২০০৪ সালে বেস্ট ইন্স্যুরেন্স প্রফেশনাল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

বীমা ও ইসলামী জীবন বীমার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সংগে সম্পৃক্ত থেকে তিনি বিশ্বের ১৭টি দেশ সফর করেছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন মিডিয়ার 'টক শো' সমূহে তার নিয়মিত উপস্থাপনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে?

তার লেখা 'বিশ্বাস ও আত্মউন্নয়ন' এবং 'Introduction to Islamic Insurance' শীর্ষক আরো দু'টি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়।

ISBN : 984-8203-44-7

www.pathagar.com